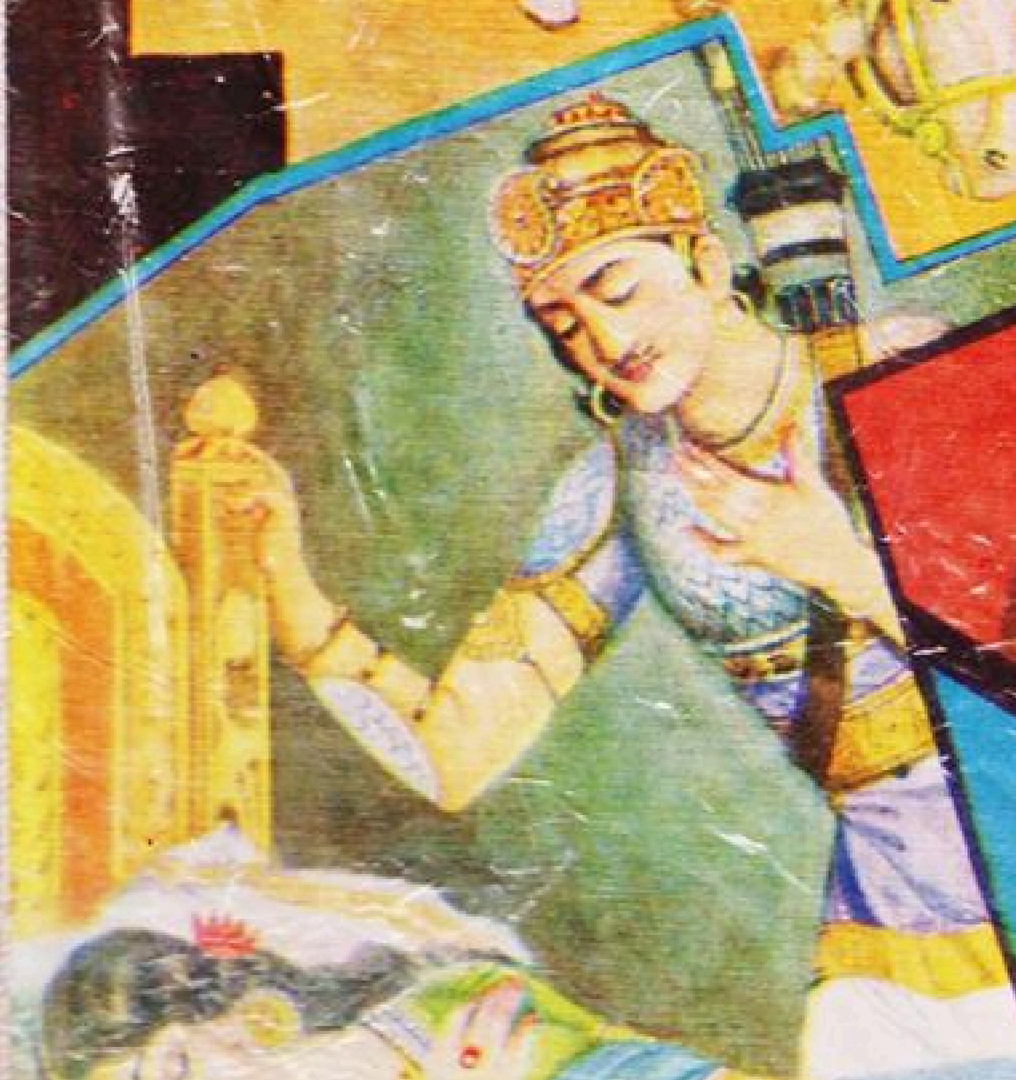
শিশু গল্পিকা







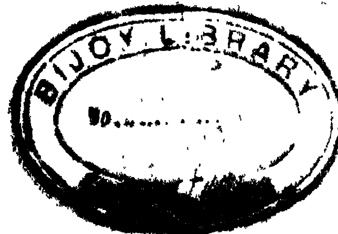




সংখ্যা : ২০২২

সম্পাদক

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার



আশ্বিন

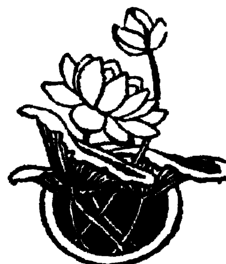
১৩৪৩

দেব সাহিত্য কুটীর

২২/৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

PROTUL BANERJI

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত



দাম ৬ টাকা

মাসপয়লা প্রেস
[illegible]।৩ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীশশধর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

প্রতি বছর পূজোর সময় দেব সাহিত্য-কুটীর বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্যে একখানা করে বড় বই বার করেন। এবারে তাঁরা এই শিশু-গল্পিকা বার করেছেন—বাছাই-করা গল্পের সাজি।

আমরা যখন ছেলেমানুষ ছিলাম, তখন ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প, তেপান্তর মাঠে একলা রাজার ছেলের রূপকথা, পুরাণের সেই এক নিঃশ্বাসে চুমুক দিয়ে সমুদ্র শুষিয়ে ফেলার গল্প, সাগর-জলের অতল-তলে মুক্তার পালঙ্কে রাক্ষসের দেশে সেই ঘুমন্ত রাজকুমারীর গল্প, আমাদের শিশু-মনকে মশগুল করে রাখতো।

শুনি, এখনকার ছেলেমেয়েরা নাকি "সত্যিকারে"র দুঃসাহসের গল্প শুনতে চায়। এরোপ্লেনের পাখার আওয়াজে তারা শোনে নতুন পরীর যাওয়া-আসার শব্দ; আফ্রিকার জঙ্গলে তারা যেতে চায় সত্যিকারের নর-খাদক রাক্ষসের সন্ধানে; তেপান্তরের মাঠের মায়ার বদলে, তাদের মনকে নাকি টানে হিমেল দক্ষিণ-মেরুর দেশে পেঙ্গুইন-পাখীর ডাক! পুরাণো রূপকথায়, পরীর গল্পে নাকি, তাদের মনের আনন্দের খোরাক নেই!

কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। সেদিনকার সেই রূপকথার গল্প চিরদিনকার। গরুর-গাড়ীর যুগেও তা সত্যি, এরোপ্লেনের যুগেও তা সত্যি, এবং চিরকাল তা সত্যি থাকবে। তার কারণ কি জান? শিশু বালক হয়, বালক যুবক হয়, যুবক বৃদ্ধ হয়, কিন্তু সকল সময়ে, সকলের মনে একটা চির-শিশু থাকে, সে সত্যিকারের আনন্দ পায়, সেই আকাশ-ফুলের মত মিথ্যে রূপকথায়, সেই মায়ার মত ছায়া পরীর অলখ পাখার স্পর্শে।

শিশু-গল্পিকার বিশেষত্ব হলো, শিশু-মনের কোন খোরাকই এই সংগ্রহে বাদ দেওয়া হয় নি। এলোমেলো ভাবে, এখান-সেখান থেকে গল্প সংগ্রহ করে এই গল্পের সাজি ভরা হয় নি। এতে আছে সেই রূপকথার গল্প, কল্প-রাজ্যের সেই

চির-সুরভিত সব ফুল, যা কখনও ম্লান হয় না, যা কখনও সুরভি-হীন হয় না। তারি সঙ্গে আছে, আজকের মানুষের গল্প, তার দুঃসাহসের নানা কীর্ত্তি, ঝর্ণার মত ঝর-ঝর হাসির ফোয়ারা, যুগ-যুগান্তের অমর-কাহিনী।

সম্পাদক, প্রকাশক, চিত্রশিল্পী, মুদ্রণকার সবাই মিলে এবারে বাংলার ছেলেমেয়েদের হাতে যে উপহার তুলে ধরেছে, তা পড়ে শিশুদের পূজোর আনন্দ শতগুণে বেড়ে যাবে।

১লা আশ্বিন
১৩৪৩

সুধীরচন্দ্র সরকার



সূচীপত্র

ইতিহাসের গল্প

এ্যাডভেঞ্চার

পুরাণের গল্প

ভূতের গল্প

বিজ্ঞানের গল্প

রূপকথা

বিবিধ গল্প

হাসির গল্প




ইতিহাসের গল্প





শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

'কাহার সাহস আছে, এস, অগ্রসর হও, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, এই আমি একা তোমাদের কাছে দাঁড়াইয়াছি।' বীরের গর্ব্বিত কণ্ঠের এইরূপ হুঙ্কার শুনিয়া সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কেহ এক পা'ও অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না—সকলের হাতের তরবারি হাতেই রহিয়া গেল —সর্দ্দার হরিসিংহ অক্ষত দেহে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন!

এই হরিসিংহ কে ছিলেন জান? তোমরা যদি পঞ্জাবে বেড়াইতে যাও, তাহা হইলে সেখানকার গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি তাঁহার নাম শুনিতে পাইবে। পঞ্জাবের চেয়েও তাহার নাম উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে বেশি পরিচিত। তাঁহার জীবনে কত ঝড় ঝঞ্ঝা আসিয়াছে, কত বিপদের কালো মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ বুকে করিয়া ঝলসিয়া উঠিয়াছে,—তবু কোন দিন সর্দ্দার হরিসিংহকে ভীত কম্পিত বা বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার বীরত্বের ও নির্ভীকতার

মরণজয়ী বীর
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সম্বন্ধে কত যে গল্প আছে তাহার অবধি নাই। আমরা প্রথমে যে গল্পটির আভাস দিয়াছি, এইবার সেই গল্পটি শোন।

একবার একজন সীমান্ত-সর্দ্দার হরিসিংহকে একটা ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সর্দ্দার হরিসিংহকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—আপনি নিশ্চিন্ত মনে আমার বাড়ি আসিবেন, সঙ্গে বেশি দেহরক্ষী আনিবার কোন প্রয়োজন নাই। চার পাঁচজন লোক সঙ্গে আনিলেই যথেষ্ট হইবে। বেশি লোকজন আনিলে তাহাদের সকলকে খাওয়াইবার মত সঙ্গতি আমার নাই বলিয়াই এই অনুরোধ করিতেছি। সর্দ্দার হরিসিংহ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সীমান্ত-সর্দ্দারের বাড়ি আসিলেন।

সর্দ্দার কিন্তু লোকটি ভাল ছিলেন না। তিনি যেমনটি বলিয়াছিলেন, তেমন কিন্তু কিছুই করিলেন না। সর্দ্দার বহুসংখ্যক দস্যুর দল বাড়ির নানা স্থানে আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সীমান্ত-সর্দ্দার তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—সর্দ্দার হরিসিংহ যেমন আসিবেন, অমনি তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। কখন আক্রমণ করিবে শোন,—যখন তিনি ভোজনে বসিবেন। এই ভাবে সীমান্ত-সর্দ্দার চাহিয়াছিলেন তাহার শত্রুকে দমন করিতে।

সর্দ্দার হরিসিংহ সীমান্ত-সর্দ্দারের বাড়ী আসিলে পর সীমান্ত-সর্দ্দার প্রথমটায় তাঁহাকে খুব আদর যত্ন ও অভ্যর্থনা করিলেন, তারপর তাঁহার সুর বদলাইয়া গেল। তিনি কহিলেন, 'সর্দ্দার হরিসিংহ মরণের জন্য প্রস্তুত হও।" সে স্বরে বিদ্রূপ ও প্রতিহিংসা মিশ্রিত ছিল। হরিসিংহ কিন্তু এতটুকু বিচলিত হইলেন না, তাঁহার মস্তিষ্কের একটা কেশও কম্পিত হইল না—তিনি ভীম ভৈরব কণ্ঠে যে উত্তর দিয়াছিলেন, সে কথা তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি বলিলেন, 'এস, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।' হরিসিংহের কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, যেজন্য কেহই তাঁহাকে আঘাত করিতে সাহসী হয় নাই।

মরণজয়ী বীর

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সর্দ্দার হরিসিংহ ছিলেন মহারাজ রণজিৎসিংহের একজন প্রধান সেনাপতি। মহারাজা রণজিৎ বলিতেন—প্রাসাদের স্তম্ভ যেমন তাহার অবলম্বন, স্তম্ভ ব্যতীত যেমন প্রাসাদ খাড়া থাকিতে পারে না—তেমনি হরিসিংহ হইতেছেন আমার রাজ্যের স্তম্ভ। রাজ্যরূপ রাজ প্রাসাদটি হরিসিংহরূপী স্তম্ভই দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে। এ এতটুকু অত্যুক্তি নহে। কোন বিদ্রোহী সর্দ্দারকে দমন করিতে—কোন বিদ্রোহী সৈন্যদলকে বশীভূত করিবার প্রয়োজন হইলে,—সর্দ্দার হরিসিংহ ব্যতীত অন্য কাহারও তাহা দমন করিবার শক্তি ছিল না। প্রত্যেকটি কার্য্যের ভারই ছিল হরিসিংহের উপর।

শিয়ালকোটের রাজা জীবনসিংহ পণ করিলেন তিনি কোনরূপেই মহারাজা রণজিৎসিংহের অধীনতা মানিবেন না, ইহাতে যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহাও দেশের স্বাধীনতা হারাইবার অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একপক্ষে পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎসিংহ অন্যদিকে শিয়ালকোটের রাজা জীবনসিংহ। স্বয়ং মহারাজা রণজিৎসিংহ সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। শিয়ালকোট দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। মহারাজা আটদিন পর্য্যন্ত অসাধারণ পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিয়াও শিয়ালকোটের অবরুদ্ধ দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। মন্ত্রীসভার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কেহই কোন সুপরামর্শ দিতে পারিলেন না। সকলের শেষে হরিসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সর্দ্দার, তুমি কি বল?' হরিসিংহ মহারাজার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন "মহারাজ! যদি আমার উপর যুদ্ধের ভার সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে এই দুর্গ জয় করিব।"

মহারাজা, সেদিন সেই মুহূর্ত্তেই সর্দ্দারের উপর সৈন্যপরিচালনার ভার দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। সর্দ্দার হরিসিংহ কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দুর্গজয় করিলেন। তিনি মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া প্রাকারের উপর আরোহণ

শিশুসাথী পত্রিকা

মরণজয়ী বীর

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

করিয়া দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সৈন্যদলেরাও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। তাঁহার এই সাহস ও নির্ভীকতার কাছে শিয়ালকোটের রাজার মাথা নত করিতে হইল। মহারাজা রণজিৎসিংহ শিয়ালকোটের বিজয়-সংবাদে প্রীতিলাভ করিয়া সর্দ্দারকে মূল্যবান পুরস্কার দিয়া অভিনন্দিত করিলেন।

একবার মানকিরার রাজা বিদ্রোহ করিলেন। মানকিরার রাজার সৈন্য-সংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজারের উপর, আর সর্দ্দারজীর ছিল মাত্র দুই হাজার। ফল কি হইতে পারে বুঝিয়া লও,—সর্দ্দারের সৈন্যেরা পরাজিত হইল, তাহারা চাহিল পলায়ন করিতে। তখন নির্ভীক সর্দ্দার সেই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রু পক্ষের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এই আক্রমণে আশ্চর্য্য ফল হইল—শত্রু পক্ষেরা পরাজিত হইয়া সন্ধি করিল। এই ভাবে তিনি যুদ্ধের পর যুদ্ধ করিয়া আপনার অসাধারণ সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু সকলের চেয়ে জামরুদের রণ-বিজয় কাহিনীই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সব চেয়ে বড় হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। ঐ যুদ্ধে তিনি পাঠানের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া শত্রু শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি মহাবীর শেরখাঁর শিবিরে গিয়াছিলেন। এই শেরখাঁ সর্দ্দার হরিসিংহের সহিত সম্মুখ সমরে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। শের খাঁয়ের মৃত্যুর পরে পাঠানেরা দলে দলে আসিয়া শিখদের আক্রমণ করিতে থাকে। সর্দ্দার হরিসিংহকে লক্ষ্য করিয়া শত্রু পক্ষ হইতে যে গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই গুলির ঘায়ে তাহার অশ্ব প্রাণ হারাইলে পর তিনি তৎক্ষণাৎ অপর একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু আর একটি গুলি আসিয়া তাঁহার গায়ে লাগায় তিনি গুরুতর রূপে আহত হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া দুর্গে লইয়া যাইবার সময়ও সৈন্যগণকে বলিয়া গেলেন—"লাহোর হইতে নূতন সৈন্যদল আসিয়া না পৌঁছা পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ কর, আর আমি যদি মরি, সে সংবাদও গোপন রাখিও। মনে রাখিও শিখের

গৌরব ও মান, মহারাজার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তোমাদের হাতে! আমি আমার কর্ত্তব্য করিয়াছি!"—এই কথা কয়টি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মরণজয়ী-বীর রণক্ষেত্রে মরণকে পরাজয় করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।

সর্দ্দার হরিসিংহ কি শুধু রণবিজয়ী বীর ছিলেন? তাহা নহে। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ রাজনৈতিক ও দৌত্যকার্য্যে সুনিপুণ ব্যক্তি। ইংরাজের সহিত যখন মহারাজা রণজিৎসিংহের সন্ধি হয়, তখন ফকির আজিজদিন্ সাহেবের সহিত হরিসিংহও ইংরাজ রাজদরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। স্থপতির কার্য্যেও তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। জামরুদের প্রসিদ্ধ দুর্গটি সর্দ্দার হরিসিংহের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সকলের উপরে হরিসিংহ ছিলেন সাধু ও সজ্জন। অতি বড় শত্রুও তাঁহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিতে পারে নাই। তবে কথাটা কি জান, পৃথিবীতে যাঁহারা বড় হন, তাঁহাদের শত্রুও থাকে অনেক! হরিসিংহেরও শত্রুর কোন অভাব ছিল না। একবার তাঁহার একজন বিপক্ষের লোক—মহারাজা রণজিৎসিংহের নিকট যাইয়া অভিযোগ করিল যে—'মহারাজ! সর্দ্দারের অধীনে মাত্র চারিশত সৈন্য আছে, কিন্তু তিনি বরাবর দুইহাজার সৈন্যের বেতন লইতেছেন। অথচ বেশির ভাগ সৈন্যই ত বিদায় লইয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, কাজেই উহার নিকট রাজ সরকারের দুই লক্ষ টাকা পাওনা আছে।' মহারাজা কোনরূপ অনুসন্ধান না করিয়াই এই অভিযোগ বিশ্বাস করিয়া সর্দ্দারের নিকট দুই লক্ষ টাকার দাবী করিলেন।

এই অবিচারে সর্দ্দারের মন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি রাজদরবারের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ গ্রাম্য ভদ্রলোকের বেশে নিভৃত স্থানে যাইয়া ধ্যান ধারণায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন সত্য প্রকাশ পাইল। রণজিৎসিংহ নিজে হিসাব ইত্যাদি পরীক্ষা

মরণজয়ী বীর
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

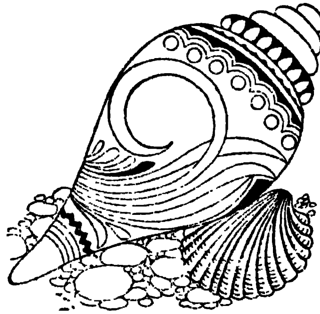
করিয়া দেখিলেন সর্দ্দারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। তখন তিনি স্বয়ং রাজহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিলেন সেই নিভৃত পল্লীর দিকে যেখানে সর্দ্দার হরিসিংহ গ্রন্থসাহেব পাঠে নিরত ছিলেন। সৈন্যদলের গর্ব্বিত পদ-সঞ্চালনে, লোকজনের কোলাহলে আর 'অলখ নিরঞ্জন' ধ্বনিতে সেই স্থান প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! গুণগ্রাহী মহারাজা রণজিৎসিংহ সর্দ্দারের কুটিরে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন—"বন্ধু, আমি আমার ভুল বুঝিয়াছি। তোমার কাছে যে অন্যায় অপরাধ করিয়াছিলাম সে জন্য ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। আমি তোমাকে চাই, আমার সৈন্য দলের কর্ত্তৃত্ব ভার আবার তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে।" সর্দ্দার হরিসিংহের অভিমান দূর হইল দুইজনের আবার মিলন হইল।



মরণজয়ী বীর

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সর্দ্দার হরিসিংহ পঞ্জাবের গুজরনওয়ালা নামক স্থানে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন মাত্র বারো বৎসর, সেই সময়ে পিতা গুরুদয়াল সিংহের মৃত্যু হয়। গুরুদয়ালসিংহও রণজিতের অধীনে কার্য্য করিতেন। মৃত্যু সময়ে গুরুদয়াল—শিশুপুত্র হরিসিংহকে মহারাজার হস্তে সমর্পণ করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—মহারাজ! বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়, আপনি ইহাকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়া নিন্। মহারাজা সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সত্য সত্যই পিতার ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করিয়া সর্দ্দার হরিসিংহ বীরের মত বীর, মানুষের মত মানুষ হইয়াছিলেন।





শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীনকালে ক্ষুদ্রকায় গ্রীসদেশের যে প্রতিবেশী ছিল না, তাহা নয়। সুদূর পূর্ব্বে ছিল চীন ও ভারতবন—এত দূরে যে যোগাযোগ অসম্ভব। সেই যুগে টিগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় বাস করিত চালদীয় জাতি। তাহারা ছিল সুশিক্ষিত, জ্যোতির্বিবদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, এবং বড় বড় লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম দর্শনে সে-সব লাইব্রেরিকে ইটের পাঁজা বলিয়া ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। কারণ বইগুলি ছিল ছোট ছোট মাটির টালি, তার উপর গোঁচার মত হরফে লেখা। উক্ত জাতি অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাদের ভিত ছিল অসমান ইটের পিরামিড।

এসিরীয় জাতি অবশেষে সেই দেশ দখল করে। তাহারা ছিল সব ভয়ঙ্কর যোদ্ধা অথচ বন্দীদের প্রতি তাদের নিষ্ঠুরতার সীমা ছিল না। নৃপতিগণ প্রাসাদ-প্রাচীরে আপনাপন কীর্ত্তিকথা খোদিত করাইতেন। কোন এক রাজা সগৌরবে তাঁহার দ্বারা পরাজিত কোনো জাতির বিষয় লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে তিনি বিজিত জাতির কাহারো কাহারো হাত-পা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, কাহারো বা কাটিয়াছিলেন নাক কান ঠোঁট, বুড়োদের মুণ্ডের থাক দিয়া সমুচ্চ স্তূপ রচনা করিয়াছিলেন, আর শিশুদের নিক্ষেপ করিয়াছিলেন অগ্নিকুণ্ডে! এসিরীয়গণের প্রাসাদ ছিল ইষ্টক-নির্ম্মিত,

সে-সব প্রাসাদের ভিত্তি ছিল আশি নব্বই ফুট উঁচু ঢিপি—বিস্তীর্ণ ভূমির উপর অবস্থিত। এসিরীয় ও চালদীয় জাতি যথেষ্ট টালি-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। উক্ত লাইব্রেরিগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধতম ছিল নিনেভে সহরে। কথিত আছে তার মধ্যে ছিল এইরূপ দশ হাজার গ্রন্থ।

খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে যে নেবুচ্যাড্‌নেজারের কাহিনী আছে, ছয় শতাব্দী পরে তিনি জেরুসালেম জয় করেন। সলোমনের মন্দির থেকে সোনারুপা লুঠ করিয়া তিনি মন্দির পুড়াইয়া দিলেন এবং সে-দেশের লোকেদের দাসত্বে বহাল করিলেন। ব্যাবিলন হইল তাঁর রাজধানী। রাজধানীই বটে! যুদ্ধে হাজার হাজার লোককে তিনি বন্দী করিয়াছিলেন, সুতরাং বেগার খাটার লোকের অভাব ছিল না। ব্যাবিলনে অসংখ্য মন্দির নির্ম্মিত হইল, অসংখ্য মন্দিরের সংস্কার হইল। নিজের জন্য তিনি এক প্রাসাদ তৈরি করাইলেন, তার পরিধি তিন ক্রোশ। প্রাসাদ ঘিরিয়া তিনটি প্রাচীর। প্রাচীরে তিনটি তোরণ নির্ম্মিত হইল জেরুসালেম থেকে লুণ্ঠিত কাঁসায়। তাঁর সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি—Hanging Gardens বা বিলম্বিত উদ্যান। এই উদ্যান পৃথিবীর সপ্ত বিস্ময়ের অন্যতম। নেবুচ্যাড্‌নেজারের মহিষী পাহাড়ে দেশের কন্যা, পতির সমতল রাজ্য তাঁর পছন্দ নয়। সেইজন্য রাজা তাঁর জন্য একটা পাহাড় তৈরি করাইতে সুরু করিলেন। প্রথমে গুরুভার কাঠের কুঁদো পাশাপাশি বিছাইয়া তার উপর মাটি ফেলিয়া ফেলিয়া একটা চাতাল নির্ম্মিত হইল চারশ' ফুট উঁচু। চাতালের উপর রকমারি বৃক্ষ রোপিত হইল। নীচেকার ইউফ্রেটিস নদী থেকে জল তুলিয়া সেই সব গাছপালায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। রাণী খুশী হইয়াছিলেন কি না জানা নাই, কিন্তু সমতল দেশে ছোট পাহাড়কেও মনে হয় সমুচ্চ, সুতরাং হয় ত ব্যাবিলনের সমতলের উপর এই 'উদ্যান' প্রায় আসল পাহাড়ের মতই দেখাইত!

ফিরে তাকা

গ্রীসের প্রতাপ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রীসের নানা প্রতিবেশীর মধ্যে প্রাচীন দেশ মিশরই ছিল সর্ব্বাধিক চিত্তাকর্ষক। আসলে নীলনদবাহিত দেশই ছিল মিশর, নীলনদ ব্যতিরেকে মিশরেরও অস্তিত্ব থাকিত না, কারণ সেই নদবাহিত মাটিতেই সে দেশের ভূমির উৎপত্তি। প্রতি বৎসর নীলনদের নির্গমস্থলে প্রচুর বারিপাতের ফলে, তার জল কূল ছাপাইয়া ছড়াইয়া পড়িত। জল সরিয়া গেলে পড়িয়া থাকিত পলিমাটির পুরু আস্তরণ। তার উপর বীজ বপন করিলেই, রিক্ত ভূমি, ম্যাজিকের মত, দেখিতে দেখিতে উজ্জ্বল সবুজ শস্যে ভরিয়া উঠিত।

মিশরবাসী জ্যামিতি ও জ্যোতির্ব্বিদ্যায় দক্ষ ছিল। তাহারা অক্ষরে না লিখিয়া লিখিত ছবিতে। সেই ছবি-হরফের নাম ছিল 'হিয়েরোগ্লিফিক'। এক বিষয়ে হিব্রুদের সঙ্গে তাহাদের মিল ছিল, অর্থাৎ তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত। অন্তত, মনে হয়, ধর্ম্মযাজকদের বিশ্বাস ছিল তা-ই। সাধারণ লোকের পক্ষে সে-মত গ্রহণ করা কঠিন ছিল বলিয়া তাহারা শিখিত বহু দেবতার আরাধনা; কতকগুলি জন্তুকেও তারা প্রচুর সম্ভ্রম করিতে শিখিত, কারণ সে-সব জন্তু ছিল বিভিন্ন দেবতার প্রতীক! যাহাদের জীবনযাত্রা শুচিশুদ্ধ নয় তাহারা বারংবার জগতে ফিরিয়া আসে নানা জীবের আকারে—এমনি একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। ইহার নাম আত্মার জন্মান্তর পরিগ্রহ। অপর এক প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর হাজার হাজার বছর পরে মৃত ব্যক্তির আত্মা ফিরিয়া আসিয়া তার পূর্ব্ব দেহে অধিষ্ঠিত হইতে চায়। সেই কারণে মৃতদেহকে সযত্নে রক্ষা করা হইত। তেল ও আঠা মাখাইয়া সমস্ত দেহে ঘনসন্নিবিষ্ট কাপড়ের ফালি জড়াইয়া এমনভাবে রাখা হইত যে অনেক দেহ আজ পর্য্যন্ত অবিকৃত রহিয়াছে দেশবিদেশের যাদুঘরে। সেগুলিকে বলে 'মমি'। এমনি একটি 'মমি' দ্বিতীয় রামেসিসের দেহ—যে-রাজা ইস্রাএল-বংশধরদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধিয়াছিলেন।

গ্রীসের প্রতাপ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যুর পরেও দেহের প্রয়োজন থাকে এই স্থির বিশ্বাস বশত মিশরের রাজারা নিজেদের দেহের জন্য সাড়ম্বরে সমাধি-কক্ষ নির্ম্মাণ করাইতেন। তাদের মধ্যে প্রাচীনতম ও পরম বিস্ময়কর হইতেছে সে-দেশের পিরামিডগুলি। বৃহত্তম পিরামিড তৈরি করান রাজা চেওপ্‌স্। তেরো একার * ভূমির উপর তার পাদপীঠ এবং তার উচ্চতা ৪৫০ ফুটেরও বেশি। তাহাকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্য ছিল চেওপ্‌সের, কিন্তু বাহিরের চমৎকার চকচকে পাথরগুলি এবং তার তলার অনেক খসখসে পাথর শত শত বৎসর পূর্ব্বে অন্য ইমারতে ব্যবহারের জন্য কাইরোতে স্থানান্তরিত হয়। অনেক পিরামিড লুপ্তপ্রায়, কিন্তু অনুমান ত্রিশটি এখনো বর্ত্তমান।

চেওপ্‌সের পিরামিডের অদূরে একটি প্রকাণ্ড পাষাণমূর্ত্তি আছে। তাহার উচ্চতা ৭০ ফুট এবং নাম স্ফিংক্‌স্। মূর্ত্তির মুখ মানুষের এবং দেহ সিংহের। মিশরীয় মূর্ত্তিগুলি সুশ্রী না হইলেও গাম্ভীর্য্য ও মহিমামণ্ডিত। সে-দেশের লোক কয়েকটি সুন্দর জিনিসের নির্ম্মাণ-কৌশল জানিত—যেমন কাচ রং করা। কিন্তু মূর্ত্তি গড়ার সময় তারা প্রধানত আয়তনের দিকে দৃষ্টি রাখিত। তাদের নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক শিলাস্তম্ভ বর্ত্তমান—কোনো কোনোটির উচ্চতা ৭০ ফুটেরও বেশি। থীব্‌স্ নামক স্থানে আছে দুইটি মূর্ত্তি, তাদের উচ্চতা ৪৭ ফুট এবং প্রত্যেকটি এক একখানি শিলাখণ্ড থেকে খোদিত। এইরূপ অতিকায় শিলাখণ্ডের অনেকগুলি দূরদেশ থেকে আনীত হইয়াছিল; কী উপায়ে, আমরা কেবল অনুমান করিতে পারি। পিরামিডগুলি অন্ততঃ চার হাজার বছর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। কিন্তু এমন কাজ করা কোনো তরুণ বয়স্ক জাতির পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে সে-যুগেও মিশর বয়সে ছিল প্রাচীন। কোন্ যুগে সে তরুণ ছিল, কে বলিবে?

* একার = ৪৮৪০ বর্গ গজ

ছোটদের গল্পিকে

গ্রীসের প্রতাপ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ অব্দে প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল ব্যাবিলন, এবং সে-রাজ্যের সিংহাসনে ছিলেন নেবুচ্যাড্‌নেজার। মিশর তার অধীনে আসিল। ক্ষুদ্র ফিনিসিয়া—একফালি সরু সমুদ্রতীর—কখনো স্বতন্ত্র হইতে পারে নাই, কোনো না কোনো দেশকে কর জোগাইয়াছে, সেদেশও ব্যাবিলনের অধীনে আসিল। জেরুসালেম দখল করিয়া নিয়া নেবুচ্যাড্‌নেজার ইহুদী রাজ্য গ্রাস করিলেন। কেবল টিগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় নহে, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন, মিশরও ছিল তাঁর অধীনে। এই বহুবিস্তৃত রাজ্য ও নানা যুদ্ধজয়ের জন্য ব্যাবিলনের গর্ব্বের সীমা ছিল না, কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ অব্দের অনেক আগেই সে-রাজ্য লোপ পাইল।

নব বিজেতা ছিল মেডিস ও পারসিকদের রাজ্য—টিগ্রিস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকার পূর্ব্বদিকে সে-রাজ্য গাড়িয়া ওঠে। প্রথমে মেডিস হয় বেশি শক্তি-শালী, পরে পারসিক। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ অব্দে পারস্যের সিংহাসনে ছিলেন ডেরিআস। ব্যাবিলনের সমস্ত রাজ্য তাঁর অধিকারে ; পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকার করিয়াছেন, থ্রেস ও ম্যাসিডনিয়ার অনেক নগরকে স্ববশে আনিয়াছেন, অধুনা তিনি গ্রীস আক্রমণ করিতে প্রস্তুত। সেজন্য অছিলার অভাব ছিল না। কিছুকাল পূর্ব্বে, আইওনীয়গণ (এথেন্সবাসীর প্রাচীন নাম) লিডিয়ার তীরে উপনিবেশ স্থাপন করে। সেগুলি পারসিকদের হস্তগত হয়। কালক্রমে সেখানকার লোকেরা পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, এবং এথেনীয়গণ তাদের সাহায্য করে। সেকথা শুনিয়া ডেরিআস প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং জনৈক ক্রীতদাসকে আদেশ দিলেন—প্রত্যহ যখন আহারে বসবো তখনি তুই তিনবার চীৎকার করে' বলবি 'রাজন্! এথেনীয়-গণের কথা মনে রাখবেন!'

ডেরিআস মনে রাখিয়াছিলেন। যথাশীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত হইয়াই তাহাদের

বিরুদ্ধে নৌ-বাহিনী ও সৈন্যদল পাঠাইলেন। নৌ-বাহিনীকে এক সুদীর্ঘ শিলাময় অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। সে-পথ স্থির সমুদ্রে খুব নিরাপদ নয়, দুর্য্যোগে বিষম বিপদসঙ্কুল। জলযানগুলি অন্তরীপের সীমান্ত এথস শৈলের সম্মুখীন হইবামাত্র ভীষণ ঝড় উঠিল এবং তার ফলে সেগুলি পাহাড়ের গায়ে আছাড় খাইল। উক্ত দুর্ঘটনায় এত জাহাজ ধ্বংস হইল, এত লোক জলমগ্ন হইল যে স্থলপথে যে সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের ফিরাইয়া আনা ছাড়া পারসিকদের গত্যন্তর রহিল না।



সে যাহাই হউক, ডেরিআস দমিবার পাত্র নহেন, অচিরেই নব উদ্যমে আবার প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি গ্রীসের বিভিন্ন প্রদেশে দূত পাঠাইয়া মাটি ও জল দাবি করিলেন। উক্ত দুই বস্তু ছিল বশ্যতা স্বীকারের নিদর্শন।

গ্রীসের প্রতাপ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো কোনো প্রদেশ বশ্যতা স্বীকার করিল, কিন্তু এথেনীয়গণ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া দূতগুলোকে ধরিয়া পাহাড়ের ফাটালের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। স্পার্টাবাসীরাও দূতেদের অধিকার সম্বন্ধে সমান উদাসীন। তারা তাহাদিগকে কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"এই নে তোদের মাটি আর জল! যত খুশী নিয়ে যা।"

ডেরিআস ছিলেন কোপনস্বভাব। ক্রোধে অধীর হইয়া এথস পাহাড়ের ধার দিয়া জাহাজে যাইবার জন্য তিনি স্থির সমুদ্রের প্রতীক্ষায় রহিলেন না, সোজা সমুদ্র পার হইয়া এটিকায় পৌছিলেন। তাঁর একখানা জাহাজের উপর ছিল হিপ্‌পিয়াস নামক জনৈক গ্রীসবাসী—সে-ই ছিল পথ-প্রদর্শক, সুতরাং কোথায় নামিতে হইবে, পারসিকদের তাহা অজানা ছিল না। এই দেশদ্রোহী ছিল পিসিস্ট্রেটাসের পুত্র; পিতার মৃত্যুর পর এথেন্সের শাসক-পদে প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে বিষম অত্যাচার করায় রাজ্য থেকে বিতাড়িত হইয়াছিল। সে পারস্যে পলায়ন করে। এখন সে ভাবিল ডেরিআস এথেন্স জয় করিতে পারিলে সে পুনরায় রাজতক্তে বসিতে পারে। হিপপিয়াস পারসিকদিগকে মারাথোনের সমতলে অবতরণ করিতে বলিল। সেস্থান সুবিস্তৃত ও সমতল, সুতরাং অশ্বারোহী সৈন্যদলের ব্যবহারের সম্পূর্ণ উপযোগী, এই কথা সে বলিল।

এথেনীয় সৈন্যদলের দশজন নায়ক, প্রত্যেকে পর্য্যায়ক্রমে একদিন করিয়া দেশ শাসন করেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন যুদ্ধের স্বপক্ষে, পাঁচজন যুদ্ধের বিপক্ষে। মাত্র আর একজনের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল—তিনি সমর-সচিব। মিল্‌টাইআডিস নামক একজন সেনানায়ক যুদ্ধের পক্ষপাতী, তিনি গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া যুদ্ধে মত করাইলেন। এইরূপে মারাথোনের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সম্ভবপর হয়।



গ্রীসের প্রতাপ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মিল্‌টাইআডিস হইলেন নায়ক। সমতলের প্রান্তে শৈলমালার সম্মুখে তিনি সৈন্যশ্রেণী স্থাপিত করিলেন। পারসিক সৈন্য গ্রীসীয় সৈন্যের দশগুণ। তাহারা গ্রীসের সৈন্য ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী সমতলে অবস্থিত। সমুদ্রতীরের অদূরে ছিল তাহাদের নৌ-বহর এবং শৃঙ্খলগুলি—শত্রুপক্ষকে বন্দী করার জন্য শিকলের আয়োজন! প্রথম আক্রমণে পারসিকেরা অবাক হইয়া গেল, কারণ, আত্ম-রক্ষার জন্য তীরন্দাজ ও অশ্বারোহী সৈন্য না লইয়াই শত্রুদল তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। দুই দলে মারাত্মক সংগ্রাম বাধিল। যুদ্ধের প্রায় শেষাশেষি গ্রীসীয় সৈন্যের পার্শ্ববর্তী দল পারসিক পার্শ্ববর্তী দলের উচ্ছেদ সাধন করিল; কিন্তু পারসিকদের মধ্যবর্তী দল শত্রুপক্ষের মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিল, সুযোগ বুঝিয়া গ্রীসীয় পার্শ্ববর্তী দল ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া শত্রুর উপর এমন প্রচণ্ড বিক্রমে নিপতিত হইল যে যুদ্ধজয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ পারসিকেরা প্রাণভয়ে সমতলের উপর দিয়া, পরে সমুদ্রতীরের ঢালুর উপর দিয়া দৌড় দিল। অগভীর জলের মাঝ দিয়া কোনোগতিকে ঝাঁকুবাঁকু করিয়া তাহারা জাহাজে উঠিয়া পড়িল—যেন গ্রীসীয় সৈন্যের বদলে দৈত্যদানা তাদের তাড়া করিয়াছে! কিন্তু পালাইবার আগেই গ্রীসীয় সৈন্যদল তাহাদের সাত সাতখানা জাহাজ ধরিয়া ফেলিল!

তবু ও পারসিকেরা রণে ক্ষান্ত হইল না, যত দ্রুত সম্ভব দাঁড় টানিয়া চলিতে লাগিল। রণশ্রান্ত গ্রীসীয় সৈন্যের মুহূর্ত বিশ্রামের অবসর নাই, কারণ তারা লক্ষ্য করিল নৌ-বহরের গতি এথেন্সের দিকে। সুতরাং গ্রীসীয় সৈন্যদলও পুরোদমে চলিতে লাগিল। পারসিকেরা পৌঁছিয়া দেখে সহরের সন্নিকটে একটি ছোট নদীর ধারে শত্রুদল ছাউনি ফেলিয়াছে। দেখিয়া গ্রীস-জয়ের আশা ছাড়িয়া তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

কখনো কখনো একটি ছোট যুদ্ধ গুরুত্বে অনেক বড় যুদ্ধকে অতিক্রম

করিয়া যায়। মারাথোনে যাঁহারা লড়িয়াছিলেন তাঁদের সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু সে-যুদ্ধ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, কারণ, তার ফলে স্বাধীনতাপ্রিয় গ্রীসবাসীকে পারসিকদের দাসত্ব করিতে হয় নাই!

যুদ্ধে নিহত মিল্‌টাইআডিস এবং সমর-সচিব প্রভৃত সম্মানের অধিকারী হইলেন। এমন কি তাঁদের প্রতিমূর্ত্তি দেবমূর্ত্তির মধ্যে স্থাপিত হইল। সে-যুগে গ্রীসদেশে যুদ্ধে নিহত সৈন্যের মৃতদেহ সমাহিত করার জন্য গৃহে আনার রীতি ছিল। কিন্তু বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য গ্রীসবাসী মারাথোন-বীরগণের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে সমাহিত করিতে সম্মত হইল! সেই সব সমাধির উপরে রচিত হইল দুইটি প্রকাণ্ড মৃত্তিকার স্তূপ। সেনানায়ক বা ক্রীতদাস, গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে-কেহ সেখানে প্রাণ দিয়াছিল, সকলেরই নাম খোদিত হইল সমুচ্চ মর্ম্মরস্তম্ভের উপর। সে-সব স্তম্ভ কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে কিন্তু বিরাট মৃন্ময় স্তূপগুলি অদ্যাবধি বিদ্যমান।

দুই

ডেরিআসের পুত্র জারাক্‌সিস পিতার মৃত্যুর পর পারস্যের সিংহাসনে বসিলেন। ঘরে বসিয়া আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইতে পারিলে তিনি খুশী হইতেন, কিন্তু অমাত্যবর্গের মন্ত্রণায় তাহা সম্ভব হইল না। তাহারা বুঝাইল, যেহেতু গ্রীস সৈন্য মারাথোনে তাঁর পিতার সৈন্যদলকে পরাজিত করে, অতএব তাঁহাকে ধৃষ্ট গ্রীসবাসীর দর্প চূর্ণ করিতেই হইবে! অগত্যা, কি আর করেন, পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সোৎসাহে গ্রীস আক্রমণের আয়োজন সুরু করিয়া দিলেন। এথস্ শৈলের অন্তরীপের এধার-ওধার তিনি এক খাল কাটাইলেন, পরে হেলেস্‌পণ্টের উভয় তীর দুইটি নৌকার পুলের দ্বারা সংযুক্ত হইল। সৈন্যদলের যাত্রাপথের মাঝে মাঝে বড় বড় ভাণ্ডার স্থাপিত করিয়া সেগুলি খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ

করিলেন। অতঃপর তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন, কারণ ঝড় উঠিয়া পুল-দুটো উড়াইয়া দিল! ঝড়ের আস্পর্দ্ধা ত কম নয়! তিনি কেউকেটা নহেন, স্বয়ং পারস্যের বাদশাহ, তাঁহাকে বাধা দিবার অধিকার হেলেস্পণ্টেরও নাই! এই ভাবিয়া বেয়াদবির জন্য তিনি জলকে তিনশ' বেত্রাঘাত করিতে আদেশ দিলেন!

যথাসময়ে প্রবল পরাক্রান্ত পারসিক সৈন্যদল হেলেস্পণ্ট অভিমুখে যাত্রা করিল। গিরিশীর্ষে জারাক্সিসের জন্য মর্ম্মর-সিংহাসন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তার উপর বসিয়া তিনি দেখিতে লাগিলেন, শৈলমূলে লক্ষ লক্ষ সেনা শিবির সংস্থান করিয়াছে। সহসা তিনি কাঁদিতে সুরু করিয়া দিলেন, কারণ তাঁর মনে হইল যে তখন থেকে শতবর্ষ পরে সেই সব সৈন্যের একজনও জীবিত থাকিবে না! কথাটা নিঃসন্দেহ সত্য, কিন্তু পররাজ্য আক্রমণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কোনো দক্ষ সেনানায়ক সে-কথা চিন্তা করার অবসর পাইত কি?

পরদিন পুল পার হওয়ার পালা। তেমন অভূতপূর্ব্ব শোভাযাত্রা জগৎ কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই! অপূর্ব্ব সুন্দর রণরথে স্বয়ং জারাক্সিস, তারও চেয়ে সুন্দর তপনদেবের রথ—শ্বেত অষ্টাশ্ববাহিত। রাজার দেহরক্ষীদল—দশসহস্র মৃত্যুজয়ী সৈনিক মুকুট পরিয়া চলিয়াছে ধীরগম্ভীর পদক্ষেপে। পারস্যরাজের অধীনে নানা জাতির বহু সৈন্যদল। কেহ বর্ম্মধারী, কাহারো অঙ্গে সুতির আঁটসাট আংরাখা, কেহ পরিয়াছে লম্বা কোর্ত্তা। রকমারি অস্ত্রশস্ত্রে তারা সজ্জিত; বর্শা, ছোরা, তীরধনুক, এমন কি লোহা-বাঁধানো ভারি ভারি মুগুর —যার দেশের যেমন রীতি। উট চলিয়াছে সারবন্দি, অনুচরদল বহন করিতেছে খাদ্য সম্ভার। ইহা ব্যতীত জলের উপর চার সহস্রাধিক জাহাজ। যারা ভালো গল্প শুনিতে পছন্দ করে তাদের সৌভাগ্যবশত, সেই সময়ে এশিয়া-মাইনর দেশে হিরোডোটাস নামে এক চার বছরের বালক বাস করিতেছিল। সেই বালক বড় হইয়া এমন অনেক স্থান ভ্রমণ করেন যেখানে কোনো স্মরণীয়

কিশোর পত্রিকা

গ্রীসের প্রতাপ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাপার ঘটিয়াছে; সেই সকল ব্যাপারের সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি লিখিয়া প্রকাশ করেন। পারসিকদের অভিযান সম্বন্ধে তিনিই আমাদিগকে জানাইয়াছেন, জগতের বৃহত্তম সৈন্যদলের নৌকার পুল অতিক্রম করার কাহিনী তাঁহার কল্যাণেই আমরা শুনিয়াছি।

এই বিপুল বাহিনীর আগমন সংবাদে গ্রীসবাসী এতদূর উদ্বিগ্ন হইয়াছিল যে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পারস্যরাজকে অবিলম্বে বশ্যতা স্বীকারের নিদর্শন, মাটি ও জল, পাঠাইতে প্রস্তুত হইল। অন্য সকলে পরাক্রান্ত শত্রুকে বাধা দিবে স্থির করিল। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে এমন হিংসা যে দেশের দারুণ বিপদের সময়েও নায়ক নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে কলহের সৃষ্টি হইল। সুখের বিষয়, শেষ পর্য্যন্ত এথেন্স, স্পার্টা এবং অন্য কয়েকটি প্রদেশ মিলিত হইয়া স্পার্টা-রাজ লিওনাইডেসকে সৈন্যচালনার ভার দিল।

পারসিকেরা সমুদ্রতীর ধরিয়া ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। জারাক্‌সিস সংবাদ পাইলেন থার্মপাইলি গিরিসঙ্কটে কয়েকজন গ্রীসীয় সেনা সমবেত হইতেছে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ সৈনিক, তাই তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। সেই সবেমাত্র তাঁর চারশ' জাহাজ ঝড়ে ধ্বংস হইয়াছে, আর ইউবিয়া দ্বীপ ও গ্রীসের মধ্যবর্ত্তী ইউরিপাশ প্রণালীতে গ্রীসীয় সৈন্যের পাহারা; নহিলে, প্রয়োজন বোধ করিলে, সৈন্যদলকে তিনি জলপথে অ্যাটিকায় লইয়া যাইতে পারিতেন।

থার্মপাইলিতে পাহাড়গুলো সমুদ্রের মধ্যে প্রসারিত, পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝে কেবল একটু সরু পথ। সেইখানে লিওনাইডেস তিনশত স্পার্টাবাসী ও অন্যান্য জাতির ছয় সহস্র সৈন্য নিয়া অগণিত পারসিকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। দুই দিন ভীষণ যুদ্ধ চলিল, পারসিকেরা বারবার বিতাড়িত হইল, শেষে এক বিশ্বাস-ঘাতক প্রভূত পুরস্কারের লোভে পারস্যরাজকে একটা হাঁটা-পথের সন্ধান দিল, যে পথে তাঁর সৈন্যদল গিরিসঙ্কট এড়াইয়া পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে পারে।

গ্রীসের প্রতাপ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লিওনাইডেস যখন জানিতে পারিলেন এই পথ শত্রুর গোচর হইয়াছে, তখন তিনি বুঝিলেন থার্মপাইলি রক্ষা করা অসম্ভব। তবুও তিনি সরিয়া গেলেন না। কহিলেন, যেস্থান রক্ষার জন্য আমরা প্রেরিত হইয়াছি সেস্থান ত্যাগ করা আমাদের দেশের রীতিবিরুদ্ধ! অন্যান্য সৈন্যেরা গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কেবল স্পার্টা ও থেস্পিয়ার সৈন্যেরা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া রহিল! উপর হইতে আর নীচে থেকে পারসিকেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ভয়ঙ্কর নিদারুণ সেই যুদ্ধ—প্রথমে অস্ত্র দিয়া, তারপর দাঁত, ঘুসি, পাথর বা এমন কিছু দিয়া তারা লড়িতে লাগিল যার দ্বারা আঘাত হানা যায়, ক্ষতের সৃষ্টি করা যায়; এমনি ভাবে চলিতে লাগিল সেই যুদ্ধ যতক্ষণ না প্রত্যেক গ্রীসীয় সৈনিক নিহত হইল! পারসিকেরা থার্মপাইলি গিরিসঙ্কট অধিকার করিয়া এথেন্স অভিমুখে যাত্রা করিল।

অতঃপর ইউরিপাস পাহারা দিবার হেতু না থাকাতে গ্রীসীয় রণপোতগুলি তার ভিতর দিয়া চলিল দক্ষিণে। থেমিস্টোক্লিস ছিলেন এথেনীয় নৌ-বাহিনীর নায়ক, তিনি মারাথোনের যুদ্ধ-ফেরত। ডেরিআসকে বিতাড়িত করিয়া গ্রীসবাসী যখন উৎসবানন্দে মগ্ন, তিনি তখন ছিলেন অবিচল ও গম্ভীর। তিনি বলিয়াছিলেন—পারসিকেরা আবার আসিবে, তাই স্থলে যেমন তেমনি জলেও আত্মরক্ষার উপায় স্থির করা প্রয়োজন! তিনি কেবলি বলিতে লাগিলেন —জাহাজ চাই, জাহাজ চাই! জাহাজ তৈরি করিতে এথেনীয়গণ সহজে সম্মত হয় নাই; যাই হোক, অনেক তর্কবিতর্কের পর অবশেষে নৌ-বাহিনী নির্ম্মিত হইল। এই নৌ-বাহিনীই থেমিস্টোক্লিস ইউরিপাসের মাঝ দিয়া লইয়া আসিতেছিলেন।

এই নায়ক কখনো কোনো সুযোগ অগ্রাহ্য করিতেন না। তিনি জানিতেন, পারসিক দলে নিশ্চয়ই ইওনীয় সৈন্য বর্ত্তমান, যারা গ্রীসীয় জাতি থেকে উদ্ভূত;

তাহাদের জন্য, যাইবার পথে, গিরিগাত্রে তিনি লিখিয়া রাখিলেন—ইওনিয়াবাসি! সম্ভব হইলে আমাদের পক্ষে যোগ দাও; একান্তই যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে আমাদের অনুরোধ, যুদ্ধ থেকে বিরত হও। অন্তত লড়িতে লড়িতে পিছাইয়া পড়িয়ো!

প্রথমেই এথেন্স আক্রমণ করা পারসিকদের উদ্দেশ্য; গ্রীসের অন্যান্য প্রদেশ সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এথেন্সের বরাতে যা আছে তা-ই হইবে! করিন্থ্-যোজকের দক্ষিণে যে-সব প্রদেশ ছিল, তাহারা দিনরাত পরিশ্রম করিয়া যোজকের এধার-ওধার সমুচ্চ প্রাচীর তুলিয়া নিজেদের সহর রক্ষার আয়োজনে ব্যস্ত, এমন সময় পারসিকেরা এথেন্সের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। জ্বালাইয়া পুড়াইয়া লুটতরাজ করিয়া সমস্ত সহর ধূলিসাৎ করিয়া দিল। যাই হোক, সহরের লোকেরা রক্ষা পাইল, কারণ শত্রুর আগমনের ঠিক আগে গাদা গাদা লোককে নৌকায় তুলিয়া নিরাপদ স্থানে সরানো হইয়াছিল।

এই ঘটনার বহু পূর্ব্বে এথেনীয়গণ ডেল্‌ফির দৈববাণীর নির্দ্দেশ প্রার্থনা করে। দৈববাণীর একাংশ এইরূপ—পবিত্র স্যালামিস, নারী-গর্ভজাতকে ধ্বংস করিবে তুমি! কিন্তু 'নারীগর্ভজাত' গ্রীসীয় না পারসিককে বোঝায় তা কে বলিবে? থেমিস্‌টোক্‌লিসের বিশ্বাস পারসিককে বোঝায় এবং স্যালামিসে জলযুদ্ধে জয়লাভ গ্রীসবাসীর একমাত্র আশা!

পেলোপন্নেসাসের লোকেরা, যারা প্রাচীর তুলিয়াছিল, তারা আপত্তি করিল। কহিল—আমরা যোজকের ওপরই লড়ুবো! যুদ্ধে হার হলে অনায়াসে বাড়িমুখো পালাতে পারবো; জলের ওপর গিয়ে আমরা লড়তে পারবো না! থেমিসটোক্‌লিসের বিশ্বাস, স্যালামিসেই যুদ্ধ জয় হইবে, অন্যত্র নহে; তাঁর সঙ্কল্প, আপত্তিকারিদের লড়াইবেন, তাদের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক! জনৈক বিশ্বস্ত দাস মারফৎ পারস্যরাজের কাছে তিনি খবর দিলেন—গ্রীসীয়দের মধ্যে একতার

অভাব, কেহ কেহ তাঁর স্বপক্ষে, কেহ কেহ বিপক্ষে! বিজয়-গৌরব লাভ করার ইহাই উপযুক্ত সময়! পারসিকেরা ভাবিল, এ পত্র তাদের পক্ষপাতী কোনো গ্রীসীয় সেনানায়কের।

গভীর রাত্রি। গ্রীসের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা আবার পরামর্শে বসিয়াছে। আলোচনা চলিতেছে, এমন সময় থেমিস্‌টোক্‌লিসের কাছে খবর পৌঁছিল, বাহিরে এক আগন্তুক তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে চায়! তিনি একজন এথেনীয়, নাম আরিস্‌টিডিস, তিনিও মারাথোনে লড়িয়াছিলেন। লোকটি এমন ন্যায়নিষ্ঠ ও মাননীয় যে সকলে তাঁকে 'ন্যায়নিষ্ঠ' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিল। নৌ-বাহিনী নির্ম্মাণের চেষ্টা করিয়া থেমিস্‌টোক্‌লিস সম্পূর্ণ ভুল করিয়াছেন, ইহাই ছিল তাঁর বিশ্বাস। প্রতিদ্বন্দ্বীর কঠোর বিরুদ্ধতাচরণের ফলে ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত সঙীন হইয়া ওঠে। সে-যুগে এথেনীয়দের এক অদ্ভুত রীতি ছিল। কোনো ব্যক্তি অত্যধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে এরূপ বিশ্বাসের কারণ ঘটিলে নাগরিকেরা একত্রে আহূত হইত। শামুকের খোলার উপর প্রত্যেককে লিখিতে হইত সেই ব্যক্তির নাম, লেখকের বিবেচনায় যার দ্বারা দেশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এরূপে ছয় হাজার ভোট সংগৃহীত হইলে দশ বছরের জন্য সে নির্ব্বাসিত হইত! এইরূপেই আরিস্‌টিডিস নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

সম্প্রতি পারসিক আক্রমণের সূচনায় গ্রীসীয় কর্ত্তৃপক্ষ নির্ব্বাসিতদের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দিয়াছিলেন, কারণ তাঁদের আশঙ্কা ছিল, এরূপ না করিলে নির্ব্বাসিতেরা শত্রুপক্ষে যোগদান করিতে পারেন। মুক্তি পাইয়াই গভীর রাত্রে আরিস্‌টিডিস আসিয়াছেন তাঁর প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বী থেমিস্‌টোক্‌লিসের কাছে সংবাদ বহন করিয়া!

সেই অকৃত্রিম দেশভক্ত স্বদেশ রক্ষার জন্য থেমিস্‌টোক্‌লিসকেও গৌরবের

গ্রীসের প্রতাপ
শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

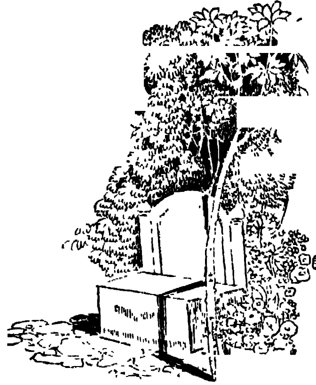
অধিকারী করিতে ইচ্ছুক! তিনি চুপিচুপি বলিলেন—পারসিক নৌ-বাহিনী প্রণালীর প্রবেশপথে এসে পৌঁছেচে! শুনিয়া থেমিস্‌টোক্‌লিসের আনন্দ ধরে না, তিনি বুঝিলেন, শত্রু তাঁর ছলনায় ভুলিয়াছে; এখন গ্রীসীয় দলকে জলের উপর লড়িতে হইবে।

এইরূপে স্যালামিসের যুদ্ধ হয়। অ্যাটিকা থেকে স্যালামিস পর্যান্ত গ্রীসীয় নৌ-বাহিনী শ্রেণীবদ্ধ। তাদের দক্ষিণে শত্রুবাহিনী। যুদ্ধ সুরু হইল, সারাদিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল, উভয় পক্ষই অমিতবিক্রমে লড়িতেছে। এমন কি, মনে হয়, পারসিক নায়কেরা এতটা বেপরোয়া না হইলে বোধ করি ফল আরো ভালো হইত। যুদ্ধে রাজা উপস্থিত, সুতরাং তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যেকেই বাহাদুরি দেখাইবার জন্য ব্যাকুল, যাহাতে ভবিষ্যতে সম্মান ও পুরস্কার লাভ করিতে পারে। পারসিকদের যে-সব জাহাজ সামনে ছিল, তারা রণে ভঙ্গ দিল। কিন্তু পিছনের জাহাজগুলোর বিষম উৎসাহ, তাহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া অগ্রসর হইতে গিয়া নিজেদের মধ্যেই ধাক্কাধাক্কি করিয়া সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল! হাল নাই, দাঁড় গেছে; আক্রমণকারী জাহাজগুলোকে অসহায়ভাবে জলের উপর ভাসমান দেখিয়া গ্রীসীয় জাহাজ আসিয়া টপাটপ তাদের ডুবাইয়া দিতে লাগিল। এদিক ওদিক যেদিকে চাও গ্রীসীয় জাহাজ তীক্ষ্ণ গলুইয়ের আঘাতে শত্রুর জাহাজের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করিতেছে। এমন কি তারা পারসিক নৌবাহিনীর পাশ দিয়া গিয়া তাদের পিছন থেকে আক্রমণ করিল। নিশাগমে পারসিকদের পরাজয় সম্পূর্ণ হইল।

জাহাজে উঠিয়া জারাক্‌সিস গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁর আতঙ্কের সীমা নাই, পাছে তাঁর সৈন্যদল পার হওয়ার পূর্ব্বেই শত্রুপক্ষ হেলেস্‌পণ্টের পুলগুলি ধ্বংস করে! হিরোডোটাস্ বলিয়াছেন, পারস্যরাজের মানসিক অবস্থা এমন হইয়াছিল যে সমগ্র জগৎ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেও তিনি থাকিতেন না। সে

যাই হোক, তাঁর অন্যতম সেনানায়কের আশা দুর্ব্বার, পুনরায় গ্রীসজয়ের চেষ্টা করিবেন, তাই তিনি তিন লক্ষ সৈন্যের সহিত থাকিয়া গেলেন। কিন্তু তখন গ্রীসের বিভিন্ন প্রদেশ একতার মর্ম্ম বুঝিয়াছে। প্লাটিআর ভীষণ যুদ্ধে গ্রীসীয় দল জয়লাভ করিল।

পারস্যরাজের গ্রীসজয়ের সকল চেষ্টা এইরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল।





শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

যশস্করের বুদ্ধি

পুরাকালে কাশ্মীরে যশস্কর বলে একজন রাজা ছিলেন। ৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের ব্রাহ্মণরা সকলে মিলে তাঁকে রাজা নির্ব্বাচন করেন। বিচারের কাজে তাঁর যশ সেই সময় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকে কথায় কথায় বলতো, যদি বিচার-বুদ্ধি কারুর থাকে, তা আছে মহারাজ যশস্করের।

একদিন মহারাজ যশস্কর বিচার আসনে বসে আছেন এমন সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে উপস্থিত। ব্রাহ্মণের চেহারা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়ে রাজার কাছে এসেছেন।

মহারাজ যশস্কর ব্রাহ্মণকে বসতে বলে তাঁর কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন।

তখন ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন, "মহারাজ, আপনার রাজ্যে এত বড় অবিচার হবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি। কিছুকাল আগে অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার দরুণ আমি আমার বাড়ী এক ধনবান্ বণিকের কাছে বিক্রী করি—যথা-নিয়ম তার লেখা-পড়াও হয়। আমার বাড়ীর গায়ে একটা কূপ আর কতকগুলি সোপান আছে। সেই কূপ আর সোপান আমি বিক্রী করিনি! গ্রীষ্মকালে

নাগরিক

সেই কূপ ভাড়া দিয়ে যা কিছু পাওয়া যায়, তাই দিয়ে শেষ জীবনে গ্রাসাচ্ছাদন চালাব—এই ছিল আমার ইচ্ছে। এই ভাবে বাড়ী বিক্রী করে, আমি চাকরীর সন্ধানে বিদেশে যাই। বহু-বৎসর বিদেশে ঘুরেও অর্থোপার্জ্জনের কোন সুবিধে করতে না পারায় এই জরা-জীর্ণ দেহ নিয়ে আবার স্বদেশে ফিরে এসেছি। ফিরে এসে শুনলুম, সেই কূপ আর সোপানে আমার কোন অধিকার নেই। সেই মিথ্যাবাদী বণিক বলে যে, বিক্রয়-পত্রে আমি নিজে নাকি স্পষ্টভাবে তা লিখে দিয়েছি। কিন্তু মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি শপথ করে বলছি যে সেই বিক্রয়-পত্রে আমি নিজে হাতে লিখেছি যে, সেই কূপ আর সোপান বাদ দিয়ে আমার অন্য সব সম্পত্তি বিক্রী করলাম। আপনি যদি সেই বণিকের কাছে বিক্রয়-পত্রখানা একবার দেখেন, তা হলেই বুঝতে পারবেন!"

রাজা পরের দিন সেই বণিককে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু দলিল পড়ে তিনি দেখলেন যে ব্রাহ্মণের কথা ঠিক নয়, সেই বণিকের কথাই ঠিক; কারণ দলিলে স্পষ্ট লেখা আছে, "কূপসোপানসহিত" বাড়ী ব্রাহ্মণ বণিককে বিক্রী করছে।

ব্রাহ্মণ কেঁদে ফেল্লেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের কথাবার্ত্তা শুনে এবং আচার-ব্যবহার দেখে রাজার কেমন বিশ্বাস হয়েছিল যে, নিশ্চয়ই এ ব্যাপারের মধ্যে কোন চাতুরী আছে। ব্রাহ্মণের কথাই ঠিক। কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়?

অন্তরের অভিপ্রায় গোপন রেখে মহারাজ যশস্কর বণিকের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবে আলাপ করতে লাগলেন। রাজার ব্যবহারে বণিক একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে গেল। রাজা লক্ষ্য করলেন যে বণিকের হাতে তার নামাঙ্কিত আংটী রয়েছে। কথার ছলে সেই আংটী-টি রাজা দেখতে চাইলেন। বণিক কোন রকম দ্বিধা না করে সেই আংটী রাজার হাতে দিলেন। বণিকের সামনে ব্রাহ্মণকে অপমান করে বার করে দিয়ে রাজা বণিককে আপ্যায়ন করতে লাগলেন।

সেই অবকাশে তিনি উঠে গিয়ে, সেই আংটী দিয়ে বণিকের হিসাব-রক্ষকের কাছে একজন লোক পাঠালেন—তাকে শিখিয়ে দিলেন যে, এই আংটী দেখিয়ে বলতে যে, বণিক এখনই তাঁর গোপন হিসেবের খাতাটী চাইছেন।

এধারে রাজ-উদ্যানে বণিককে রাজা নানা ভাবে আটকে রাখলেন। রাজার সমাদরে কে না খুসী হয়?

বণিকের হিসেবের খাতায় তিনি দেখেন যে, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ী বিক্রীর হিসেবে দলিল-লেখককে দেওয়া হয়েছে ১ হাজার দীনার। এই রকম সামান্য দলিল লেখার পারিশ্রমিক অতি অল্প—তার যায়গায় দলিল-লেখক কেন পেলো হাজার দীনার? তখন রাজার বিশ্বাস হলো যে নিশ্চয়ই দলিলের মধ্যে দলিল-লেখক কোন জুয়াচুরি করেছে। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেন যে, "কূপসোপানসহিত" যেখানে লেখা "সহিতে"র "স"-এর কাছে ঘষা দাগ—তখন রাজার মনে হলো যে, প্রথমে দলিলে লেখা ছিল "কূপসোপানরহিত," ধূর্ত্ত দলিল-লেখক "রহিতের" "র" এর যায়গায় কৌশলে "স" বসিয়ে দিয়েছে—সংস্কৃত অক্ষরে "র" কে "স" করাও খুব সহজ। এবং এই ভাবে অক্ষরের পরিবর্ত্তন করে বণিক ব্রাহ্মণকে ঠকাচ্ছে।

পরের দিন রাজা আবার ব্রাহ্মণ আর বণিককে ডেকে পাঠালেন এবং সেই সঙ্গে সেই দলিল-লেখককেও ডেকে পাঠালেন। শাস্তির ভয়ে দলিল-লেখক স্বীকার করলো যে অর্থের লোভে "কূপসোপানরহিত"কে "কূপসোপানসহিত" করিয়াছিল।

বণিকের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হলো এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর কূপ ফিরে পেলেন।

আর একবার মহারাজ যশস্কর আর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ন্যায়ের ফাঁকির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ বহু যায়গা ঘুরে একশো স্বর্ণ-মুদ্রা সংগ্রহ করে কাশ্মীরে ফিরছিল। পথে আসবার সময় দুর্ভাগ্যবশত যে থলেতে সেই

টাকাগুলো ছিল, টাকাসমেত সেই থলে এক কূপে পড়ে যায়। আজন্মের সঞ্চয় করা টাকা সেই ভাবে জলে পড়ে যাওয়ায় ব্রাহ্মণ পাগলের মত কাঁদতে থাকেন। ব্রাহ্মণের সেই কান্না শুনে চারিদিকে লোক জড় হয়ে যায়। তখন সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে, যদি কূপ থেকে থলেটা সে উদ্ধার করে দেয়, তাহলে ব্রাহ্মণ তাকে কি দেবেন?

বিপন্ন ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করে বলেন, 'যদি থলেটা উদ্ধার করতে পারেন, তাহলে তা থেকে আপনার যা ইচ্ছা হবে, তাই আমাকে দেবেন।'

ব্রাহ্মণের সর্ত্ত শুনে সেই লোকটা কূপের মধ্যে নেমে বহু চেষ্টা করে থলেটা উদ্ধার করলো। থলে থেকে তার নিজের ইচ্ছেমত ৯৮টা স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ব্রাহ্মণের হাতে মাত্র ২টা স্বর্ণ-মুদ্রা দিল।

বিপন্ন হয়ে ব্রাহ্মণ মৌখিক সর্ত্ত দিয়েছিল বটে যে, লোকটার যা ইচ্ছা হবে, তাই তাঁকে দেবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ তখন কল্পনাও করতে পারেননি যে, লোকটা নিজে ৯৮টা স্বর্ণ-মুদ্রা নিয়ে, তাঁকে মাত্র ২টা স্বর্ণ-মুদ্রা দেবে।

বিপন্ন হয়ে ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু রাজ-বিধি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ২টা স্বর্ণ-মুদ্রার বেশী পেতেও পারেন না কারণ তিনি নিজে বহুলোকের সামনে সেই সর্ত্ত নিজেই দিয়েছিলেন।

যা হ'ক, ব্রাহ্মণের কথা মত সেই লোকটার ঠিকানায় দূত পাঠিয়ে লোকটাকে আনা হলো। রাজা অনেক অনুনয় করলেন। ব্রাহ্মণ বিপন্ন হ'য়ে যা বলেছিল, তার সুবিধে নেওয়া তার উচিত নয়—দরিদ্র ব্রাহ্মণের আজীবনের সঞ্চয় তাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত, এই রকম নানা কথা বলে রাজা লোকটিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু লোকটা কিছু শুনলো না; সে শুধু বলে, আমি ওসব জানি না—যা সর্ত্ত হয়েছে, আমি তাই পালন করেছি।

তখন রাজা তাদের দুজনকার কাছ থেকে সেই ১০০ স্বর্ণ-মুদ্রা নিজের কাছে

নিলেন। সে লোকটীর দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লেন, তাহলে তুমি কি চাও বলো ?

লোকটী বল্লে, আমি চাই সর্ত্তের কথা মত ব্যবস্থা !

রাজা তখন সেই লোকটীর হাতে দুটী স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়ে বল্লেন, সর্ত্তের কথা অনুযায়ী, এই তোমাদের ন্যায্য ব্যবস্থা !



লোকটী তো অবাক্। সে কি মহারাজ ? তখন মহারাজ যশস্কর বল্লেন, ব্রাহ্মণের সর্ত্ত ছিল, তোমার যা ইচ্ছে, তাই তাকে দিতে। তোমার ইচ্ছে হলো এখানে ৯৮টী স্বর্ণ-মুদ্রা, অতএব সর্ত্তের কথা অনুযায়ী সেই ৯৮টী স্বর্ণ-মুদ্রা, যা—তোমার ইচ্ছে, সেটা ব্রাহ্মণকে দিতে হবে !

সর্ত্তের যে এরকম ব্যাখ্যা হতে পারে লোকটী কল্পনাও করতে পারে নি। অগত্যা তাকে সেই দুটো স্বর্ণ-মুদ্রা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

বিচারের বাহাদুরী
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

লক্ষ্মণসেনের ন্যায়-নিষ্ঠা

লক্ষ্মণ সেন বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি তখন বৃদ্ধ, তাঁর রাজ্যে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত বলে সৈন্যদল ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, তখন মুসলমানেরা এসে তাঁর রাজধানী দখল করে নেয়। লক্ষ্মণ সেন একজন বিশেষ জ্ঞানী লোক ছিলেন এবং গুণীর সমাদর করতে তিনি জানতেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের মত তাঁর সভায় তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ কবি এবং পণ্ডিতদের মহাসমাদরে আসন দিতেন। সেই সময়কার বাংলার শ্রেষ্ঠ লোকেরা তাঁর রাজ-সভা অলঙ্কৃত করে থাকতেন। বাংলার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবি তাঁর সভা-কবি ছিলেন, জয়দেব, উমাপতি ধর, শরণ, কবিরাজ চক্রবর্ত্তী ধোয়ী এবং গোবর্দ্ধনাচার্য্য। এঁরা প্রত্যেকেই খুব স্বাধীন-চেতা লোক ছিলেন। রাজ-কবি ছিলেন বটে কিন্তু রাজার খোসামোদ করা দরকার মনে করতেন না।

রাজা লক্ষ্মণ সেনের ন্যায়-বিচারের তখন তুলনা ছিল না। তাঁর চরিত্র গুণে মুগ্ধ হয়ে একজন মুসলমান ফকির তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প লিখে রেখে গিয়েছেন। সেই সব গল্প থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মন কতখানি উদার ছিল এবং তাঁর কি রকম ন্যায় নিষ্ঠা ছিল।

লক্ষ্মণ সেনের এক শালা ছিল। সে ছিল ভারী দুর্বিণীত এবং অসভ্য। লোক-জনের উপর প্রায়ই সে পীড়ন করতো। তবে রাণীর অতি আদরের ভাই বলে লোকে কিছু বলতে সাহস করতো না। একদিন সে এক বেনের মেয়েকে পথে অপমান করে। মেয়েটী সোজা একেবারে লক্ষ্মণ সেনের রাজ-সভায় গিয়ে উপস্থিত হলো। রাজাকে দেখে মেয়েটি তার অপমানের কথা জানিয়ে বল্লে, এ অপরাধীকে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে!

সভাকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্য মেয়েটির সেই লাঞ্ছনার কথা শুনে অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তির জন্যে রাজাকে অনুরোধ করলেন।

বিচারের বাহাদুরী

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কিন্তু অপরাধী কে ?

লক্ষ্মণ সেন যখন শুনলেন যে অপরাধী তাঁরই শালা, তখন তিনি দ্বিরুক্তি না করে, তখনই তাকে ধরে আনবার আদেশ দিলেন।



রাণীর কাণে গিয়ে সেই কথা পোঁছোতেই রাণী স্বয়ং রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন। রাজা যখন দণ্ডাদেশ দিতে যাবেন, সেই সময় রাণী বলে উঠলেন, কার সাধ্য আমার ভাইকে শাস্তি দেয় ?

রাণীর সেই কথা শুনে সভাকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্য তাঁর হাতের দণ্ড দেখিয়ে বললেন, যে রাজ-সভার কাজে বাধা দিবে, তাকে তিনি সেই দণ্ডাঘাতে বার করে দেবেন।

তারপর রাজার দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন, যদি তিনি এর সুবিচার না করেন, তাহলে তিনি এই দণ্ডেই এই রাজ্য ত্যাগ করে চলে যাবেন।

রাজা লক্ষ্মণ সেন কোনও রকমে বিচলিত না হয়ে, অন্য যে কোনও সাধারণ

লোকের যে শাস্তি-বিধান হতো, তাঁর শালাকেও সেই শাস্তি দিয়ে মেয়েটিকে সন্তুষ্ট করলেন। রাণীর কোনও আবেদন বা মিনতি গ্রাহ্য হলো না!

আবদর রহমানের বাহাদুরী

কাবুলের আমীর আবদর রহমানের নাম বোধহয় তোমরা অনেকেই শুনেছ। তাঁর মত বড় রাজা আফগানিস্থানে আর হয় নি। বর্ত্তমান আফগানিস্থানের তিনিই জনক। যেমন উদার ছিল তাঁর হৃদয়, তেমনি তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর বুদ্ধি। একবার দুটা লোক তাঁর কাছে এসে নালিশ করে যে, একজন ফকির তাদের যথাসর্ব্বস্ব টাকা ঠকিয়ে নিয়ে নিয়েছে। তারা দু'ভাই কষাই-এর কাজ করে। বহুদিন তারা দেশে যায় নি। মাসের পর মাস দোকানের বিক্রীর টাকা জমিয়ে ছ'শো টাকার একটা তোড়া বেঁধে তারা দু'ভাই দেশে চলেছিল। পথে ক্লান্ত হয়ে তারা যখন এক যায়গায় বিশ্রাম করছিল, তখন তাদের সঙ্গে এক ফকিরের দেখা হয়। ফকির দেখে, তারা তাদের মনের কথা সব তাকে বলে। তাদের সঙ্গে যে ছ'শো টাকা আছে, সে কথাও তারা ফকিরকে গল্প করে। তখন ফকির বলে যে, সে আজীবন দরিদ্র। ফকিরী করে তার দিন চলে। এক সঙ্গে ছ'শো টাকা সে কখনও দেখে নি। যদি তারা একবার তা দেখায়, তা হলে, তার কৌতূহল চরিতার্থ হয়।

ফকিরের কথায় বিশ্বাস করে যেই তারা টাকার তোড়াটী দেখাতে যাবে, অমনি ফকির সেই থলেটা টেনে ধরে চেঁচাতে লাগলো, "ওগো, কে কোথায় আছ, দেখো গো, একলা পেয়ে ডাকাতে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে গো!

তার চেঁচামেচিতে লোকও জমে গেল দেখতে দেখতে। কিন্তু লোকেরা বুঝতে পারলো না, কার টাকা কে নিয়েছে! তখন তারা তাদের তিনজনকেই বাদশাহ্-এর কাছে নিয়ে গেল।

বিচারের বাহাদুরী

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বাদশাহ্ও মহাবিপদে পড়লেন। ফকির বলে, তার টাকা; আবার দু'ভাই তারা বলে, টাকা তাদের।

উভয়-পক্ষের সব কথা শুনে বাদশাহ্ আবদর রহ্মান এক বালতি গরম জল আনতে বললেন। গরম-জল এলে টাকাগুলো সব তাতে ফেলে দিলেন।

কয়েক মিনিট পরেই তিনি ফকিরের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি ভণ্ড, তুমি চোর, এ-টাকা ওদের দু'ভাইএর; তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।

[কি করে বাদশাহ্ প্রমাণ পেলেন, তোমরা ভেবে বলো দেখি আর যদি না পার—এর উত্তর তলায় দেওয়া হলো]

বাদশাহ আবদর রহমান শুনেছিলেন যে তারা দু'ভাই কষাই-এর কাজ করে। বহুদিন ধরে তাদের দোকানের বিক্রীর টাকা থেকে তারা জমিয়েছে। তাদের হাতের টাকায় নিশ্চয়ই চর্ব্বি লেগে থাকবে। গরমজলে টাকাগুলো ঢালতেই বাদশাহ্ দেখলেন, চর্ব্বি গলে তেলের মত জলের ওপরে ভাসতে আরম্ভ করেছে। সেই থেকে তিনি প্রমাণ পেলেন যে টাকাগুলো সত্যিই সে কষাই দু'ভাই-এর।




এ্যাডভেঞ্চার



অন্ধকারে

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণের বন্যা। ঐরাবত যেন আকাশ চিরিয়া সাগর ঝরাইয়া দিয়াছে পৃথিবীর বুকে!

পাড়াগাঁয়ের ছোট ষ্টেশন। ট্রেণ হইতে নামিয়া পথে বাহির হওয়া গেল না—ওয়েটিং রুমে আস্তানা লইলাম। দলে আমরা চার জন। আসিয়াছি পল্লীর প্রান্তে মুন্সীদের পোড়ো বাড়ী—সেখানে ভূত আছে, দেখিতে। সঙ্গে ছোটখাট লাগেজ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মনে দারুণ অস্বস্তি। যে-বৃষ্টি নামিয়াছে, রাত্রিটা বুঝি ষ্টেশনের বদ্ধ ঘরেই মাটী হইয়া যায়!

ওয়েটিং রুমে আরো তিনজন ভদ্রলোক যাত্রী বসিয়াছিলেন—মধ্য-বয়সী। দুজন নিদ্রাচ্ছন্ন; একজন শুধু জাগিয়া আছেন। ট্রেণ হইতে সকলে একসঙ্গে নামিয়াছি। তাঁরা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

যে ভদ্রলোক জাগিয়া ছিলেন, বার-বার আমাদের নিরীক্ষণ করিবার পর সহসা তিনি প্রশ্ন করিলেন—আপনাদের নতুন দেখচি···এখানেই থাকো ?

কহিলাম—না।

প্রশ্ন হইল—এখানে কোথায় যাবেন ?

কহিলাম,—আমরা ?···মানে, শুনেছি এখানে মুন্সীদের পোড়ো-বাড়ী আছে, সে-বাড়ী নাকি ভূত-প্রেতের আস্তানা। তাই আমরা কল্‌কাতা থেকে এসেছি সে বাড়ীতে ভূত দেখতে।

ভদ্রলোক যেন চমকিয়া উঠিলেন! দুই চোখ বিস্ফারিত হইল। ঘরের স্তিমিত আলোয় সে দৃষ্টি আমাদের লক্ষ্য এড়াইল না! আমাদের জুয়ান বয়স—সে দৃষ্টিতে কৌতুক বোধ করিলাম।

ভদ্রলোক কহিলেন,—চারজনেরই ঐ এক মতলব ?

মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, হঁ্যা।

ভদ্রলোক কহিলেন,—ভূতের কথা কার মুখে শুনলেন ?

কহিলাম,—খবরের কাগজে পড়েছিলুম।

ভদ্রলোক আমার পানে চাহিয়া রহিলেন।

আমি কহিলাম,—বাজে গল্প ? না, সত্যি ?

ভদ্রলোক বলিলেন,—শুনি লোকের মুখে। তবে এ বয়সে সংসার-ভূত নিয়ে পাগল হয়ে আছি, বাবা···ও পোড়ো বাড়ীর ভূতের তত্ত্ব নেবো, সে অবসর কোথায় ? ভদ্রলোক মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

তারপর সব চুপ! শুধু ঘুমন্ত ভদ্রলোক দুটির নাসিকায় গর্জ্জন ছুটিয়াছে—পাল্লা দিয়া!

বাহিরে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি। অবিরাম। জল-প্লাবিত প্লাটফর্ম্মে বসিয়া একটা হিন্দুস্থানী কুলি গান ধরিয়াছে···কান্‌হাইয়ার কথা লইয়া!

অন্ধকারে

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শিশুদের গল্পিকে

ভদ্রলোক বলিলেন,—এ বৃষ্টি রাত্রে ধরবে, মনে হয় না। তোমরা এ বৃষ্টিতে মুন্সীদের বাড়ী যাবে? সে বাড়ী চেনো?

কহিলাম,—বাড়ী চেনা দূরের কথা, যে-পথে সে বাড়ী, সে-পথও চিনি না।

ভদ্রলোক বলিলেন—তা'হলে··· ?

প্রশ্ন করিয়া তিনি হাসিলেন; তারপর বলিলেন—ভালো কাজ করোনি, বাবা!···ভূত তো পরে দেখবে···কিন্তু পাড়াগাঁ···অন্ধকার রাত···পুরোনো পোড়ো বাড়ী···সাপ-খোপ, শেয়াল-ভাম তো আছে।···কলকাতায় থাকো—সে কথা বুঝি ভাবো নি!

আমি কহিলাম—আপনি তো এখানেই থাকেন?

ভদ্রলোক কহিলেন—থাকি বৈ কি!

কহিলাম—আপনি বাড়ী যাবেন কি করে? গাড়ী-পাল্কী আছে?

ভদ্রলোক কহিলেন—গাড়ী আছে! গরুর গাড়ী। পাল্কীও আছে। কিন্তু এই বর্ষা-রাতে তাদের টিকি দেখবার আশা নেই।···একটু বসে আছি···যদি বৃষ্টি কমে···না কমলে ছাতার নীচে মাথা গুঁজে ভিজে বেড়ালটি হয়ে ফিরতে হবে! তবে আমার বাড়ী এখান থেকে আধ ক্রোশটাক দূরে।···তোমাদের ও ভূতের বাড়ী···সে-বাড়ী একেবারে গ্রামের শেষে নদীর ধারে··· এখান থেকে পাকা আড়াই ক্রোশ!···এ রাত্রে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা ঠিক হবে না। বরং আপত্তি যদি না থাকে, আমার ওখানে চলো।—কোনোমতে রাত কাটানো···

ভাবিলাম, ভালো ব্যবস্থা! এ বৃষ্টিতে ষ্টেশনের এ-ঘর ছারপোকার আড়ং বলিলে চলে! থাকিলে কষ্টের একশেষ! রাত্রি দশটায় একখানা ট্রেণ আছে, তাহাতে চড়িয়া কলিকাতায় ফিরিলে বন্ধুসমাজে মুখ দেখানো যাইবে না। অর্থাৎ

অন্ধকারে

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আমাদের অবস্থা তখন সেই মারীচ কুরঙ্গের মতো! আগে পিছে যেদিকে চাই, নির্ব্বংশ হইতে হইবে।

ষ্টেশনের ঘড়িতে তখন ন'টা বাজিতে পাঁচ মিনিট—বৃষ্টির তোড় একটু কমিল। ভদ্রলোক বলিলেন,—সাড়ে ন'টা হতে চললো—ক্যালকাটা টাইম। যদি আমার এখানে আসতে চাও—পাড়াগাঁয়ের বাড়ী,—আরাম না হোক—এখানকার চেয়ে ভালো থাকবে। তাছাড়া মুখে কিছু দেওয়া দরকার তো…

ভদ্রলোকের আতিথ্য-গ্রহণে সম্মতি জানাইলাম। ষ্টেশন হইতে ছাতা ও টোকা লইয়া ভদ্রলোক আচ্ছাদন সংগ্রহ করিলেন। এবং তার তলে মাথা গুঁজিয়া…

বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাড়াগাঁয়ে থাকিলে কি হইবে, ভদ্রলোক জানেন, বাড়ীতে কি ভাবে বাস করিতে হয়!

প্রশ্ন করিলাম—আপনি রোজ ডেলি-প্যাশেঞ্জারী করেন?

কহিলেন,—না। সপ্তাহের পাঁচটা দিন থাকি কলকাতার মেশে। শনিবার বাড়ী আসি। সোমবার সকালে এখান থেকে আবার অফিসে ছুটি।

ভোজে গলদা-চিংড়ি বা মটনের সমারোহ না থাকিলেও যাহা পাইলাম, রুচিকর।

এবারে শয়ন। বাহিরের ঘরে বোধ করি দুখানা তক্তপোষ—তার উপর জাজিম পাতা। জাজিমের উপর তোষক চাপিল, বালিস আসিল, যেন বরযাত্রী আসিয়াছি, এমন যত্ন-আদর!

বৃষ্টি তখনো চলিয়াছে। ভদ্রলোক কহিলেন,—মশা নেই…দেশে বাস করে বাড়ী থেকে মশা তাড়িয়েছি—এইটুকু কাজ করেছি…তা, এখনি ঘুমোবে?

কহিলাম—না। বেশ লাগছে। ঘুমোতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ঘুম পায় নি এখনো।

ভদ্রলোক গড়গড়া আনাইলেন; গড়গড়ার উপর বড় একটি কলিকা বসাইয়া

চেয়ারে বসিলেন; কহিলেন,—শনিবার রাত থেকে সোমবার ভোর পর্য্যন্ত এ সময়টায় মনে হয় আমি কেরাণী নই···Monarch of all I survey···বাড়ীর সঙ্গে খানিকটা বাগান করেছি। পুকুর আছে; তাতে ছেড়েচি মাছ···বসে নিশ্চিন্ত মনে রাজত্ব করি!···সহরে এমন আরাম পেতে হলে মাসে অন্ততঃ হাজার টাকা আয়ের দরকার হয়···হাঃ হাঃ হাঃ!

বেশ লোক—ধনী না হন, ভদ্রলোকের রুচি ভালো।

দু'চারিটা ঘরোয়া কথার পর ভদ্রলোক কহিলেন—তোমাদের ভূত দেখার সঙ্কল্প শুনে আমার মনে পড়চে, প্রথম যৌবনের কথা! কি বিপদ যে ঘটেছিল··· জেলে যাবার জো! এ-কাজে শুধু মজা নেই, বাবা—আশঙ্কাও আছে অনেকখানি!

এমন বর্ষা···নিঝুম রাত্রি। ভূতের গল্প শুনিবার পক্ষে চমৎকার!

আমরা কহিলাম,—আপনি বলুন সে কথা···

ভদ্রলোক কহিলেন,—বলি···

•

—ছেলেবেলাটা পশ্চিমে কাটিয়াছে। লক্ষ্ণৌয়ে থাকিতাম। কলেজে পড়ি।

শীত কাল। খুব ঝড়। লাইব্রেরীর এ্যানিভার্শারি গেছে চুকিয়া—ক'দিন সে কাজ লইয়া মাতিয়া ছিলাম। সে কাজ চুকিলে মনটা খালি হইয়া গেল! কি করি? কিছু ভালো লাগে না—এমন অবস্থা!

বন্ধু শরৎ বলিল,—এক কাজ করলে হয়। এখানকার গোরস্থানে শুনেছি, রাত্রে জলশা হয়—ভূতের জলশা! সে জলশায় নাচের নূপুরের সুরে সুরে বাজে লক্ষ্ণৌ-ঠুংরী! কথাটা শুনে আসচি। আজ চলো, সেই জলশায় যাওয়া যাক্! মনের অবসাদ কাটবে।

শিশুরে গল্পিকে

অন্ধকারে

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অমিয় বলে উঠলো—অনাসৃষ্টি সব! এই ঝড়ো রাত—শেষে নিউমোনিয়া হোক্!

আমি বললুম্—এমনি দুর্য্যোগের রাত্রেই গোরস্থান ভ্রমণ করতে হয়। ভূতের গল্প পড়োনি?

নানা তর্ক কাটিয়ে স্থির হলো, আমি আর শরৎ দুজনে যাবো গোরস্থানে—রাত্রি বারোটার পর। এবং সারা রাত সেখানে কাটিয়ে ভৌতিক জলশার রিপোর্ট এনে বন্ধু-সমাজে দাখিল করবো! অমিয় আর সুরেশ বললে,—সারা রাত যদি গোরস্থানে থাকতে পারো, দশ টাকা দেবো—বাজি!

আসল কথা, গোরস্থানের ভৌতিক দৌরাত্ম্যের কাহিনী সারা সহরে বেশ বিভীষিকা জাগিয়ে রেখেছিল। সেজন্য অনেকে রাত্রে ও-পথে সহজে চলতে চাইতো না!

যাবার পূর্ব্বে মনে হলো, নেহাৎ নিরস্ত্র বার হওয়া উচিত হবে না! আমার ছিল একখানা গুপ্তি-লাঠি! ভিতরে শড়কী—সেটা লাঠির খাপে ভরা থাকতো। বহিরবয়ব দেখে লাঠির আসল পরিচয় বোঝবার সাধ্য কারো ছিল না!

আমরা দুজনে যখন গোরস্থানে প্রবেশ করলুম্, তখনো ঝড় বইছে···আকাশ জুড়ে মেঘের রাশি মত্ত-লীলায় ছুটোছুটি করছে! শীত বেশ চড়া—গায়ে ছিল ওভারকোট···

সিগারেটে হাতে খড়ি হয়েছিল। তার টানে শীতের আড়ষ্ট-ভাব কাটবে—সে আশা মনে ছিল বিলক্ষণ।

গোরস্থানের অবস্থা খুব জীর্ণ। ভাঙ্গা আঁচিল, ভাঙ্গা পাঁচিল—আগাছার জঙ্গল! ভূতের চেয়ে সাপের ভয় বেশী। নেহাৎ নাকি শীতকাল, তাই···না হলে রাত্রে এ-জায়গা মোটেই নিরাপদ নিঃশঙ্ক হতো না।···

গোরস্থানের মাঝামাঝি এসে একটা মস্ত ছাউনি-তোলা কবরের পাশে

অন্ধকারে

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আমরা দুজনে আস্তানা নিলুম ! শরৎ বললে,—পালা করে ঘুমোনো যাক্। ভূতের দেখা যা পাবো, তা বুঝচি খুব। মাঝে থেকে অনিদ্রায় কষ্ট পাই কেন ?

আমি বললুম—তুমি ঘুমোও···আমি জেগে থাকি। কখন লক্ষ্ণৌ-ঠুংরী সুর বাজবে·· কে জানে।

শরৎ দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে হাত-পা ছড়িয়ে সটান শুয়ে পড়লো।

চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার—আমার সিগারেটের ডগায় লাল অগ্নি-শিখা—আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম অদূরে একটা কবরের পানে ! ছায়া-রচা নর-নারীর কল্পনায় মন ভরে রইলো।

কল্পনায় ছায়া-ছবি রচা চললো বহুক্ষণ···শেষে অস্বস্তি ধরলো ! ওভারকোট ফুঁড়ে শীতের মত্ত বাতাস দেহে কাঁপন জাগিয়ে তুললো ! ···শরতের নাসিকায় তখন রাগিণী জেগেচে···শিউরে উঠলুম,···বুঝি বা এ রাগিণী শুনে নাচের আসর আজ লজ্জায় নীরব থাকে।···

হাত-পা ক্রমে শীতে ঝনঝন্ করতে লাগলো। দু'পকেটে দু'হাত পুরে দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে আমি চক্ষু মুদলুম ! ···হঠাৎ মনে হলো, যেন কার পায়ের শব্দ !···উৎকর্ণ রইলুম। না, ভুল নয় ! পায়ের শব্দ···স্পষ্ট !···

যেদিক থেকে শব্দ এলো, সেদিক পানে চেয়ে রইলুম।

···আলোর দুটো লাল রশ্মি···রেলের গার্ডের হাতে যে লণ্ঠন থাকে,—সেই লণ্ঠনের আলোর মতো···তবে আকারে ছোট ! অন্ধকারের বুকে শুধু দুটো লাল-রশ্মি···আর কিছু দেখা যায় না ! আলোর-রশ্মি দুটো ছায়ান্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে আসছে···এগিয়ে আসছে···আমার দিকে !

দেহে হলো রোমাঞ্চ। দেহের সমস্ত রক্ত যেন প্রচণ্ড ঢেউ তুলে মাথায় উঠে জমলো···

অন্ধকারে

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পাশে ঘুমোচ্ছে শরৎ নাক ডাকিয়ে···তাকে ডাকতে ভুলে গেলুম। হয়তো মনে তখন বাসনা জেগেছিল আমার অজ্ঞাতে···এ বিজয়ের সমস্ত গৌরব-কীর্ত্তি একাই অর্জ্জন করবো!

উঠে দাঁড়ালুম্।

লাঠির মধ্য থেকে শড়কী বার করে উদ্যত রইলুম্! ও দুটো রশ্মি লক্ষ্য করে' দেবো আঘাত!

···তার পর···

আলোর রশ্মি এগিয়ে আ স ছে··· জঙ্গলের গায়ে-গায়ে ···আরো আ গে··· আরো আগে···সঙ্গে ছায়ার মতো মূর্ত্তি··· আপাদ-মস্তক কাপড়ে ঢাকা···



ঠিক! ভূতগুলো এমনি মূর্ত্তি নিয়েই জীবলোকে মানুষের সামনে এসে উদয় হয়···কেতাবে পড়েছি! এই দেওয়াল আমার দুর্গ···শড়কী-হাতে উদ্যত রইলুম···

অন্ধকারে
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আলোর রশ্মি কাছে এলো···আরো কাছে! স্থির চোখে চেয়ে আছি! তার প্রতি গতি-ছন্দ লক্ষ্য করছি!···

ক্রমে সে মূর্ত্তি দিল লাফ···সঙ্গে সঙ্গে হুহুঙ্কার-রব উঠলো! সে এক অমানুষিক রব! আমি এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করলুম না। ছায়া-মূর্ত্তি লক্ষ্য করে' চালালুম আমার হাতের সেই সূচাগ্র-শড়কী···

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ একটা আর্ত্ত ধ্বনি! মূর্ত্তি গেল পড়ে! মনে হলো পিচ্‌কিরি থেকে আবীর-গোলা রক্তের ফোয়ারা ফিন্‌কি দিয়ে ঝরলো···কালো আঁধারের বুকে···আমারো গায়ে···সব লালে লাল!

মাথা গেল ঘুরে···পা টলে। চোখের সামনে···সব মিলিয়ে গেল সে আবীরের বন্যায়···

যখন চোখ চাইলুম, দেখি, বাড়ীর বিছানায় শুয়ে আছি। ব্যাপার শুনলুম পরে।

যে মূর্ত্তিকে রাত্রে বিদ্ধ করেছি, সে ছায়া-মূর্ত্তি নয়···সুরেশ! আমাদের ভয় দেখাতে সে গিয়েছিল গোরস্থানে কৌতুকের লোভে! হাতে নিয়ে ছিল দুটো লণ্ঠন। তাতে লাল কাঁচ-আটা! আপাদ-মস্তক ঢেকেছিল বিছানার চাদরে! আমার শড়কী তার কাঁধে বিঁধেছিল···

তার চীৎকারে শরতের ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমাদের সঙ্গে বাতি ছিল। বাতি জ্বেলে দেখে, সর্ব্বনাশ ঘটে গেছে! আমি অচেতন পড়ে আছি···সুরেশের দেহ রক্তাক্ত!

ছুটে সে বেরিয়ে আসে। তারপর পথ থেকে একা ডেকে এনে একাওলার সাহায্যে আমাদের গাড়ীতে তুলে সে আমাদের বাড়ীতেই দুজনকে নিয়ে আসে! ডাক্তার ডাকা হয়। বাড়ীতে হুলস্থুল বেধে যায়!

অন্ধকারে

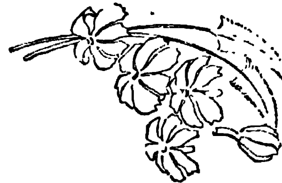
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শুনলুম, সুরেশের রক্তস্রাব বন্ধ হয়েছে···সে চোখ মেলে চেয়েছে, কথাও কয়েছে। তবে যে চোট পেয়েছে, সারতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।

তারপর পুলিশ এসে টানাটানি করতে ছাড়লো না। পুলিশকে বলা হলো মিথ্যা গল্প। অর্থাৎ আমরা কজনে রাত্রে গিয়েছিলুম গোরস্থানে ভূত দেখবার বাসনায়। সেখানে কটা গুণ্ডার আক্রমণ···তারা সুরেশকে আঘাত করে··· আমাকে আঘাত করে···পুলিশ এ-গল্প অবিশ্বাস করেনি।

গুপ্তি-লাঠিটা গোমতীর জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়েছিল।

মানে, ভৌতিক-অভিযানে এমনি বিপত্তির আশঙ্কা আমার মনে জাগে সেই ঘটনার পর থেকে। তার উপর আর কি আশঙ্কা আছে জানো, বাবা?··· আমাদের মনের শক্তি কতখানি, তা আমাদের চিন্তা করবার অবসর বড় হয় না। ভূতের কল্পনা মনে নিয়ে ভূত দেখবার বাসনায় যখন বিভোর থাকি, তখন একটা আব্ছায়া দেখলে, কিম্বা একটা কোনো রকম শব্দ শুনলে মনে কি বেতালা ছন্দ জেগে উঠবে, জানা নেই! ভয়েই মন বিকল হতে পারে! কাল্পনিক বিভীষিকা দেখে সে আতঙ্কে মনের ক্রিয়া হয়তো একেবারেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে! এজন্য এ-সব গল্প শোনো, ক্ষতি নেই! কিন্তু কৌতুক ভরে ভৌতিক তত্ত্বের সন্ধান নিতে যাওয়া···আমি বলবো, মূঢ়তা!





আশ্চর্য্য পরিত্রাণ

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

বিখ্যাত শিকারী গোবিন্দ বাবু বেঁচে নাই সত্যি, কিন্তু এখনো তরতাজা আছে তাঁর শিকারের কাহিনী লেখা খাতাখানি।

যৌবন কাল থেকেই গোবিন্দ বাবুর শিকারের সখ, আর এই উদ্ভট বাতিকে কতবার যে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে তার আর সীমা সংখ্যা নাই।

নানান্ হাত ঘুরতে ঘুরতে খাতাখানি সম্প্রতি এসে পৌছেছে আমাদের কাছে। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ,—পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না। কিন্তু মজা হচ্ছে—একবিন্দু এর অতিরঞ্জিত নয়—একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি।

একবারের ঘটনা গোবিন্দ বাবু তাঁর খাতায় এইভাবে লিখেছেন—

চৈত্র মাসের শেষ,—দুপুরবেলা গৌহাটি থেকে আমাদের বজরা ছাড়লো উত্তর মুখে। ব্রহ্মপুত্রের একটানা স্রোতের বিরুদ্ধে আমরা উজিয়ে চলেছি,—সন্ধ্যার আগেই পৌছাতে হবে, আমাদের গন্তব্য স্থান—একটি গ্রামে; এখানে নাকি বড় শিকারের সন্ধান পাওয়া যায়। আমার সঙ্গে কয়েকটি মাঝি আর বন্ধু শেখর। শেখরও একজন পাকা শিকারী।

আশ্চর্য্য পরিত্রাণ

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

গৌহাটির কাছে কাল আমরা একটা বড় বাঘ শিকার করেছি। তিন চা'র দিন আগে একটা মস্ত কুমীরও ঘায়েল হয়েছে আমার হাতে। কুমীরটা একটা পাহাড়ী লোকের ঠ্যাং ধরে বেশ নিশ্চিন্ত মনে অগাধ জলে চলে যাচ্ছিল। আমি শিকারের খোঁজে তখন ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে ঘুরছিলাম। হঠাৎ একটা করুণ আর্ত্তনাদ শুনে তাকিয়ে দেখি একজন পাহাড়ী লোককে কুমীরে টেনে নিয়ে



যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ আমি বন্দুকের গুলিতে কুমীরটাকে ঘায়েল করে' লোকটাকে বাঁচাই। আর একটু দেরী হলেই লোকটাকে আর উদ্ধার করা যেত না।

সন্ধ্যার তখনো কিছু বাকী—আরো কিছুটা পথ যেতে পারলেই আমরা গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছাতে পারব। মন আনন্দে পরিপূর্ণ।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আকাশের পশ্চিম দিকে একটা কালো মেঘ স্তরে স্তরে জমে উঠ্‌ছে। আমি একটু বিচলিত হয়ে মাঝিদের বল্লাম—"একটু জোরে জোরে হাত চালাও, ঝড় উঠ্‌বে বোধ হয়।"

আশ্চর্য্য পরিত্রাণ

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

শিশুসাথী

আর 'বোধ হয়' কি! আমার কথা শেষ হতে না হতে শোঁ শোঁ করে ঝড় বইতে আরম্ভ করল। মত্ত মাতঙ্গের মত ছুটে এসে একটা প্রকাণ্ড কালো মেঘ সমস্ত আকাশটা ছেলে ফেল্ল,—সঙ্গে সঙ্গে সুরু হোল ঝড় আর বৃষ্টি।

ওঃ—সে কী প্রলয়ঙ্কর ঝড়,—সে কী ভয়ঙ্কর বৃষ্টি! আমি চীৎকার করে' মাঝিদের বল্লাম—"শীগ্গির তীরের দিকে বজরা নিয়ে চল,—আর এগিয়ে কাজ নাই।" শেখরও ভীত হয়ে আমার কথায় সায় দিল।

মাঝিরা প্রাণপণে বজরার দাঁড় টান্‌তে লাগল,—কিন্তু তাদের সাধ্য কি ঝড়ের বিরুদ্ধে তারা একচুলও নৌকা নড়ায়।

ঝড় ক্রমে বেড়ে চলেছে। ব্রহ্মপুত্রের জল উঠছে ফুলে ফুলে—আমাদের বজরাখানিও সেই ঢেউয়ের সাথে সাথে উঠ্‌ছে নাব্‌ছে,—এক একবার এমন হেলে পড়ছে যেন আর বুঝি রক্ষা হয় না।

মাঝির সর্দ্দার প্রাণপণ চেষ্টায় একবার বজরাখানি রক্ষা করতে চেষ্টা করল কিন্তু হায় হায়—তার সমস্ত চেষ্টা হোল বৃথা। ঝড়ের তোড়ে আমাদের নৌকাখানি তীরের মত দিশাহারা হয়ে খানিকটা ছুটে গিয়ে মাঝ দরিয়ায় গেল উল্টে। আমরা সবশুদ্ধ জলে পড়ে গেলাম।

কোথায় গেল শেখর,—কোথায় গেল মাঝির দল—কোনো কিছুই জান্‌তে পারলাম না,—স্রোতের প্রবলটানে ভেসে চল্লাম প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে।

ঝড় সমান ভাবেই চলেছে, তার উপর ঝরে পড়ছে প্রবল বৃষ্টি ধারা। বৃষ্টির কণাগুলি তীরের মত শরীরে এসে বিঁধছে।

ক্রমেই শরীর অবশ হয়ে আসছে! এতক্ষণ কোনো রকমে হাত পা ছুড়ে ভেসে থাক্‌বার চেষ্টা করছিলাম, এবার যেন সে শক্তিও ক্রমে লোপ পেতে লাগল। কোনো রকমে তীরে উঠ্‌তে পারলে হয়,—কিন্তু ঝড় না থাম্‌লে—বৃষ্টি না কমলে, —কূল কিনারার কিছুই সন্ধান পাচ্ছি না।

ছিন্নি গাল্পিক

আশ্চর্য্য পরিত্রাণ

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

ভেসে চলেছি দিশাহারা হয়ে--হঠাৎ দেখি সামনে কালো মতন কি একটা জিনিষ আমার আগে আগে ভেসে চলেছে স্রোতের টানে।

কোনো কাঠের তক্তাটক্তা হবে মনে ভেবে আমি যেই সেটাকে ধরেছি একটু আশ্রয় পাবার জন্যে—হঠাৎ চম্‌কে হাত ছেড়ে দিলাম। বুঝ্‌লাম কাঠ নয়—একটা হাতী ভেসে চলেছে আমার আগে আগে। হাতীটাও বিপন্ন।

বরাং ভালো। সন্ধ্যার আগেই ঝড় বৃষ্টি গেল থেমে—আমি যেন অকূলে কূল দেখতে পেলাম। সাঁতরে গিয়ে তীরে উঠলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সম্পূর্ণ অজানা জায়গা। চারিদিকে গভীর জঙ্গল—এদিকে আমি একেবারে অস্ত্রহীন সঙ্গীহীন অবস্থা। কোথায় এলাম, কোথায় যাব ঠিক করতে না পেরে বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চারিদিকে চাইলাম। একবার শেখর আর মাঝিদের কথা মনে পড়ে গেল। তারা কি আমার মত কূলে উঠ্‌তে পেরেছে,—না—আর ভাব্‌তে পারলাম না।

দূরের থেকে ঘন ঘন বুনো জানোয়ারদের গর্জ্জন কাণে এসে পৌঁছাতে লাগ্‌ল। এ ভাবে থাকা আর নিরাপদ নয় মনে করে' ঠিক করলাম রাতটা একটা গাছে উঠেই কাটাতে হবে,— না হলে নির্ঘাৎ জন্তু জানোয়ারদের পেটে যেতে হবে। কাল ভোরে না হয় কোনো লোকালয়ের সন্ধান করা যাবে।

জামা কাপড়গুলি ভিজে চুপ্‌চুপে হয়ে গেছে। সেগুলিকে যথাসম্ভব নিংড়ে নিয়ে সুবিধামত একটা গাছে উঠে পড়লাম।

ঝড়-বাদল অনেকক্ষণ কেটে গেছে ;—পূর্ণিমা রাত। কিছুক্ষণ পরই আকাশের মাথায় চাঁদ উঠল। সেই চাঁদের আলোতে দেখতে পেলাম, কিছুদূরে একটা ফাঁকা জায়গায় কুটীরের মত কি জানি দেখা যাচ্ছে।

যাক্ বোধ হয় একটা আশ্রয় পাওয়া গেল—এই ভেবে তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে কুটীরটার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। বাস্তবিকই একটা ছোট কুঁড়ে

ঘর,—বাইরে থেকে ঝাঁপ বন্ধ। লোকজন কেউ কোথাও নেই, ঘরের সামনে একটু ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে উঠান। উঠানের মাঝখানে একটা চারকোণা উঁচু পাথর।

কোনো সন্ন্যাসীর আশ্রম ভেবে আমি বেশ নিশ্চিন্ত মনে সেই কুটীরে আশ্রয় নিলাম,—কিন্তু সন্ন্যাসী এই সময় কোথায়—তা ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।

পায়ের ভিজে বুট জুতো জোড়া খুলে সেই চারকোণা পাথরটার উপর রেখে ঝাঁপ খুলে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। যাক্, এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বুনো জন্তুরা আপাততঃ কিছু করতে পারবে না।

ঘরের মধ্যে শোবার কোনো ব্যবস্থা নাই ;—মাটিতে শুয়েই রাত কাটিয়ে দেব ভাবলাম। সন্ন্যাসী যদি এর মধ্যে এসে পড়েন তো ভালোই।

ভালো করে' ঝাঁপটা বন্ধ করতে যাব —এমন সময় কালো যমদূতের মত এক মূর্ত্তি এসে আমার হাত চেপে ধরল। আমি চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি তার পিছনে আরো কয়েকটা এ রকম দানবাকৃতি লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে সবাই তাদের নিজের ভাষায় যেন কি বলে উঠল। একজনের ঘাড়ে প্রকাণ্ড এক ধারালো খাঁড়া। আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। সর্ব্বনাশ, এরা আমাকে কাটবে নাকি ?

একজন আমার হাত ধরে এমন এক হ্যাঁচ্‌কা টান মারলো যে আমি মুখ থুব্‌ড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম।

ততক্ষণে আরো অনেক লোক এসে হাজীর হয়েছে। সকলেই সশস্ত্র,—হাতে হাতে সব ঝক্‌ঝকে বল্লম। নিজেদের মধ্যে কি যে তারা বলাবলি করছে বুঝতে না পারলেও ধারণা করলাম, আমার সম্বন্ধেই নিশ্চয় তারা আলোচনা করছে। মনে হোল খুব চটেছে তারা।—কিন্তু কী আমার অপরাধ ?

একজন এসে আমার ঘাড় ধরে টেনে তুল্ল। তারপর সেই চারকোণা

শিশু সাথী

আশ্চর্য্য পরিত্রাণ

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

পাথরটার কাছে এনে একটা খোঁটার সঙ্গে আমাকে আচ্ছা করে' বেঁধে ফেল্ল। তারপর জুড়ে দিল সবাই মিলে নাচ আর গান। বল্লম উঁচিয়ে সে কী নাচের ঘটা। শুধু একজন বসে বসে মস্ত একটা খাঁড়া পাথরে ঘস্‌তে লাগল আর এক একবার করে' আমার দিকে তাকিয়ে মুচকী মুচকী হাস্‌তে লাগল। আমার তখনকার অবস্থা বর্ণনা করতে আমি অক্ষম। মৃত্যুর জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছি আমি।

শক্ত করে' খুঁটির সঙ্গে আমাকে আস্টে পৃস্টে বাঁধা হয়েছে। বেশ বুঝতে পারলাম,—আমার আয়ু আর বেশীক্ষণ নাই। ঐ খাঁড়ার ঘায়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মুণ্ডু ধড় থেকে খসে পড়বে। অন্য কেউ হলে এ অবস্থায় হয় তো অজ্ঞান হয়ে যেত,—আমার শিকারীর প্রাণ বড় কঠিন,—কাজেই আমি একটুও জ্ঞান হারালাম না।

লোকগুলি এইবার নাচ থামিয়ে আমাকে ঘিরে বসল। যে লোকটা খাঁড়া ধার দিচ্ছিল—সেও তার কাজ শেষ করে' খাঁড়াটাকে পাশে রেখে চুপ্ করে' বসে রইল। মনে হোলো সবাই যেন কার প্রতীক্ষা করছে। হয়তো তাদের দলপতি এখনো এসে পৌঁছায় নি। সে এলেই তার ইঙ্গিত মত কাজ হাসিল করা হবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জঙ্গলের মধ্যে ঢাকের শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হোলো কারা যেন ঢাক বাজিয়ে এগিয়ে আস্‌ছে। ঢাকের শব্দ শুনে সমস্ত লোকগুলি উঠে দাঁড়াল। আন্দাজে বুঝলাম দলপতি আস্‌ছে।

আমার অনুমানই ঠিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই দলপতি এসে উপস্থিত হোলো তার আগে দু'জন মশালধারী, পিছনে কয়েকটি লোক ঢাক বাজাচ্ছে আর অদ্ভুত ঢংয়ে গান গাইছে।

দলপতি আস্‌তেই আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সকলে চীৎকার করে উঠল। বুঝ্‌লাম আমার সম্বন্ধে অনুযোগ করা হচ্ছে। হায় হায় হায়,—পথ-



পৃথিবীকে গল্পিকে

ভ্রান্ত, পরিশ্রান্ত পথিক আমি সামান্য একটু আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এই কুটীরে এসেছি —এতেই আমার এত অপরাধ !!

দলপতি একবার হুঙ্কার করে উঠল—তারপর ইসারা করল সেই খড়গধারী লোকটিকে। ভয়ঙ্কর লোকটা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর সেই খাঁড়াখানা কাঁধে নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। এইবার কেবল মাত্র আর একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষা।

দলপতি আঙুল নেড়ে ইসারা করল। আমার চোখের সামনে সেই প্রকাণ্ড খাঁড়াখানা একবার নেচে দুলে শূন্যে উঠল—তারপর—

তারপর যা ঘটল, তা গল্পের ব্যাপার বলেই মনে হবে। যে মুহূর্ত্তে খাঁড়াখানা আমার গর্দ্দানে পড়তে যাবে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দলপতি রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এসে সেই লোকটার খাঁড়াশুদ্ধ হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল,—লোকটার হাত থেকে খাঁড়াখানা সশব্দে মাটিতে খসে পড়ল।

সবাই স্তম্ভিত—আমি হতভম্ভ। একি—কী হতে—কী হোলো !

দলপতি মশালটা আমার মুখের সামনে ধরে' ভালো করে আমার মুখটা দেখল, তারপর নিজের হাতে আমার বাঁধন খুলে দিয়ে—ভাঙা-ভাঙা পাহাড়ী ভাষায় যা বল্লে তার মানে হচ্ছে—এই

—'পাহাড়ীরা দুর্ব্বৃত্ত হলেও উপকারীর কখনো অপকার করে না। কয়েকদিন আগে গোহাটীর কাছে তুমি আমাকে কুমীরের কবল থেকে বাঁচিয়েছিলে—তার পুরস্কার স্বরূপ আজ পেলে এই মুক্তি, তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি —দেবতাকে ধন্যবাদ। এই দ্যাখো আমার পায়ে এখনো কুমীরের কামড়ের দাগ শুকোয়নি—' এই বলে সে তার হাঁটুখানা তুলে আমাকে দেখাল।

দলপতি আবার বলতে লাগল—'গুরুতর অপরাধে আজ তোমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে আমাদের দেবতার উৎসব হয়। এটাই আমাদের দেবতার মন্দির। ঐ চারকোণা পাথর হচ্ছে আমাদের দেবতা।

তুমি অতি গর্হিত কাজ করেছ—ঐ দেবতার মাথায় তোমার জুতো রেখেছ—আর নিজে মন্দিরে প্রবেশ করেছ। একমাত্র আমাদের পূজারী ভিন্ন আর কারুর এই মন্দিরে প্রবেশ করবার হুকুম নাই। যে প্রবেশ করবে তার মৃত্যুদণ্ড। তোমার ভাগ্যেও তাই ছিল—কিন্তু বরাৎ জোরে তুমি আজ রক্ষা পেয়ে গেলে। বুনোরা অসভ্য হলেও অকৃতজ্ঞ নয়।'

সমস্ত ব্যাপারটা এবার আমার কাছে জলের মত সোজা হয়ে গেল। কৃতজ্ঞতায় আমার বুক ভরে উঠল আমি হাঁটু গেড়ে দলপতির কাছে এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম!

বলা বাহুল্য দলপতির সাহায্যে পরদিন সকালেই আমি গৌহাটী পৌছাতে পেরেছিলাম।





এ-যুগের সব-চেয়ে বড় ডাকাত

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সত্য কাহিনী

এক

আজ পর্য্যন্ত অনেক ডাকাত ও খুনীর গল্প শোনা গেছে, কিন্তু ফরাসী ডাকাত বোনোটের ভয়ঙ্কর দলের কাছে সে-সব গল্প হচ্ছে খুব ঠাণ্ডা গল্প!

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বরের সকাল-বেলায় ঝর্-ঝর্ ক'রে বৃষ্টি ঝরছে।

প্যারিসের এক বড় ব্যাঙ্ক সবে দরজা খুলেছে। কেবি ও পীম্যান নামে ব্যাঙ্কের দুই কর্ম্মচারী কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে এখনি আসবে, কর্ত্তৃপক্ষ তাদেরই জন্যে অপেক্ষা করছেন।

ব্যাঙ্কের কাছেই রাস্তার উপরে একখানা মোটর-গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—তার জান্‌লা-দরজা বন্ধ, কিন্তু মেসিন বন্ধ নয়।

এ-যুগের সব-চেয়ে বড় ডাকাত

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কেবি ও পীম্যানকে দেখা গেল,—তারা গল্প করতে করতে ব্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে আসছে।

তারা ব্যাঙ্কের দরজার কাছে এল। হঠাৎ বন্ধ মোটর-গাড়ীর দরজা খুলে দুজন লোক রাস্তার উপরে লাফিয়ে পড়ল—তাদের হাতে রিভলবার!

তাদের রিভলভার গর্জ্জন করলে—কেবি মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল। একজন লোক তার হাতের টাকার ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করতে লাগল, কিন্তু কেবি আহত হয়েও ব্যাগ ছাড়তে রাজি নয় দেখে সে আবার রিভলভার ছুড়ে তাকে একেবারে কাবু ক'রে ফেললে। তারপর সে ব্যাগ নিয়ে একলাফে মোটরের উপরে চ'ড়ে বসল।

রাস্তা তখন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। অনেক লোক মোটরের দিকে ছুটে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে মোটরের ভিতর থেকে দুদিকে দুখানা হাত বেরিয়ে পড়ল—প্রত্যেক হাতেই এক-একটা রিভলভার অগ্নি উদ্গার করছে! জনতার বীরত্ব উপে গেল—যে যেদিকে পারলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে। একখানা লরি পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না—মোটরখানা তীরের মতন বেগে তাকে এড়িয়ে চোখের আড়ালে চ'লে গেল।

পুলিসের টনক্ নড়ল। তাদের চরেরা চারিদিকে খোঁজ নিয়ে এসে খবর দিলে, মোটরের মধ্যে ছিল বোনোট্ নামে একজন লোক ও তার সঙ্গীরা। মোটরখানাও একটা নদীর ধারে পাওয়া গেল—সেখানা চুরি-করা মোটর।

কিন্তু বোনোট্‌কে পুলিস কিছুতেই আর ধরতে পারে না! সে ভারি চালাক—আজ এ-বাসা, কাল ও-বাসা ক'রে বেড়াতে লাগল, কোথাও দু-একদিনের বেশী থাকে না। পুলিস যখনি খোঁজ পেয়ে তাকে ধরতে যায়, তখনি গিয়ে দেখে বোনোট্ আগেই তাদের ফাঁকি দিয়ে স'রে পড়েছে! এইভাবে এগারো বার সে পুলিসের চোখে ধূলো দিলে।

এ-যুগের সব-চেয়ে বড় ডাকাত

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

থিয়েইস্ নামক স্থানে দুজন ধনী লোক বাস করত—স্বামী ও স্ত্রী। এক রাত্রে কারা তাদের খুন ক'রে অনেক টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। পুলিস সন্ধান নিয়ে জান্‌লে, এ হচ্ছে বোনোটের দলের কাজ।

একদিন একজন পুলিসের লোক হঠাৎ দেখতে পেলে, চমৎকার একখানা মোটর চালিয়ে বোনোট্ রাজপথ দিয়ে যাচ্ছে। সে একলাফে মোটরের পা-দানীর উপরে উঠে পড়ল—কিন্তু বোনোটের গুলি খেয়ে পরমুহূর্ত্তেই তাকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হ'ল। সে মোটরখানাকেও পরে সহরের এক-জায়গায় ভাঙা-চোরা অবস্থায় পাওয়া গেল এবং সেখানাও চুরি-করা মোটর।

মাসখানেক পরে কাউন্ট রোগেট তার মোটরে চ'ড়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, আচম্বিতে তিনজন বন্দুকধারী লোক এসে গাড়ী থামিয়ে বললে, "গাড়ীখানা এখনি আমাদের ছেড়ে দিতে হবে।"

ড্রাইভার ইতস্ততঃ করলে—সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলিতে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। কাউন্ট গাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু তিনিও গুলি খেয়ে যত জোরে পারেন পা চালিয়ে দিলেন।

বন্দুকধারীরা হচ্ছে বোনোট্ ও তার দুইজন সঙ্গী। কাউন্টের গাড়ীতে আরো কয়েকজন দলের লোককে তুলে নিয়ে তারা আর এক ব্যাঙ্কের দরজায় এসে দাঁড়াল। তারপর দরজায় দুইজন লোককে পাহারা দেবার জন্যে রেখে তিনজন সঙ্গী নিয়ে বোনোট্ বুক ফুলিয়ে ব্যাঙ্কের ভিতরে প্রবেশ করল।

তারপর তারা দুচোখো গুলি চালাতে লাগ্‌ল। ব্যাঙ্কের তিনজন লোককে হত ও আহত ক'রে ভাণ্ডার লুটে টাকা নিয়ে ডাকাতের দল আবার স'রে পড়ল।

এবারে পুলিস অনেকটা সাবধান হয়েই ছিল। মোটরে ও মোটর-বাইকে চ'ড়ে দলে দলে পুলিস ডাকাতদের পিছনে পিছনে ছুটল।

কিন্তু তাদের কাছে যায় কার সাধ্য! গাড়ীর ভিতর থেকে রাশি রাশি গুলি ছুটে আসছে! একটা ষ্টেশনের কাছে এসে ডাকাতরা মোটর থেকে নেমে ট্রেণে চ'ড়ে বসল। পুলিসের লোকরা পরের ষ্টেশনে গিয়ে তাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তার আগেই পথের একটা বাঁকের মুখে এসে ট্রেণ যখন তার গতি কমিয়ে দিলে, বোনোট্ নিজের লোকজন নিয়ে গাড়ী থেকে অদৃশ্য হ'ল।

প্যারিসের সমস্ত লোক ক্ষেপে উঠে বলতে লাগল—পুলিস কোন কাজের নয়, তাদের অকর্ম্মণ্যতায় আমরা এইবারে ধনে-প্রাণে মারা পড়ব।

পুলিসের বড়কর্ত্তা প্রমাদ গুণে নিজেই কোমর বেঁধে কার্য্যক্ষেত্রে নামলেন। এমন ভয়ানক সাহসী ডাকাতের কথা তিনি কখনো শোনেন নি। ইচ্ছা করলে এরা অনায়াসেই বিদেশে গিয়ে পুলিসকে কলা দেখাতে পারে, কিন্তু তা না ক'রে পুলিসের চোখের সামনেই সহরে ব'সে এরা যা-খুসি-তাই করছে! পুলিসের বড়সাহেব বোনোট্‌কে আবিষ্কার করবার জন্যে একশো কুড়িজন ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করলেন!

দুই

গজির ব্যবসা ছিল চোরাই মাল কেনা। পুলিস সে খবর রাখত। ডিটেক্‌টিভ জোইন ও কোল্‌মার একদিন সদলবলে গজির বাসায় গিয়ে বললেন, "তুমি নিশ্চয় বোনোটের খবর রাখো। শীগ্‌গির তার ঠিকানা বল।"

গজি বললে, "দোতালার একটা ঘরে একখানা খাতায় বোনোটের ঠিকানা লেখা আছে। আমি এখনি গিয়ে নিয়ে আসচি।"

জোইন ও কোল্‌মারের কেমন সন্দেহ হ'ল, তাঁরাও গজির সঙ্গে সঙ্গে উপরে গেলেন।

একটা ঘরের সাম্নে গিয়ে গজি বললে, "ঐ যাঃ, ঘরের চাবিটা নীচে ফেলে এসেচি। আপনারা একটু দাঁড়ান, চাবি নিয়ে আমি এখনি ফিরে আসচি।"—সে আবার একতালায় নেমে গেল।

কিন্তু ঘরের দরজায় চাবি দেওয়া ছিল না, কারণ কোল্‌মার ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল!

জোইন ও কোল্‌মার রিভল্‌ভার বার ক'রে ঘরের ভিতরে ঢুক্‌লেন—তৎক্ষণাৎ নিবিড় অন্ধকার ভেদ ক'রে আর একটা রিভলভারের অগ্নিশিখা সশব্দে গর্জ্জে উঠল!

কোল্‌মার তখনি সেইদিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অন্ধকারেই কাকে দুইহাতে জড়িয়ে ধ'রে মাটির উপরে পেড়ে ফেললেন।

কিন্তু সে কাবু না হয়ে উল্টে রিভলভার ছুঁড়ে কোল্‌মারকেই জখম করলে। তারপর জোইনের পালা! বোনোটের রিভলভার আবার অগ্নিবৃষ্টি করলে, জোইন্‌ও ধরাশায়ী হলেন।

রিভলভারের শব্দে নীচে থেকে একজন পুলিসের লোক ছুটে এল। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সে দেখলে, ঘরের মেঝের উপরে রক্তগঙ্গার মাঝখানে তিন-তিনটে মৃতদেহ স্থির হয়ে প'ড়ে রয়েছে। তার পায়ের শব্দ পেয়ে বোনোটও মৃত্যুর ভাণ ক'রে আড়ষ্ট হয়ে রইল!

পাহারাওয়ালাটা তাড়াতাড়ি খবর দেবার জন্যে আবার নীচের দিকে ছুটল। সেই ফাঁকে উঠে প'ড়ে বোনোট্ জান্‌লা খুলে বেরিয়ে ছাদে চ'ড়ে চম্পট দিলে!

তিনদিন পরে বোনোট্, গ্রেণঘড্ নামে এক দপ্তরীকে আক্রমণ ও আহত করলে। সে মিথ্যা সন্দেহ করেছিল যে, ঐ দপ্তরীই তার বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে!

এ-যুগের সব-চেয়ে বড় ডাকাত
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তিন

ডুবইস্ ছিল বোনোটের বিশেষ বন্ধু। গোয়েন্দারা খবর পেলে বোনোট্ তার বন্ধুর মোটরগাড়ীর কারখানায় লুকিয়ে আছে।

তখনি পুলিসের ফৌজ সেইদিকে ছুটল।

বোনোট্ তখন কারখানার বাইরে একখানা মোটর-বাইকে চড়বার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ পুলিসের আবির্ভাব দেখেই সে বাড়ীর বাইরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে ছুটল এবং সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারও ছুঁড়তে লাগল। দুজন ইন্স্পেক্টর তার অব্যর্থ লক্ষ্যে আহত হলেন। পুলিসের পল্টনও বাড়ী আক্রমণ করলে, কিন্তু অশ্রান্ত গুলিবৃষ্টির চোটে সকলে আবার পিছিয়ে আসতে বাধ্য হ'ল।

কারখানা-বাড়ীটা ছিল একেবারে খোলা জায়গায়। কোনো দিক দিয়েই লুকিয়ে তার কাছে এগুবার উপায় ছিল না।

চারিদিক থেকে খবর পেয়ে দলে দলে লোক বন্দুক প্রভৃতি নিয়ে ছুটে এল—পুলিসকে সাহায্য করবার জন্যে।

কিন্তু বোনোট্ ও তার স্যাঙাত ডুবইসের রিভলভারের ঘন ঘন গর্জ্জন শুনে কেউই আর বাড়ীর কাছে ঘেঁষ্‌তে ভরষা করলে না!

বেলা দশটার সময়ে পুলিস-সাহেব বুঝলেন, কেবল পাহারাওয়ালাদের সাহায্যে বোনোট্‌কে বন্দী করা যাবে না! তখন খবর দিয়ে সৈন্যদের আনানো হ'ল।

খড়ে-বোঝাই মালগাড়ীর আড়ালে লুকিয়ে সৈন্যরা ডিনামাইট দিয়ে বাড়ীর দেওয়ালের খানিকটা উড়িয়ে দিলে।

কিন্তু তবু বিশেষ সুবিধা হ'ল না। বরং ভাঙা দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বোনোট্ ও ডুবইসের বন্দুক আরো বেশী গুলিবৃষ্টি করবার সুযোগ পেলে!

এ্যাড্‌ভেঞ্চার

এ-যুগের সব-চেয়ে বড় ডাকাত

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বৈকাল পর্য্যন্ত সমান যুদ্ধ চলল—একপক্ষে পুলিস-বাহিনী, সৈন্যদল ও সারা সহরের বাসিন্দা ও অন্য পক্ষে মাত্র ছুটি প্রাণী! এমন যুদ্ধ কখনো হয় নি!

কিন্তু অসম্ভব কবে সম্ভবপর হয়? সৈন্যরা ডিনামাইটের সাহায্যে বাড়ীর আরো-খানিকটা ভেঙে ফেলে তার চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দিলে।



তারপর সকলে এক-সঙ্গে বাড়ীখানাকে আক্রমণ করলে।

বাড়ীর ভিতর থেকে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

নীচের তালায় দেখা গেল, ডুবইসের মৃতদেহ প'ড়ে রয়েছে, তার গায়ে তিন-তিনটে গুলির চিহ্ন! উপর-তালার ভগ্নস্তূপের ভিতরে গিয়ে পুলিস-সাহেব প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলেন না।

তারপর দেখলেন, রাশীকৃত আজে-বাজে জিনিষের তলা থেকে একখানা হাত দেখা যাচ্ছে এবং সেই হাতে রয়েছে একটা রিভলভার!

হাতশুদ্ধ রিভলভারটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে আর-একবার অগ্নিবৃষ্টি করলে!

সেইসঙ্গে পুলিস-সাহেবও রিভলভার ছুঁড়লেন।

হাতখানা নেতিয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

সেই হাত ধ'রে পুলিস-সাহেব বোনোট্‌কে টেনে বার করলেন।

বোনোটের তখন প্রায়-অজ্ঞান অবস্থা। তার দেহের বারো জায়গায় ও মাথার তিন জায়গায় বুলেটের ক্ষতচিহ্ন!

সহরের বাসিন্দারা বোনোটের দেহকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলবার উপক্রম করলে। অনেক কষ্টে তাদের নিবারণ ক'রে বোনোট্‌কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিন্তু বিশ মিনিট পরেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

তার জামার ভিতরে পাওয়া গেল এই লেখাটুকু:

"আমি আমারই মত জীবনযাপন করব। প্রত্যেক লোকেরই বাঁচবার অধিকার আছে। কিন্তু তোমাদের ঐ পাপী ও নির্বোধ সমাজ যখন আমাকে বাঁচতে দিতে রাজি নয়, তখন কি আর করা যায়? আমাকে মরতেই হ'ল!"

চার

ডাকাত-সর্দ্দার বোনোট্ মরল বটে, কিন্তু তার ডানহাত ও বামহাত এখনো বেঁচে আছে। তার দল এখনো ভাঙে নি।

গার্ণিয়ার আর ভ্যালেট, এরাই ছিল বোনোটের ডানহাত আর বামহাতের মত।

কিন্তু সারা দেশের চোখে তারা কতদিন ধূলো দিতে পারে? হপ্তাদুয়েক পরে খবর পাওয়া গেল, তারা নদীর ধারে একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে বাস করছে! কেবল তাই নয়, দরকার হ'লে লড়াই করবার জন্যে তারা এই বাড়ী-খানাকে কেল্লার রসদখানায় পরিণত করেছে এবং এ বাড়ীখানাও এমন জায়গায় আছে যে কোনদিক থেকেই লুকিয়ে তার কাছে ঘেঁষ্‌বার উপায় নেই।

তখনি বাড়ীখানাকে অবরোধ করবার ব্যবস্থা হ'ল। চৌদ্দখানা মোটর ভর্ত্তি

ক'রে পুলিসের লোক ছুটল এবং তাদের সঙ্গে চলল শত শত সৈন্য, কলের-কামান-শ্রেণী ও অনেকগুলো সার্চ্চলাইট! এ যেন কোন দেশজয়ের আয়োজন!

আক্রমণকারীরা যথাস্থানে হাজির হয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, খবর পেয়ে তাদের আগেই হাজার হাজার লোক শত শত মোটরে চ'ড়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে!

তখন রাতের বেলা। উজ্জ্বল সার্চ্চ-লাইটগুলো কিন্তু রাতকেও দিন ক'রে ফেললে। বড় বড় লোহার থামের আড়ালে দেহ ঢেকে পুলিস ও ফৌজ ডাকাতদের বাড়ী আক্রমণ করলে, কলের কামানগুলো চেঁচিয়ে লোকের কাণে তালা ধরিয়ে দিতে লাগল, এবং চতুর্দ্দিক কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, থেকে থেকে ডিনামাইটের গভীর গর্জ্জনে!

গার্ণিয়ার ও ভ্যালেট্‌ও হাত গুটিয়ে ব'সে রইল না, তাদেরও বন্দুকের গুলিতে আক্রমণকারীদের কেউ কেউ হত ও আহত হ'ল।

নয় ঘন্টা ধ'রে যুদ্ধ চলল অশ্রান্ত ভাবে। অসংখ্যের বিরুদ্ধে মাত্র দুইজনের আত্মরক্ষার এমন কাহিনী কোন ইতিহাসেই লেখা নেই।

রাত চারটের সময়ে বন্দুক, রিভলভার ও কলের কামানের অগ্নিবৃষ্টিতে ক্ষতবিক্ষত সেই ছোট বাড়ীখানা ডিনামাইটের মুখে প্রায় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল।

কিন্তু তখনো তার ভিতর থেকে আর একবার বুলেটের ঝড় ছুটে এল—সেই শেষ-বার! তারপর সব চুপচাপ। পুলিস ও সৈন্যগণ সেখানে গিয়ে পেলে কেবল গার্ণিয়ার ও ভ্যালেটের মৃতদেহ। অসংখ্য গুলির চোটে তাদের দেহ ঝাঁজ্‌রা হয়ে গেছে।

কিছুদিনের ভিতরেই বোনোট্‌-সম্প্রদায়ের আর সব লোকও ধরা পড়ল। অনেকের যাবজ্জীবন জেল হ'ল এবং অনেকে গিলোটিনে প্রাণ দিলে। কেউ করলে আত্মহত্যা।

কিন্তু বোনোটের দলের কেউ কম যায় না। ক্যারুয়ি নামে বোনোটের এক সঙ্গীকে পুলিস গ্রেপ্তার করলে। কিন্তু পাছে সে আত্মহত্যা করে এই ভয়ে তাকে উলঙ্গ অবস্থায় জেলখানায় বন্ধ ক'রে রাখা হ'ল। তবু একদিন সে ফাঁক পেয়ে বানরের মত দেওয়াল বয়ে পাঁচ-তালার ছাদের উপরে গিয়ে উঠল এবং চীৎকার ক'রে বললে, "ঘড়ীতে যেই বারোটা বাজবে, অমনি আমি এখান থেকে লাফিয়ে প'ড়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেব !"

জেলের কর্ত্তা কাকুতি-মিনতি ক'রে বললেন, "ছিঃ, অমন কাজ কি করতে আছে ? লক্ষ্মী-ছেলেটির মতন নীচে নেমে এস !"

ক্যারুয়ি সে কথা আমোলেই আনলে না।

জেলের কর্ত্তা তখন পাঁচতালার ছাদে লোক পাঠিয়ে তাকে ধরবার উদ্যোগ করলেন। ক্যারুয়ি তখন কাকুতি-মিনতি ক'রে বললে, "ছিঃ, অমন কাজ কি করতে আছে ? বেলা বারোটার আগে কারুকে ওপরে পাঠিও না, তাহ'লে আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে যে !"

জেলের কর্ত্তা তার কথা আমোলেই আনলেন না, তাকে ধরবার জন্যে লোক পাঠালেন। কিন্তু সে লোক উপরে আসবার আগেই ক্যারুয়ি ছাদ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে প্রাণত্যাগ করলে !

এই বোনোট্ ও তার দলবলের কথা মাঝে মাঝে যখন ভাবি তখন মনে হয় যে, বিপথে চালিত হ'য়ে এদের এমন্ অতুলনীয় বীরত্বও ব্যর্থ হয়ে গেল ! নিজেদের সাহস ও শক্তির অপব্যবহার না করলে পৃথিবীর শ্রদ্ধা-পূজা লাভ ক'রে আজ হয়তো তারা নিত্যস্মরণীয় হ'তে পারত।

হিংস্রুক পশুজীবন যাপন করে বলেই বাঘ-সিংহকে কেউ বীর ব'লে ডাকে না।


পুরানের গল্প



মণি কুণ্ডল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

উতঙ্ক ছিল খুব শান্ত আর ধারালো ছেলে। বেদ-ঋষির আশ্রমে যতগুলি ছেলে পড়াশুনা ক'রতো, তাদের ভিতর উতঙ্কের মত বুদ্ধিমান ছেলে আর কেউ ছিল না! সেই আট বছর বয়েসে হ'য়েছে তার পৈতে, তখন থেকেই পড়তে সুরু ক'রেছে বেদ-ঋষির আশ্রমে। তাই ব'লে সে সব সময়ই যে শুধু বই নিয়ে ব'সে থাকে, তা নয়। যখনি অবসর পায়, গুরুদেবের নানা কাজ ক'রে দেয়; আশ্রমের গাছপালাগুলির যত্ন করে, কপিলা গাইটীকে কচি কচি ঘাস এনে দেয়, জল খাওয়ায়—এমনি কত কাজ করে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বারোটি বছর কেটে গেল। উতঙ্কের পড়া শেষ হ'য়ে গেছে, তবু সে বাড়ী যায় নি। গুরুদেব গেছেন রাজা জনমেজয়ের সভায় যজ্ঞ ক'রতে, উতঙ্কের ওপর আশ্রম রক্ষার ভার দিয়ে। তার মত ছেলের ওপর কাজের ভার দিলে একটুও ভাবনা থাকেনা, তাই।

মণিকুণ্ডল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন পরে গুরুদেব যখন আশ্রমে ফিরে এলেন, হঠাৎ তিনি অবাক্ হ'য়ে গেলেন আশ্রমের চেহারা দেখে। সে যেন কত বদ্‌লে গেছে! সবুজ গাছগুলিতে থরে থরে ফুল ধরেছে; দুধকলমি আর অপরাজিতার লতায় মণ্ডপটী ছেয়ে গেছে; একটুও রোদ লাগবে না গায়ে। এবার তিনি নিশ্চিন্তে ব'সে সেখানে বেদ পাঠ ক'র্‌বেন।

গুরুদেব যতদিন ছিলেন না, ততদিন উতঙ্ক নিজেই অন্য ছাত্রদের পড়াতো। গুরুদেব আসবার আগে সে তাদের পড়া অনেক এগিয়ে দিয়েছে। ঋষি উতঙ্কের এই সব কাজকর্ম্ম দেখে খুব খুসী হ'লেন; আর কত যে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌লেন, তার সীমা নাই।

তখন লেখাপড়া শেষ হ'লে পরীক্ষাও দিতে হ'ত না, আর পাশ ফেলের কোন উপাধিও ছিল না। গুরুগৃহে যখন পড়া শেষ হ'য়ে যেত, তখন গুরুদেব শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় দিতেন। উতঙ্কও এবার ঋষির কাছে বিদায় চাইলে। ঋষি উতঙ্ককে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় হাত দিয়ে ব'ল্‌লেন—'দিগ্বিজয়ী হও'।

উতঙ্ক গুরুদেবের চরণ বন্দনা ক'রে বল্‌লে—'গুরুদেব, আপনার কাছে আমি যে বিদ্যালাভ করেছি, তার উপযুক্ত কোন দক্ষিণা দেবার সাধ্য আমার নাই। তবু আমায় আদেশ করুন—কি দক্ষিণা দিয়ে আমি ধন্য হব।'

গুরুদেব হেসে বল্‌লেন—'তোমার কাছে কোন দক্ষিণাই চাই না বৎস। ভক্তি আর সেবা দিয়ে তুমি যে গুরুদক্ষিণা দিলে, তার তুলনা নাই। আশ্রমের হরিণ-শিশুটি পর্য্যন্ত তোমায় ভাসবাসে। তুমি আশ্রম ছেড়ে গেলে, এই বকুল—শেফালি—চাঁপা, ছাতিমগাছের ওপাশে মাধবীলতার মণ্ডপ—সবই তোমার জন্য কাঁদবে। তোমার মত যত্ন আর কেউ করবে না তাদের।'

কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে গুরুদেবের চোখে জল এল। উতঙ্ক তাঁর পদধূলি মাথায়

নিয়ে গুরুপত্নীর কাছে গেল। তিনি তখন কপিলার গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন; আমলকী গাছের ছায়ায় অলসভাবে চোখ দুটি বন্ধ ক'রে কপিলা জাবর কাটছিল।

উতঙ্ক ধীরে ধীরে এসে তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ব'ল্‌লে—'আমায় বিদায় দিতে হবে এবার। এতকাল মায়ের মত স্নেহ ক'রেছেন; আমি কোন প্রতিদানই দিতে পারি নি। আজ আমার পড়া শেষ হ'ল; এবার দেশে ফিরে যাবো। কি দক্ষিণা পেয়ে আপনি খুসী হবেন, তা জানি না। তবে জানলে, আমি নিশ্চয় প্রাণপণ চেষ্টা ক'রবো।'

গুরুপত্নী কিছুক্ষণ চুপ চাপ তার মুখপানে চেয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ কি ভেবে ব'ল্‌লেন—'পার্‌বে উতঙ্ক ?'

উতঙ্ক মাথা নীচু করে' জানালে—সে পার্‌বে; অন্ততঃ প্রাণপণ চেষ্টা ক'রবে। তবে এখন তাঁদের আশীর্ব্বাদ।

বেদপত্নী হেসে ব'ল্‌লেন—'পৌষ্যরাজের পাটরাণীর কাণে যে মণিময় কুণ্ডল আছে, সেই কুণ্ডল দুটি আমার খুব ভাল লাগে। মনে হয়, ঐ কুণ্ডল যদি কোন দিন পাই, আমার সব সাধ মিট্‌বে। কিন্তু সে কি হবে উতঙ্ক ?'

'হবে মা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন। আমি যেমন ক'রে পারি সেই কুণ্ডল এনে আপনার হাতে দেবো।'—ব'লে উতঙ্ক গুরুপত্নীকে আর একবার প্রণাম ক'রে রওনা হ'ল।

কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল ছাড়িয়ে উতঙ্ক চল্‌লো পৌষ্যরাজ্যের পথে। সেই অচেনা দেশে একা চল্‌তে তাঁর একটুও ভয় হ'ল না। দু'দিকে ভীষণ অরণ্যের ভিতর কোথাও সিংহ গর্জ্জন করে' ওঠে; কোথাও বাঘের বোট্‌কা গন্ধে গা শিউ্‌রে ওঠে। কিন্তু দক্ষিণা দেবার জন্যে তার মনে যে কত

আশা, তা অন্যে কেমন করে বুঝ্‌বে ? বড় বড় ফাটল, গহ্বর, কাঁটাবন পার হ'য়ে উতঙ্ক এগিয়ে চলে শুধু বুকের বলে।

পূরো দুটি মাস সমানে পথ চলার পর উতঙ্ক রাজধানীতে এসে হাজির হ'ল।

কারো কাছে কোন কথা না জানিয়ে সে বরাবর রাজার সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। উতঙ্কের বুকের মধ্যে তখন ঢিপঢিপ ক'রছে ; কি জানি, যদি রাজা না দেন ! তা হ'লে কি উপায় হবে ?

কিন্তু তা হ'ল না। উতঙ্ক রাজার কাছে সকল কথা জানালে। রাজা তার গুরুভক্তি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তখনি কুণ্ডল দুটি এনে উপহার দিলেন। উতঙ্কের মন খুসীতে ভ'রে উঠ্‌লো।

দুদিন সেখানে থাকবার জন্যে রাজা তাকে অনেক ক'রে বল্‌লেন। কিন্তু আর একটা দিনও সে দেরী ক'র্‌লে না। আশ্রমের পথে আবার চল্‌তে সুরু ক'র্‌লে। রাজা উতঙ্ককে বিশেষ ভাবে জানিয়ে দিলেন যে, ঐ কুণ্ডল দুটির ওপর সব রাণীদের লোভ। যেন কেউ টের না পায়।

এবার উতঙ্ক যেন দ্বিগুণ জোরে পথ চল্‌তে লাগ্‌লো। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। মনের আনন্দে তার বুকখানা উঁচু হ'য়ে উঠেছে।

দু'দিকে পাহাড় আর জঙ্গল, তারি মাঝখান দিয়ে উপত্যকার ফাঁকে ফাঁকে আঁকবাঁকা সরু পথ। সেদিকে জনমানবের চলাচল নাই। পথের পাশে মাঝে মাঝে এক-একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ী সাপ নড়ে' চড়ে' উঠ্‌চে ; ক্বচিৎ এক একটা নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁরা কথা বলেন না, আপন মনে হন্‌হনিয়ে উতঙ্কের পাশ কাটিয়ে চ'লে যান্‌।

জঙ্গলের পথ ছাড়িয়ে উতঙ্ক মাঠের পথ ধর্‌লো। তার শরীর তখন খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। জঙ্গলের পথে এতদূর এসে সারা গা ময়লা মাটিতে ভ'রে গেছে।

মণিকুণ্ডল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

এবার উতঙ্ক অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটী সরোবরের ধারে এসে দাঁড়ালো। স্নান আহ্নিক সেরে নিয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে আবার সে চল্‌তে সুরু ক'র্‌বে। —পরিষ্কার টল্‌টলে জল, তার ওপর অসংখ্য পদ্ম আর কুমুদ ফুল ফুটেছে।

জিনিষপত্র গুলি সযত্নে গুছিয়ে রেখে উতঙ্ক মনের আনন্দে জলে নাম্‌লো। এমন সুন্দর জলে যেন সে কতকাল স্নান করে নি। স্নান ক'রে উতঙ্ক জলে দাঁড়িয়েই আহ্নিক পূজো সেরে নিলে। তারপর গোটাকয়েক পদ্মের মৃণাল খেয়ে, অঞ্জলি অঞ্জলি জল পান ক'রে সে যেন কতকটা সুস্থ হ'ল।



ওপরে এসে উতঙ্কের মাথা ঘুরে' গেল। তার জিনিসপত্রগুলি সেখানে নাই; কে নিয়ে পালিয়েছে। উতঙ্ক চারিদিকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লো; কোথাও নাই, লোকজনও দেখা যায় না। তার বুক ঠেলে কান্না আস্‌বার উপক্রম হ'ল। এত কষ্ট ক'রেও কি সে শেষ পর্য্যন্ত গুরুদক্ষিণা দিতে পার্‌বে না!

মণিকুণ্ডল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

উতঙ্ক পাগলের মত ছুটে চ'ল্‌লো সেই বনের পথে। যেখানে পায়ের শব্দ পায়, সেইদিকে ছুটে চলে। কিন্তু কারো সন্ধান মেলে না। শেষে এক নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে হ'ল তার দেখা। সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধ'রে উতঙ্ক কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ল্‌লে—"ঠাকুর! কে আমার মণিকুণ্ডল নিয়ে গেছে, আমায় ব'লে দাও।"

তার ব্যগ্রতা দেখে সন্ন্যাসীর মনে দয়া হ'ল। সন্ন্যাসী ব'ল্‌লেন—"নাগ-কন্যারা তোমার কুণ্ডল চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। এই গুহা পথে তারা পালিয়েছে, ছুটে গেলে হয়তো তুমি তাদের দেখ্‌তে পাবে।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনে উতঙ্ক আবার ছুট্‌লো সেই গুহাপথ দিয়ে। ভীষণ অন্ধকার! সাম্‌নে-পিছনে কিছুই দেখা যায় না। সাপের ফ঳স্‌ ফঁস্‌ শব্দ আর বন্যজন্তুদের কিচিমিচি শব্দে গা ছম্‌ ছম্‌ ক'রে ওঠে। হাতে কপালে পাথরের ধাক্কা লেগে কতবার যে সে আঘাত পেল, তার ঠিক-ঠিকানা নাই। কিন্তু তবুও এগিয়ে চ'ল্‌লো সে; যেমন ক'রে হোক্‌ ফিরিয়ে আন্‌বেই তার মণিকুণ্ডল। গুরু-পত্নীর সাধ সে মেটাবেই।

অন্ধকার গুহা-পথে বহুদূর ছুটে যাওয়ার পর, উতঙ্ক আলো দেখতে পেল। গুহা ছাড়িয়ে নগরের রাজপথ; দুপাশে ফল-ফুলের বাগান। বাগান হ'লে কি হয়; গাছপালা-লতাপাতা সবকিছুর গায়েই কিলিঝিলি ক'রে বেড়াচ্ছে রঙ-বেরঙের সাপ, তক্ষক, কিরিটক্‌, শাঁখামুঠি—এরা সব পথের পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উতঙ্ক নির্ভীক্‌ ভাবে সেই পথ ধ'রে এগিয়ে চল্‌লো।—এ যেন এক নূতন ধরণের দেশ!

ফুলবাগিচায় নাগকন্যারা লুকোচুরি খেল্‌ছে। উতঙ্ককে দেখে তারা আনন্দে কলরব ক'রে উঠ্‌লো। এ রকম মানুষ তারা কোনদিন দেখেনি। উতঙ্ক তাদের কাছে গেল। অনেক অনুনয় ক'রে জান্‌তে চাইলে তার মণিকুণ্ডলের কথা।

কিন্তু কেউ সন্ধান দিতে পারে না। ধনরত্নের খবর তারা রাখে না। কিছু জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, সটান্ রাজবাড়ীর পথ দেখিয়ে দেয়।

উতঙ্কের বুঝ্‌তে বাকী রইল না যে, এ সেই নাগরাজ্য—তক্ষকের দেশ। কিন্তু প্রাণের ভয় না ক'রে সে চল্‌লো রাজপ্রাসাদের দিকে। যত এগিয়ে যায়, ততই যেন মনে হয়—চারিদিকে সবাই তাকে মারবার জন্যে কি একটা ষড়যন্ত্র করছে।

কারো অনুমতির অপেক্ষা না রেখে উতঙ্ক রাজসভায় প্রবেশ করলো।

রাজার কাছে গিয়ে যখন সে কুণ্ডল চাইলে, রাজা রাগে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে—'কার হুকুমে তুমি আমার রাজ্যে প্রবেশ করেছ?'

উতঙ্ক সমান তেজে উত্তর দিলে—'তোমরাই বা কোন সাহসে আমার জিনিস চুরি করেছ? জানো, চুরি করার পাপে তোমাদের সর্ব্বনাশ হবে!'

রাজা দ্বিগুণ তেজে গর্জ্জন ক'রে বল্‌লে—'তোমায় বন্দী ক'রে রাখা হবে।'

উতঙ্ক সে কথা শুনে রুখে দাঁড়ালো। রাগে তখন তার সর্ব্বশরীর থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে। তবু নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে—'সে ভয় উতঙ্ককে দেখিও না। সত্যরক্ষার জন্যে সে প্রাণ দিতে এক-পাও পিছিয়ে যাবে না।'

রাজার হুকুমে প্রহরীরা এসে উতঙ্ককে বন্দী ক'রে নিয়ে গেল। মন্ত্রী একবার রাজার মুখপানে চেয়ে ভয়ে ভয়ে বল্‌লে—'মহারাজ! এ ব্রাহ্মণকুমার; একে বন্দী ক'রে হয়তো বিপদ ঘট্‌বে শেষে।'

কিন্তু কে তার কথা শোনে! রাজা বুড়ো মন্ত্রীর কথা কাণেও নিলে না।

উতঙ্ক বন্দী হ'য়ে রইল সেই পাতাল-পুরীর বন্দীশালায়। এক দুই ক'রে সাতটি দিন কেটে গেল, উতঙ্ক এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত মুখে দিলে না। উপোস ক'রে কারাগারে পড়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, কেমন ক'রে মণিকুণ্ডল উদ্ধার কর্‌বে!

সেইদিন শেষ-রাত্রে রাণী একটা ভয়ানক মন্দ স্বপ্ন দেখ্‌লে। সকালে উঠে

মণিকুণ্ডল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নের কথা মনে হ'তেই তার বুকের ভিতরটা ভয়ে কেঁপে উঠলো। স্বপ্নে সে দেখেছে যে, তার মণিকুণ্ডল হ'তে ঝলকে ঝলকে আগুন বেরিয়ে সারা-রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। যে সাম্‌নে আসে, সেই পুড়ে মরে; কোনদিকে পালাবার পথ পায় না।

রাজাকে সব কথা জানিয়ে, রাণী তখনি মণিকুণ্ডল খুলে' উতঙ্ককে ফিরিয়ে দিলে। বন্দীশালা থেকে মুক্ত হ'য়ে উতঙ্ক কুণ্ডল নিয়ে ঋষির আশ্রমে ফিরে গেল।

গুরুপত্নীকে দক্ষিণা দিয়ে, উতঙ্ক তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। আশ্রমের সবাই অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল সেই ছেলেটার পানে।

দক্ষিণা দিয়ে উতঙ্ক পরম আনন্দিত হ'ল; কিন্তু নাগরাজ তার যে অপমান ক'রেছিল, তা সে ভুল্‌তে পার্‌লে না। রাজা জনমেজয়কে উত্তেজিত ক'রে সে নাগরাজের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ সুরু ক'রে দিলে। রাজা জনমেজয় নাগরাজকে খুব শাস্তি দিলেন।



* কোন কোন পণ্ডিত বলেন—এই মণিকুণ্ডল 'উদ্দালক' আনিয়াছিলেন।



কিন্নর-কন্যা

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হস্তিনার রাজা 'ধন'কে তাঁর প্রজারা সকলেই ভালোবাসত। তিনিও তাঁর প্রজাদের ছেলের মত দেখতেন, আর কিসে তাদের মঙ্গল হবে এই চিন্তাতেই দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর প্রতিবেশী এক দুষ্ট রাজার রাজ্য ছেড়ে তাঁর প্রজারা তাঁর রাজ্যে চলে আসাতে সেই রাজা হস্তিনারাজের ওপর বড়ই চটে গেলেন। বিশেষ করে যখন তাঁর রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ—সেই সময়েই হস্তিনায় কি করে সুবৃষ্টি হয়ে ধানচা-ল সস্তা হ'ল—এটা তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না। তখন রাজার তাড়া খেয়ে মন্ত্রীরা গুপ্তচর পাঠিয়ে খবর নিতে লাগলেন। শেষে অনেক সন্ধানের পর জানা গেল যে, রাজা 'ধনে'র রাজ্যে একটি হ্রদে একজন 'নাগ' বাস করেন, তিনিই সেরাজ্যে সুবৃষ্টি করান। দুষ্ট রাজা এই কথা শুনে একজন বিখ্যাত মন্ত্রজ্ঞ পুরুষকে অনেক টাকা দিয়ে সেই নাগকে ধরে আনতে পাঠালেন। মন্ত্রজ্ঞ টাকার জন্য সব রকম অধর্ম্ম করতে পারত। সে এসে হ্রদের ধারে বসে মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করলে। মন্ত্রবলে নাগ-রাজ 'চিত্র' তাঁর হ্রদের তলায় রাজবাড়ীতে অস্থির হয়ে উঠলেন। হ্রদের অন্য

কিন্নর-কন্যা

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পারে মহর্ষি বল্কলায়নের আশ্রম, সেখানে এক ব্যাধ ঋষির সেবা করত। নাগরাজ তাকে চিনতেন, নিরুপায় হয়ে এসে তাকে বললেন, "তুমি আমায় বাঁচাও। মন্ত্রজ্ঞ আমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছে।" ব্যাধ তাড়াতাড়ি তীর-ধনুক, তলোয়ার নিয়ে এসে হাজির দেখে, মন্ত্রজ্ঞ নিশ্চল হয়ে বসে একমনে মন্ত্র জপ করছে,—নাগকে বন্দী করবার জন্য। ব্যাধ তাকে এক ঘা তীর মারতেই সে শুয়ে পড়ল, তখন তলোয়ার দিয়ে তার মাথাটি কেটে নিয়ে ব্যাধ নাগরাজের কাছে দিলে। দুষ্ট রাজার সমস্ত ফন্দী এমনি করে ব্যর্থ হল।

তখন নাগরাজ 'চিত্র' ব্যাধকে যত্ন করে জলের তলায় তাঁর রাজপুরীতে নিয়ে গেলেন। ব্যাধ সেখানে বহুদিন সুখে-স্বচ্ছন্দে থেকে অনেক ধনরত্ন নিয়ে ঘরে ফিরে এল। নাগরাজের 'পাশ' বলে একটি অস্ত্র ছিল, মন্ত্র পড়ে সেই অস্ত্র ছেড়ে দিলে যাকে ইচ্ছা তাকেই বন্দী করা যায়। ব্যাধ বাড়ী ফেরবার সময় তাঁর সেই অস্ত্রটি চেয়ে নিয়ে এল।

এই ঘটনার পর আরো অনেকদিন কেটে গেছে। রাজা 'ধন' বুড়ো হয়েছেন, তাঁর একমাত্র ছেলে রাজপুত্র 'সুধন' এখন রাজকার্য্য দেখেন। সুধন মাঝে মাঝে ছুটি পেলেই বনে-জঙ্গলে হিংস্রজন্তু শিকার করে বেড়ান, মৃগয়া যেন তাঁর নেশা। এদিকে সেই ব্যাধ মারা গেছে। মরবার সময় তার ছেলে 'উৎপলক'কে দিয়ে গেছে তার সেই নাগরাজের দেওয়া 'পাশ' অস্ত্র। উৎপলক বনের মধ্যে মুনির সেবা করে, আর মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখে সেই পাশ অস্ত্রের গুণ। বাঘ, সিংহ, হাতী, হরিণ যেই আসুক না কেন, সে বিনাযুদ্ধে বন্দী করে তার সেই অস্ত্র দিয়ে।

একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে হ্রদের ধার থেকে ভারী মিষ্টি একটা গানের সুর বাতাসে ভেসে এল। উৎপলক মুনিকে জিজ্ঞেস করলে, "প্রভু ও কিসের শব্দ ?" বল্কলায়ন বললেন, "কিন্নর-রাজের মেয়ে মনোহরা পাঁচ-শ' সখী নিয়ে নাগরাজ

চিত্রের বাড়ী বেড়াতে এসেছেন। তাদেরই গানেব স্বর শোনা যাচ্ছে।" উৎপলক আর কথাটি না বলে মুনিকে প্রণাম করে ছুটল তার পাশ অস্ত্র নিয়ে। হ্রদের ধারে পৌঁছে সে অপেক্ষা করে রইল ঝোপের আড়ালে। রাজকন্যা মনোহরা সখীদের নিয়ে জল থেকে উঠতেই দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে এক 'মানুষ'। এক নিমেষে কিন্নরীরদল আকাশে উড়ে পড়ল, কিন্তু মনোহরা ছিলেন সকলের আগে, তিনি আর পালাতে পারলেন না, চোখের পলক না ফেলতে উৎপলকের পাশ অস্ত্র এসে তাঁকে হাতে-পায়ে বেঁধে ফেললে। মনোহরা ভয়ে দুঃখে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন, আর ব্যাধকে মিনতি করতে লাগলেন—তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্য। কিন্তু ব্যাধ তাঁকে কিছুতেই ছাড়তে চাইলে না, শেষে যখন খুব দয়া হ'ল, তখন বললে,



"তোমাকে আমি রাজপুত্র সুধনকে দিয়ে আসব। তোমার কোনো কষ্টই থাকবে না।" মনোহরা বললেন, "তোমার বাঁধন আমি আর সহ্য করতে পারছি না, তুমি আমার বাঁধন খুলে নাও! এই আমার চূড়ামণিটি রাখো, এটি

কাছে না থাকলে আমি উড়ে যেতে পারব না।" ব্যাধ তখন চূড়ামণিটি হাতে নিয়ে মনোহরার গা থেকে পাশ অস্ত্র খুলে নিলে।

এদিকে রাজপুত্র সুধন মৃগয়ায় এসে বনের মধ্যে ঘুরছেন—হঠাৎ মনোহরার কান্না দূর থেকে তাঁর কানে গেল। তিনি খুঁজতে খুঁজতে এসে ব্যাধের কাছে কিন্নর-রাজকন্যাকে দেখতে পেলেন! এমন অপরূপ সুন্দরী তিনি জীবনে কখনো দেখেন নি। মনোহরা ত' রাজপুত্রকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন, মানুষ যে কখনো এত সুন্দর হ'তে পারে তা' তাঁর জানা ছিল না। ব্যাধ উৎপলক দেখলে সুবিধাই হয়েছে, সে ভক্তিভরে রাজপুত্রকে প্রণাম ক'রে তাঁকে সেই চূড়ামণিটি দিলে, আর রাজকন্যা মনোহরাকে বিয়ে ক'রতে অনুরোধ ক'রে ভারী খুসী হ'য়ে মুনির আশ্রমে ফিরে গেল। রাজপুত্র মনোহরাকে রথে তুলে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন, তিনিও কিন্তু আর কোনও আপত্তি ক'রলেন না। শুভদিনে শুভলগ্নে ধূমধাম ক'রে দু'জনের বিয়ে হ'ল। রাজ্যের লোক বর-বৌ দেখে বললে, 'এমন মিলন আর জগতে কোথাও হয়নি।'

তারপর সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যায়। রাজপুত্র সুধন আর রাজবধূ মনোহরার সুখ্যাতি লোকের মুখে আর ধরে না। হস্তিনার প্রজা যেন রাম-রাজ্যে বাস করছে।

এমনি সময় দাক্ষিণাত্য থেকে দুই পণ্ডিত এলেন 'ধনে'র রাজসভায়, একজনের নাম কপিল, আর একজনের নাম পুষ্কর। দুজনেই যেমন পণ্ডিত, তেমনি হিংসুটে; কেউ কারো ভালো দেখতে পারেন না। রাজা কপিলকে তাঁর পুরোহিত করলেন, কিন্তু রাজপুত্র কাজেকর্ম্মে পুষ্করকে ডাকতেন। বিদ্যা-বুদ্ধিতে দু'জনের মধ্যে পুষ্করই ছিলেন বড়, কিন্তু কপিল সেটা কিছুতেই মানতে চাইতেন না। পুষ্করের ওপর রাজপুত্রের টান দেখে কপিল রাজপুত্রের ওপর ভীষণ চ'টে গেলেন আর তাঁকে বিপদে ফেলবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

তিনি ভাবলেন, রাজপুত্রের জন্যই পুষ্করের আদর, রাজপুত্রকে শেষ করতে পারলে ওকে দেখে নেওয়া যাবে।

এখানে কর্কট দেশের সামন্ত রাজা 'মেঘ' হস্তিনারাজের আদেশ অমান্য ক'রে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। হস্তিনারাজের অনেক সৈন্যও তিনি মেরে ফেলেছেন বলে খবর পাওয়া গেল। রাজা ধন রাজপুত্র সুধনকে ডেকে বললেন, "এখনই যুদ্ধ-যাত্রা করো, মেঘের দর্প চূর্ণ করতেই হবে।" রাজপুত্রও "যে-আজ্ঞে" ব'লে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে গেলেন বিদায় নিতে। স্ত্রীকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে শুঝিয়ে সুধন রাণীর কাছে গেলেন। মা'কে প্রণাম ক'রে সুধন মনোহরার চূড়ামণিটি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, "যদি কোনদিন মনোহরার প্রাণ-সঙ্কট হয় তবেই এই মণিটি তা'র হাতে দিয়ো।" এই ব'লে রাজপুত্র রণসজ্জা ক'রে সৈন্য সামন্ত হাতী-ঘোড়া নিয়ে আকাশ-পাতাল তোলপাড় ক'রে যুদ্ধযাত্রা করলেন। রাজপুত্র চলে যেতেই মনোহরার কাছে পৃথিবী যেন খালি হ'য়ে গেল, তিনি সারাদিন কাঁদেন আর দিন গোণেন। এমন সময় একদিন রাজা ধন স্বপ্নে দেখলেন—শত্রুরা রাজপুত্রকে মেরে যেন তাঁর রাজধানীতে এসে ঢুকেছে, আর তাঁর পেট চিরে নাড়ী-ভুঁড়ি বা'র ক'রে তাই দিয়ে সমস্ত সহরটাকে ঘিরে দিয়েছে। সকালে উঠে রাজা রাজ-পুরোহিত কপিলকে ডেকে স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞেস করতেই তিনি ব'ললেন, 'মহারাজ, বড়ই দুর্ল্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এ স্বপ্নের অর্থ, হয় আপনার রাজ্য যাবে, না হয় আপনার প্রাণ যাবে। তবে হ্যাঁ,—প্রতিকারও যে নেই তা' বলছি না, দৈবকার্য্য ক'রলে প্রতিকার আছে,—কিন্তু এখন মহারাজ সম্মত হবেন কি না—সেইটি হচ্ছে কথা।" রাজা ব'ললেন, "বলুন, যদি আমার সাধ্যে হয় তা' হ'লে আমি নিশ্চয় ব্যবস্থা ক'রব।" কপিল ব'ললেন,—'মহারাজ, যজ্ঞের পশু বলি দিয়ে সেই পশুর রক্তে একটা সরোবর ভ'রে ফেলতে হবে। তা'রপর সেই রক্ত-সরোবরে স্নান ক'রে আপনি উঠে আসবেন, ব্রাহ্মণেরা আপনার গা মুছিয়ে

দেবেন। সেই ব্রাহ্মণদের ধন-রত্ন দান ক'রে সন্তুষ্ট ক'রে আপনি হোম করবেন। সেই হোমের আগুনে আহুতে দিতে হবে,—কিন্নরীর মেদ। এতে আপনার সমস্ত বিপদ কেটে যাবে, আপনার ছেলের এবং আপনার প্রাণরক্ষা হবে। কিন্নরী আপনার বাড়ীতেই আছেন, সময়ও সংক্ষিপ্ত, এখন আপনার অভিরুচি।'

রাজা প্রথমে কথা শুনে শিউরে উঠলেন—নিজের প্রাণের জন্য স্ত্রী-হত্যা করতে হ'বে, তাও আবার আপন পুত্রবধূকে! অসম্ভব! তা'হলে কি সুধন বাঁচবে—না,—রাজ্যের লোক তাঁর মুখ দেখবে? এতবড় অধর্ম্ম ঈশ্বর সহ্য করবেন না। কপিল বড় বড় শাস্ত্রের কথা পাড়লেন, দশের হিতের জন্যে নিজের সংসারকে তুচ্ছ করতেই হয়; বড় বড় রাজারা প্রজার মুখ চেয়ে কত কি ক'রে গেছেন, তারই ফর্দ্দ,—তারই সত্যমিথ্যা বর্ণনা। কথায় বলে, শতেক কথায় মুনি ভোলে। রাজারও মতিভ্রম হ'ল। তিনি যজ্ঞের আয়োজন করতে আদেশ দিয়ে অন্তঃপুরে রাণীকে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। রাণী একেই ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দুর্ভাবনায় অস্থির, তার ওপর রাজার দুর্ব্বুদ্ধির কথা শুনে তাঁর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। কোনো রকমেই যখন এই যজ্ঞ বন্ধ করা গেল না, তখন রাণী মনোহরাকে চূড়ামণিটি ফেরৎ দিয়ে বললেন, "মা, তুমি এইটি নিয়ে বাপের বাড়ী ফিরে যাও। আমার ভাগ্য মন্দ, রাজার পাপবুদ্ধি হয়েছে, তোমার কবে কি বিপদ হয় তার ঠিক নেই।" মনোহরা সব কথা স্থির হ'য়ে শুনলেন। রাণী বললেন, "মা, তুমি আকাশ দিয়ে উড়ে যাবার সময় যজ্ঞভূমিতে তোমার শ্বশুরকে একবার দর্শন দিয়ে যেয়ো। না'হ'লে তিনি সন্দেহ করবেন, আমিই তোমায় কোথাও লুকিয়ে রেখেছি, আমার আর রক্ষা থাক্‌বে না।"

মনোহরার এতদিনের সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। কোথায় তিনি রাজ-

পুত্রের ফেরার পথ চেয়ে বসে আছেন, আর কোথায় তাঁকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে দেশছাড়া করা হচ্ছে! কিন্নর-রাজকন্যা ক্ষুণ্নমনে শাশুড়ীকে প্রণাম ক'রে চোখের জলে চূড়ামণিটি মাথায় পরলেন। তারপর যজ্ঞক্ষেত্রে উড়ে গিয়ে রাজাকে প্রণাম ক'রে বললেন, "মহারাজ, আপনার মঙ্গল হোক। আমি বিদায় নিতে এসেছি!" চোখের পলক না ফেলতে কিন্নরী আকাশে উড়ে গেলেন, রাজা মাটিতে বসে মাথা চাপড়াতে লাগলেন। বেগতিক দেখে কপিল বলির পশুর রক্ত ও মেদ একটা পাত্রে ক'রে এনে বললেন, "মহারাজ, কোনও ভয় নেই, আমি মন্ত্র-বলে একটা ব্রহ্ম-রাক্ষসকে ঐ কিন্নরীকে আক্রমণ করবার জন্য পাঠিয়েছিলুম্। এই দেখুন তার মেদ।" রাজা কপিলের ছলনায় ভুলে তাই দিয়েই আহুতি দিলেন, যজ্ঞ শেষ হ'ল। কিন্তু তাঁর মনের শান্তি চিরদিনের মত চ'লে গেল।

মনোহরা বহুদিন পরে বাপের বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্নররাজ তাঁকে পেয়ে খুব খুসী হলেন, কিন্তু তাঁর গায়ে মানুষের মত গন্ধ পেয়ে নাক সিঁটকে বললেন, "রোজ পাঁচ-শ ঘড়া সুগন্ধ দেওয়া জলে স্নান করবি, তা'হলে যদি তোর গায়ের গন্ধ যায়।" মনোহরার আলাদা মহল হ'ল, তিনি খান দান, সখীদের সঙ্গে স্বর্গমর্ত্ত্যের গল্প করেন, কিন্তু মনে শান্তি পান না। একদিন আকাশ পথে উড়তে উড়তে তিনি নাগরাজ্যের হ্রদের ধারে মহর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। বল্কলায়ণ তাঁর দুঃখের কাহিনী যোগবলে সমস্তই জেনেছিলেন, তবু আবার তার নিজের মুখে সব শুনলেন। রাজপুত্র সুধন যদি কখনও সেই পথে মনোহরাকে সন্ধান করতে আসেন, তবে তাঁকে কিন্নরপুরীতে যাবার জন্য দুর্গম পথের সমস্ত কথা বলে আর তাঁর নিজের হাতের আংটিটি রাজপুত্রের জন্য মুনির কাছে রেখে কিন্নর-রাজকন্যা আকাশ পথে বাপের বাড়ী ফিরে গেলেন।

ঠিক সেই সময় রাজপুত্র সুধন দেশে ফিরলেন—বিদ্রোহী মেঘ-রাজাকে জয়

ক'রে। দিগ্বিদিক তোলপাড় ক'রে রণডঙ্কা বাজাতে বাজাতে তাঁর বিজয়ী সৈন্য যখন সহরে এসে ঢুকল, তখন সহরশুদ্ধ লোক কাঁদছে। রাজা কোথায় ছেলেকে এগিয়ে আনবেন,—না দুঃখে ভয়ে তিনি কাঁপতে কাঁপতে ঘরে খিল দিলেন। রাজপুত্র রাজার দেখা না পেয়ে রাণীকে গিয়ে বললেন, "ব্যাপার কি, সবাই কাঁদে কেন? বাবা কোথায়?" রাণীর পরণে সধবার বেশ, কিন্তু চোখমুখ কেঁদে কেঁদে ফুলে আছে, তিনি কিছুই বলতে পারলেন না, কেবল কাঁদতে লাগলেন। রাজপুত্র তখন মনোহরার খোঁজ করতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার জানতে পারলেন। মনোহরার সখীরা তাঁকে ধীরে ধীরে কাঁদতে কাঁদতে সব কথাই বললে। এরপর আর রাজপুত্র সুধনকে ঘরে রাখা সম্ভব হ'ল না, সেই পোষাকে সেই অবস্থায় তিনি পাগলের মত বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেলেন। অন্তঃপুরে হাহাকার উঠল, রাজা অনুতাপে চুল ছিঁড়তে লাগলেন, রাণী অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন।

দিন যায়, মাস যায়, একদিন সারারাত বনে বনে ঘুরে ভোরবেলা রাজপুত্র সুধন নাগরাজের হ্রদের ধারে মুনির আশ্রম দেখতে পেলেন। তিনি বিষণ্ণ মুখে মুনিকে প্রণাম করে কিন্নর-রাজকন্যার কথা জিজ্ঞেস করতেই মুনি তাঁকে সুধন বলে চিনতে পারলেন। তখন তাঁকে আশ্বাস দিয়ে মুনি মনোহরার দেওয়া আংটিটি তাঁর হাতে দিলেন আর পথের কথা সমস্ত বুঝিয়ে বললেন। মুনির তপোবনে 'সুধা' নামে একরকম ওষুধের গাছ ছিল, সেই ওষুধ ঘি দিয়ে পাক করে খেলে মানুষ দেবতার মত শক্তিলাভ করে। সুধন সেই ওষুধ খেয়ে মুনির কথামত অস্ত্র, শস্ত্র যন্ত্রপাতি পিঠে বেঁধে একটি বীণা হাতে করে কিন্নরপুরীর পথে যাত্রা করলেন। তখন আশায় উৎসাহে আর মুনির দেওয়া সেই ওষুধির গুণে তাঁর শরীরে যেন হাজার হাতীর বল! তিনি তখন দিব্যদৃষ্টিতে পথ দেখতে পাচ্ছেন, বিপদ বাঁধা সমস্ত অগ্রাহ্য করে তাঁকে কিন্নর-পুরীতে যে যেতেই হবে!

যাবার পথে প্রথমে পড়ে হিমালয়! পৃথিবীর মধ্যে এত বড় উঁচু পর্ব্বত আর

শিশুসাথী

নাই। এই হিমালয়ের বরফে-ঢাকা চূড়াগুলি পার হতে যে রাজপুত্রকে কি কষ্ট পেতে হয়েছিল তা' আর তোমাদের বোঝাতে হবে না। হিমালয়ের শেষ চূড়াটি থেকে নেমে রাজপুত্র সুধন কুকূলাদ্রি বলে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের তলায় পৌঁছালেন। সেখানে বিস্তর বাঁদর, লাখে লাখে বাঁদর পাহাড়টা যেন ছেয়ে আছে। দেখতে দেখতে বাঁদরের দল রাজপুত্রকে ঘিরে ধরল। রাজপুত্র মুনির আশ্রম থেকে কতকগুলি মিষ্টি ফল এই সময়ের জন্যেই মুনির কথামত সঙ্গে এনেছিলেন, সেগুলি তিনি তৎক্ষণাৎ বার করে বাঁদরদের রাজাকে খেতে দিলেন। মর্কট-রাজ সেরকম ফল জন্মে কখনও খাননি, তিনি তো মহাখুসী। তখনি 'বায়ুবেগ' নামে



একটা প্রকাণ্ড বাঁদরকে হুকুম দিলেন,—"যা, এঁকে পাহাড় পার করে দিয়ে আয়।" বায়ুবেগ রাজপুত্রকে কাঁধে করে এক লাফে প্রকাণ্ড পাহাড় পার করে দিয়ে এল। রাজপুত্রের কোনও কষ্টই হল না।

কিন্নর-কন্যা

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কুকূলাদ্রির পরেই অজপথ পর্ব্বত, সেখানে মস্ত মস্ত অজগর সাপ চারিদিকে গাছে গাছে জড়িয়ে আছে। রাজপুত্রের হাতে মুনির দেওয়া মন্ত্র-পড়া তলোয়ার, তিনি কচাকচ্ সাপের মাথা কাটতে কাটতে পর্ব্বতের চূড়ায় উঠলেন। তারপর সেখান থেকে নেমে কামরূপ পাহাড়ের গায়ে 'রাক্ষসীর গুহা' দেখতে পেলেন। এই রাক্ষসীর হাতে কোনো মানুষের নিস্তার ছিল না, সে নানা রকম মায়া জানত, আর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ছিল। কিন্তু তার একটি সখ ছিল, সে গান বাজনা বড্ড ভালোবাসত। রাজপুত্র মুনির কাছে সমস্ত শুনেছিলেন, তিনি গান গেয়ে বীণা বাজাতে বাজাতে তার চোখের সামনে দিয়েই পাহাড় পার হয়ে গেলেন। রাক্ষসী বিভোর হয়ে গান শুনতে লাগল, রাজপুত্রকে খাবার কথা তার মনেই হল না।

এইবার একাধার পর্ব্বত—একেবারে খাড়া পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে আছে, টিকটিকি বা কীট-পতঙ্গ ছাড়া কারো সাধ্য নেই সে পর্ব্বতের গা বেয়ে ওঠে। রাজপুত্রের সঙ্গে একটি থলিতে লোহার গজাল ও মুগুর ছিল, তিনি মুগুর মেরে মেরে সেই গজাল দুটো করে পাহাড়ের গায়ে পোঁতেন আর তার ওপর দাঁড়িয়ে আবার একটু উঁচুতে দুটো গজাল লাগান। এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করে অনেক কষ্টে সুধন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে একটা জঙ্গল দেখতে পেলেন। সেটা ঢালু হয়ে পাহাড়ের গা বয়ে নেমে গিয়ে বজ্রক পাহাড়ের তলায় ঠেকেছে।

সে পাহাড় আবার আরও দুর্গম, তার শক্ত পাথরে লোহার গজালও বসে না। সুধন মুনির কথামত জঙ্গলে ঢুকেই প্রকাণ্ড একটা হরিণ মারলেন। তারপর একটা ঢালু জায়গায় হরিণটাকে টেনে এনে তার পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি ফেলে দিয়ে নিজে তার পেটের মধ্যে ঢুকলেন। এইবার একটু পায়ের ধাক্কা দিয়ে হরিণটাকে গড়িয়ে দিতেই গড়াতে গড়াতে রাজপুত্র বজ্রক পাহাড়ের তলায়

একটা খোলা জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। একটা মায়াবিনী রাক্ষসী শকুনি সেজে সেই পাহাড়ের কাছে উড়ে বেড়াত আর পাহাড়ের চূড়োয় বাসা বেঁধে থাকত। সে পাহাড়ের তলায় মরা হরিণটাকে দেখে উড়ে এসে ছোঁ মেরে হরিণশুদ্ধ রাজপুত্রকে অনেক উঁচুতে সেই পাহাড়ের চূড়োয় তুলে নিয়ে গেল। তখন কিন্তু আর তা'কে হরিণ খাবার জন্য বেশীক্ষণ বাঁচতে হ'ল না, রাজপুত্র হরিণের পেট থেকে বেরিয়ে মন্ত্রপুত তলোয়ারের এককোপে শকুনির মাথা কাটলেন।

বজ্রক পাহাড়ের পর খদির পর্ব্বত, সেখানে চারদিকে খয়েরের গাছ, রাজপুত্রকে মুনি সমস্ত সন্ধান দিয়েছিলেন, তিনি বনের মধ্যে ঢুকে একজায়গায় একটা পাথর খুঁজে বার ক'রলেন। সেটা যেমন ভারী, তেমনি প্রকাণ্ড। কিন্তু রাজপুত্র সুধা খেয়ে এসেছেন, তিনি তো আর সাধারণ মানুষের মত দুর্ব্বল নন, একটানে তিনি সেই বিরাট পাথরখানা তুলে দেখলেন তা'র তলায় একটা গুহার মুখ। গুহার মধ্যে একটি পাত্রে মহৌষধ রাখা আছে, সে মহৌষধ খেলে মানুষ আগুনে পোড়ে না, শীতে জমে যায় না, সাপে কামড়ে মরে না, দেব-দানবে তা'র কোনও ক্ষতি ক'রতে পারে না। সেই মহৌষধ রাজপুত্র সুধন পান ক'রলেন, তাঁর সাহস ও শক্তি যেন দশগুণ বেড়ে গেল, পথের শ্রম যেন একমুহূর্ত্তে দূর হ'য়ে গেল।

খদির পর্ব্বত পেরিয়ে দেখা গেল একজোড়া পাহাড় পথের দু'পাশে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে তা'দের নাম যন্ত্র পর্ব্বত। সেখানে একটা যন্ত্রদ্বার আছে, মানুষ কি জন্তু কেউ সে পথে এলেই দু'পাশ থেকে দুটো দরজার পাল্লা এসে তা'কে পিষে মেরে ফেলে। রাজপুত্র দূর থেকে তীর মেরে সেই যন্ত্রদ্বারের কল খারাপ ক'রে দিতেই দরজাটা ভীষণ শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি লোহার মুগুর দিয়ে সেই দরজার মধ্যে খানিকটা ভেঙ্গে ফুটো করে তার ওপারে গেলেন।

সেখানে দেখেন সামনে এক বিরাট চক্র ঘুরছে, দু'পাশে পাহাড়, চক্রের পাশ দিয়ে যাবার স্থান নেই, যেতে গেলেই মরতে হবে। রাজপুত্র তীর মেরে চক্র ভেঙ্গে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। দু'পাশে লোহার মুষল হাতে দুই লোহার পুতুল দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কাছে এলেই তারা দু'পাশ থেকে পিটতে আরম্ভ করবে। রাজপুত্র দুই বাণে দুই পুতুলকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। তারপর রাজপুত্র পড়লেন দুই লোহার ভেড়ার সামনে। তারা দু'পাশ থেকে এসে ঢুঁ মেরে মানুষকে মেরে ফেলে। রাজপুত্রের বাণে তারাও গেল অচল হয়ে! তারপর দুই লোহার কুমীর লোহার দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আর দুই রাক্ষস গিলে ফেলতে



আসে। রাজপুত্রের বাণে সমস্ত কল বিগড়ে গেল, রাক্ষস দু'টো টুকরো হয়ে মরে রইল। তখন এক প্রকাণ্ড অন্ধকার গুহা পার হয়ে রাজপুত্র তুঙ্গানদীর ধারে এসে পৌছোলেন। সেখানে পালে পালে রাক্ষস মানুষ খাবার লোভে

কিন্নর-কন্যা

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা প্রকাণ্ড মাঠে কতদিন থেকে বসে আছে, মানুষ আর সেপথে ততদূর এসে পৌঁছোয় না। রাজপুত্রকে দেখে তাদের সে কি আনন্দ! একেবারে সোর-গোল পড়ে গেল। রাজপুত্র কিন্তু তাদের ওপর একটুও দয়া করলেন না, এমন ভয়ানক ভয়ানক তীর চালাতে আরম্ভ করলেন যে, এক মুহূর্ত্তে হাজার হাজার রাক্ষস মরে গেল। তখন বাকী রাক্ষসগুলো—"কাজ নেই রে বাবা আমাদের মানুষ খেয়ে"—বলে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল। এইবার সেই মাঠ পার হয়ে পতঙ্গ নদী। নদীর জল দেখা যায় না, পানা-পুকুর যেমন পানাতে ঢেকে থাকে তেমনি নানা রঙের জ্যান্ত সাপেতে নদীর জল ঢেকে আছে। রাজপুত্র মহৌষধ খেয়েছেন, সাপে তাঁর কি করবে? তিনি নির্ভয়ে সেই ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে সাপের গাদার ওপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হয়ে গেলেন। নৌকোরও দরকার হল না। এইবার আর খানিক গিয়ে 'রোদিনী' নদী, সেখানে কিন্নর দেশের দাসীরা চারদিকে অদৃশ্য থেকে কাঁদে, সে কান্না শুনলে পথিকের মনপ্রাণ অবসন্ন হয়ে আসে। রাজপুত্র আগে থেকে জানতেন সব, তাই তিনি কিছু গ্রাহ্য না করে সাঁতরে নদী পার হলেন। আবার খানিকটা পথ গিয়েই 'হাসিনী' নদী এল, সেখানে নানা রকম হাসির আওয়াজে লোকের মাথা খারাপ করে দেয়। রাজপুত্র 'মনোহরার' মিষ্টি হাসির কথা মনে করে হাসতে হাসতে নদী পার হয়ে গেলেন। এইবার পথ শেষ হল, বেত্রানদীর ধারে। ওপারে কিন্নর-পুরীর স্ফটিকের রাজপ্রাসাদ চোখে পড়ল। রাজপুত্র নদীর ধারে এসে দেখেন খুব সরু নদী, কিন্তু বড় ভীষণ স্রোত; সে স্রোতে কুটোটি পড়লে টুকরো হয়ে যায়। রাজপুত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, এমন সময় ওপারের বেতবন থেকে একটা বেতের ডগা হাওয়ায় উড়ে এসে এপারে ঠেকল। রাজপুত্র সেইটি ধরে প্রাণপণে নদী পার হয়ে কিন্নর-পুরীতে ঢুকলেন। চারিদিকে সুন্দর সুন্দর বাগান, সুন্দর সুন্দর বাড়ী, সুন্দর সুন্দর সরোবর। রাজপুত্র সুধন 'কান্তা পুষ্করিণী' বলে একটা

কিন্নর-কন্যা

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুকুরের ধারে এসে দেখেন, সেখানে হাজার হাজার সোনার পদ্ম ফুটে আছে; আর পুকুরের ধারে সোনারুপোর গাছে চুনি পান্না, মুক্তো মাণিক ঝক্‌মক্‌ করছে। রাজপুত্র তাড়াতাড়ি একটা গাছে উঠে চুনী পান্নার পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে রইলেন, তিনি জানতেন সেইখানেই মনোহরার খবর পাওয়া যাবে।

ক্রমশঃ বেলা হল। রাজবাড়ীর দাসীরা দলে দলে সোনার ঘড়ায় করে কান্তাপুকুরের সুগন্ধ জল নিয়ে যায়, রাজপুত্র বসে বসে দেখেন। শেষে যখন সবাই চলে গেল, তখন একটি অল্প বয়সী মেয়ে তার ভারী ঘড়া বেশীদূর নিয়ে যেতে না পেরে সেইখানে বসে হাঁপাতে লাগল। রাজপুত্র এই অবসরে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে তার ঘড়াটি তুলে দিতে গেলেন। সে মেয়েটি তো আর একটু হ'লেই চেঁচামেচি লাগিয়ে দিত, রাজপুত্র তাঁকে অনেক মিনতি করে বুঝিয়ে শুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁ মা, এত জল কি হবে?" মেয়েটি ছেলেমানুষ, তাকে একজন অচেনা মানুষ একেবারে মা বলাতে সে ভারী খুসী হ'য়ে গেল। বললে, "আমাদের রাজকন্যা মনোহরার গায়ে মানুষের মত গন্ধ হয়েছে কিনা, তাই তাঁকে রোজ পাঁচ-শ' ঘড়া জলে স্নান করতে হয়। আমরা তাই এত জল নিয়ে যাচ্ছি।" রাজপুত্র তা'র মুখের দিকে চেয়ে তা'র কথা শুনে যাচ্ছিলেন, এদিকে তারি মধ্যে তিনি যে কখন তার ঘড়ার মধ্যে হাতের আংটিটি ফেলে দিয়েছেন—সে তা জানতেও পারলে না। খানিক গল্প করে রাজপুত্রকে কিন্নরপুরী থেকে প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্য অনেক উপদেশ দিয়ে মেয়েটি জল নিয়ে বাড়ী গেল।

রাজকন্যা মনোহরা স্নান করছেন, দাসীরা ঘড়ায় ঘড়ায় কান্তা সরোবরের জল তাঁর মাথায় ঢালছে। এমন সময় হঠাৎ একঘড়া জলের সঙ্গে রাজপুত্রের আংটিটি তাঁর গায়ে পড়ল। রাজকন্যা চমকে বললেন, "আংটি কোথা থেকে এল!" কেউ বলতে পারে না, শেষে সেই কম বয়সী দাসীটি ভয়ে ভয়ে বললে,



শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

"কান্তা সরোবরের ধারে একটি মানুষের ছেলে এসেছে, তার হাতে এই আংটি দেখেছিলুম। তবে জলের মধ্যে কি ক'রে এল বলতে পারি না।" মনোহরার স্নান করা ঘুচে গেল, ছেলেমানুষের মত ছুটে এসে সেই দাসীকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, "মানুষের ছেলে কিন্নরপুরীতে এই আংটি আঙুলে দিয়ে এসেছে? ওরে, সে যে আমার বর! যা, যা, কোথায় দেখেছিস তাঁ'কে—ডেকে নিয়ে আয়।" দাসী ছুটল, সখীরা তাড়াতাড়ি রাজকন্যার গা মুছিয়ে তাঁকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দিলে। তাঁর আজ বড় আনন্দের দিন।

রাজপুত্র খিড়কীর দরজা দিয়ে কিন্নরপুরীর রাজবাড়ীতে এলেন। বহুদিন পরে স্বামী-স্ত্রীর দেখা। কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। তারপর কত চোখের জল, কত হাসি, কত সুখদুঃখের কথা! শেষে স্বামীকে নিয়ে মনোহরা বাপের কাছে গেলেন। দু'জনে একসঙ্গে কিন্নররাজকে প্রণাম ক'রলেন। মনোহরা বললেন, "ইনি হস্তিনার রাজপুত্র সুধন, পৃথিবীতে ইনিই আমার স্বামী ছিলেন।"

কিন্নররাজ রাগে কাঁপতে লাগলেন। বললেন, "পৃথিবীর সম্পর্ক পৃথিবীতে চুকে গেছে, এখানে আবার এ হতভাগা মরতে এসেছে কেন? তোমাকে আমি এতদিন ধরে কান্তা-সরোবরের জলে স্নান করিয়ে গায়ের গন্ধ ঘোচালুম, এখনও তোমার মানুষের ওপর টান গেল না? আমি আজ এ আপদকে নিশ্চয় খুন করব। এদিকে তোমার স্বয়ম্বরের আয়োজন হচ্ছে, দেবতাদের মধ্যে যাঁকে তোমার পছন্দ হয়, তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে—এমন সময় এই মানুষটা এসে যে আমার এতদিনের আশা পণ্ড ক'রে দেবে,—তা' কিছুতেই হবে না। স্বর্গের দেবতারা তোমার জন্য আমার দরজায় ঘোরাঘুরি করছেন, আর তুমি কিনা স্বামী বলে বসলে একটা মানুষকে? এত নীচ তোমার প্রবৃত্তি? না, না, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না, এ পাপ এখনি বিদায় করো। তোমার জন্য

আমি আমার বংশের কলঙ্ক হ'তে দিতে পারব না। যদি প্রাণের মায়া থাকে তবে এ এখনি কিন্নরপুরী থেকে দূর হ'য়ে যাক।"

রাজকন্যা বাপকে অনেক ক'রে বোঝালেন, "স্বামী বেঁচে থাকতে স্ত্রীর আর বিয়ে হয় না; আর যে মানুষ কিন্নরপুরীর দুর্গম পথে বাধাবিঘ্ন জয় করে এতখানি আসতে পেরেছে, সে দেবতার চেয়ে বলবিক্রমে কিছুমাত্র কম নয়। আর রূপের কথা, সে তো দেখাই যাচ্ছে—দেবতাদের মধ্যেও এমন রূপবান বড় দেখা যায় না।" রাজা শেষে একটু নরম হ'য়ে সুধনকে বললেন, "আচ্ছা, দেখি তোমার কেমন শক্তি। ঐ শরবনের সমস্ত শরগাছ এক মুহূর্তে উপড়ে ফেলে ঐখানে দু'মণ তিল ছড়িয়ে দাও। তারপর আবার সেই সমস্ত তিল এক মুহূর্তে খুঁটে এনে জড়ো ক'রে আবার ছড়িয়ে দাও। তীরের খেলা দেখাও, তলোয়ারের খেলা দেখাও, সব দেখিশুনি, তারপর বিবেচনা ক'রব তোমাকে জামাই করা যায় কি না।"

এইবার সুধন পড়লেন বিপদে, তিনি দেবরাজের কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানালেন। দেবরাজ ইন্দ্র জানতেন, সুধনই বহুজন্ম পরে শাক্যবংশে গৌতম হয়ে জন্মাবেন আর বুদ্ধত্ব লাভ করে জগতের লোককে মুক্তির পথ দেখাবেন। তিনি সুধনের ভালোবাসার কথা জেনে আর তাঁর উপস্থিত বিপদ দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর আদেশে পালে পালে শুয়ার এসে দেখতে দেখতে সমস্ত শরগাছ উপড়ে ফেলে দিলে আর রাজপুত্র সুধন সেখানে দু'মণ তিল ছড়িয়ে ফেলতেই কোটি কোটি পিঁপড়ে একটি একটি তিল মুখে করে এনে তাঁর কাছে দিয়ে গেল। কিন্নররাজ লক্ষ্যভেদের আয়োজন করলেন, যত রকম লক্ষ্য ছিল, রাজপুত্র সবই ঠিক তীর মেরে বিঁধলেন। তারপর কিন্নরদেশের বড় বড় যোদ্ধাকে যখন তিনি তলোয়ারের খেলায় আর মল্লযুদ্ধে হারিয়ে দিলেন তখন কিন্নরপুরীর সমস্ত লোক অবাক হয়ে গেল। তাঁর তীর সাতটা সোনার থাম

একসঙ্গে ফুটো করে বেরিয়ে গেল, শূকরীচক্র, সপ্ততাল প্রভৃতি যত রকম শক্ত শক্ত তীরন্দাজদের পরীক্ষা আছে তিনি সব কটাতেই উত্তীর্ণ হয়ে শেষে চৌষট্টি-কলায় তাঁর নৈপুণ্য দেখালেন। এইবার আর কিন্নররাজের কোনও আপত্তি চলল না। সমস্ত সভা ধন্য ধন্য করতে লাগল, আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। কিন্নররাজ কিন্তু তখনও একবার শেষ চেষ্টা করলেন। এক রকম পোষাক-পরা, এক রকম চেহারা, অবিকল মনোহরার মত মূর্ত্তি নিয়ে পাঁচ-শ' কিন্নরী স্থধনের সামনে এসে দাঁড়াল। রাজা বললেন, "রাজপুত্র, তোমার স্ত্রীকে বেছে নাও।" অন্য লোক হলে এ অবস্থায় নিশ্চয় ঠকে যেত, কিন্তু মুনির তপোবনে সুধা খেয়ে স্থধনের দিব্যদৃষ্টি হয়েছে, তিনি মনোহরাকে ঠিক বেছে নিলেন।

তারপর আর কি! ধুমধাম, নাচ-গান, আমোদ-আহ্লাদ। কিন্নররাজ বললেন "তুমি নররূপী দেবতা, তোমায় কন্যাদান করতে আমার কোনও আপত্তি নেই।" মনোহরার সঙ্গে স্থধনের পৃথিবীতে একবার মানুষী প্রথায় বিয়ে হয়েছিল, এবার আবার কিন্নরপুরীতে কিন্নরী প্রথায় বিয়ে হল। রাশি রাশি ধনরত্ন, মণিমাণিক্য দিয়ে কিন্নররাজ কন্যা সম্প্রদান করলেন। তারপর দিনকতক কিন্নরপুরীতে উৎসবে আনন্দে কাটিয়ে রাজপুত্র কিন্নর রাজ-কুমারীকে নিয়ে দেশে ফিরলেন। ফেরবার সময় কিন্তু তাঁকে কোনও কষ্ট পেতে হ'ল না, কিন্নরেরা মায়া-রথে তুলে তাঁদের আকাশ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে এল। হ্রদের ধারে তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে মুনিকে প্রণাম করে স্বামী-স্ত্রী হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।

তখন হারামণি ফিরে পেয়ে রাজারাণীর আনন্দ দেখে কে? দেশ জুড়ে উৎসবের আয়োজন হ'ল, ঘরে ঘরে গান, বাজনা, আলো, হাসি! রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে বুড়ো রাজা ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিলেন আর সেই দুষ্ট পুরোহিত কপিলকে রাজ্য থেকে দূর করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর নূতন রাজা স্থধন নূতন রাণী মনোহরাকে নিয়ে মনের সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

———



শ্রীকালিদাস রায়

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত ছিলেন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা,—দেবদ্বিজে তাঁহার ছিল অগাধ ভক্তি। তিনি দাতা ছিলেন—কিন্তু তাঁহার সমস্ত দানই ছিল দেবতার নামে—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণরাই সে দান পাইত। তিনি ছিলেন এমন ভীরুস্বভাবের মানুষ যে, একটা কোন বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেই তিনি ভয় পাইয়া পুরোহিতদের জানাইতেন। তাহাদের তিনি সর্ব্বজ্ঞ মনে করিতেন। পুরোহিতরা গম্ভীরভাবে রাজার সকল স্বপ্নকেই অশুভ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন এবং দোষক্ষালনের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন বা যাগযজ্ঞ করিতে বলিতেন। রাজাও নত মস্তকে নির্ব্বিচারে অক্ষরে অক্ষরে তাহাদের আদেশ পালন করিয়া ব্রাহ্মণদের বস্ত্র ভোজ্য ও দক্ষিণাদি দিতেন। কেবল স্বপ্ন কেন একটা উল্কাপাত হইলেও—একটা শকুনি রাজ-

প্রাসাদের উপর দিয়া উড়িয়া গেলেও—রাত্রিকালে কাক ডাকিলেও তিনি পুরোহিতদের পরামর্শে ঘটা করিয়া একটা যজ্ঞ বা গ্রহশান্তির আয়োজন করিতেন। দিন কতক খুব 'দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্' চলিত, ছাগ মেষের রক্তে মন্দিরে বন্যা আসিত, ঢাকঢোল তূরী ভেরী বাজিত, স্থূলকায় ফলাহারী ব্রাহ্মণগণ সশব্দে ঢেকুর তুলিত, সুবিধা পাইয়া রাজপুরীর ভৃত্য ও কর্ম্মচারীরা দুইহাতে চুরি করিত, নগরের স্বাস্থ্য নষ্ট হইত, অজস্র ব্যয় হইত—এক কথায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইত।

একদিনের একটি ব্যাপারে তাঁহার যাগযজ্ঞ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, ও পুরোহিতদের ব্যবস্থায় ঘোর অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। শুধু অশ্রদ্ধা নয়, তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বোধিসত্ত্বের সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ব্যাপারটা ভারি মজার। একদিন দুপুর রাতে রাজা উপরি উপরি আটটি শব্দ শুনিতে পাইলেন—প্রথমে ডাকিল কয়েকটি বাদুড়—তারপর ডাকিল একটি কাক,—তারপর একটি গাভী, তারপর রাজবাড়ীর একটা পোষা কোকিল, তারপর একটি বানর, তারপর একটি পোষা হরিণ, তারপর একটি ঘোড়া, সবশেষে একজন পথিক করুণস্বরে গান করিয়া পথ দিয়া চলিয়া গেল। রাজা শুনিয়া ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিলেন। উপরি উপরি আটটি ভিন্ন ভিন্ন জীবের এইরূপ ধারাবাহিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাজা ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহার আর ঘুম হইল না। সারা রাত্রি কেবল ভাবিতে লাগিলেন—কি সর্ব্বনাশ হইবে কে জানে? এই আটটি জীব নিশ্চয়ই কোন আসন্ন বিপদের কথা জানাইয়া গেল। আটটি জীব যেন পরামর্শ করিয়া একের পর এক আপন আপন কণ্ঠস্বরে একটা ভীষণ দুর্ঘটনার সঙ্কেত করিয়া চলিয়া গেল। গভীর শীতের রাত্রে রাজার গা হইতে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল।

প্রভাত হইবামাত্র রাজা পাত্রমিত্র ও পুরোহিতদের আহ্বান করিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনাইলেন। প্রধান পুরোহিত শুনিয়া একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া

গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"মহারাজ, এ যে বড়ই অশুভসূচক। যাই হোক ভয় পাবেন না, মহারাজ। বৃহৎ বাদরায়ণ মহাতন্ত্রে এর ব্যবস্থা আছে। আপনাকে একটা অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করতে হবে। একশত ব্রাহ্মণকে এই যজ্ঞে ব্রতী করতে হবে।"

রাজা বলিলেন—"যা কর্ত্তব্য তা আপনি করুন। আমার ত ভয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। অমাত্য জনার্দ্দন আপনার আদেশ মত সব আয়োজন করে দেবেন।"

রাজপুরোহিত তখন একটি বিশাল ফর্দ্দ রচনা করিলেন। তাহাতে অন্যান্য বহু উপকরণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় এক হাজার পশুর উল্লেখ থাকিল। তিন মাস ধরিয়া এই যজ্ঞ চলিবে। এক সপ্তাহের মধ্যে যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন হইয়া গেল। রাজ্যের বিবিধ অংশ হইতে ভারে ভারে ভোজ্য দ্রব্য আসিতে লাগিল—পর্ব্বতপ্রমাণ যজ্ঞকাষ্ঠ সংগৃহীত হইল—ঘৃতের জন্য একটি হ্রদ নির্ম্মাণ করা হইল—নানাপ্রকার সুখাদ্য তৈয়ারির গন্ধে নগর ভরিয়া গেল—পুরবাসীদের রসনায় অবিরল লালা ঝরিতে লাগিল। এক হাজার পশু সংগৃহীত হইল—তাহারা যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া সমস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া রাজার শুভ ও নিজেদের অশুভ ঘোষণা করিতে লাগিল।

প্রধান পুরোহিতের এক যুবক শিষ্য গুরুকে বলিলেন—"গুরুদেব, আপনি কেন অযথা রাজাকে ভয় দেখায়ে এই যজ্ঞে ব্রতী করলেন? কেন মিছামিছি রাজকোষের এত অর্থ ধ্বংস করছেন? রাজা আটটি শব্দ উপরি উপরি শুনেছেন তাতে ক্ষতিটা কি? একশত শব্দও শুনতে পারতেন। চারদিকে যখন নানা শ্রেণীর জীবজন্তু তখন তারা এরূপ শব্দ করবে এবং সে শব্দ কানে আসবে—এতে বৈচিত্র্য কি আছে? আপনি ত আমাকে সকল শাস্ত্রই পড়িয়েছেন। কোন শাস্ত্রে ত দেখিনি এইরূপ শব্দ শুনলে অশুভ হয় বা এজন্য একটা বিরাট যজ্ঞ করতে হয়। কোন স্মার্ত্তসংহিতায় একথা আছে?"

অষ্ট শব্দ জাতক

শ্রীকালিদাস রায়

পুরোহিত—বাপুহে তুমি থাম। প্রগল্‌ভতা করো না। যে শাস্ত্রে এসকল কথা আছে—সে শাস্ত্রটি তোমাকে পড়ানো হয়নি। সে শাস্ত্রটি শিখ্‌তে তোমার প্রবৃত্তিও নেই, এ ব্যবস্থা আছে স্বার্থসংহিতায়—কোন স্মার্ত্তসংহিতায় নয়। জানত বাপু অনেক দিন হতে কোন মোটা রকমের পাওনা ভাগ্যে ঘটেনি। মাসিক বরাদ্দ বৃত্তিতে আর চলে না। এরূপ মাঝে মাঝে না হলে পুত্র পরিবার কি করে সুখে থাকে বল দেখি। পুত্র পরিবার হলে তোমারও আপনা হতে এ জ্ঞান হবে—সে গুপ্ত সংহিতাটি না পড়লেও চল্‌বে। তার আগে পড়ালেও বুঝ্‌বে না।

শিষ্য—তবে গুরুদেব আমি ওসবের মধ্যে নেই। তালিকা হতে আমার নামটি কেটে দিন। এরূপ প্রবঞ্চনা ক'রে সরল ধর্ম্মভীরু রাজার কাছ হতে দানদক্ষিণা আদায় করাকে আমি মহাপাপ মনে করি। রাজা ধর্ম্মান্ধ ও একটু ভীরু-স্বভাব বলে তাকে বোকা বানিয়ে অর্থ উপার্জ্জন—এর মধ্যে আমি নেই।

পুরোহিত—মূর্খ, একমাস যে পেট ভরে মাংস খেতে পাবে—পায়স পিষ্ঠক ভোজন কর্‌তে পাবে—যা জীবনে কখনও খাওনি তাও যে খেতে পাবে—একথা ভুলে যাচ্ছ কেন? দানদক্ষিণা কিছু না হয় নাই নিলে—আহারটা ভাল হবে সে কথা ভেবে দেখ্‌ছ না বোকচন্দ্র। কাঁচকলা ভাতে খেয়ে খেয়ে কি বিরক্তি লাগ্‌ছে না? মুখ বদলাতে ইচ্ছে করে না? রাজার অভাব কি বাপু?

শিষ্য—না গুরুদেব, আমি এরূপ আহারকে শকুনির আহার মনে করি। আমি বিদায় নিলাম।

পুরোহিত—তুমি চ'লে যেতে পার—তোমার মত নির্ব্বোধ শিষ্যে আমার প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি নিয়ে থাক—তোমার কোথাও অন্ন জুট্‌বে না। আমরা পাপ করছি না আমরা রাজাকে দান ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত ক'রে

এবং নিজেদের পুত্রপরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করে ধর্ম্মাচরণই করছি। রাজার এতে পুণ্য হবে—আমাদের এতে লাভ হবে। তোমার না পোষায় চলে যাও।



শিষ্য চলিয়া গেল--কিন্তু ভাবিতে লাগিল কি করিয়া রাজাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে তাহাকে প্রবঞ্চনা করা হইতেছে। সে নিজে রাজার কাছে গিয়া কিছু বলিতে সাহস করিল না—ধর্ম্মান্ধ ভয়াতুর রাজা তাহার মত যুবকের কথা শুনিবে না—উপরন্তু তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না।

শ্রীকালিদাস রায়

তখন সে অনুসন্ধান করিয়া জানিল—রাজার উদ্যানে একজন ভিক্ষু আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার নিকটে শিষ্য সব কথা বলিল। ভিক্ষু বলিলেন—তোমাকে বল্‌তে হবে না, আমি নিজেই সব ব্যাপার দেখ্‌ছি—কিন্তু আমি কি করতে পারি? রাজার যত ভক্তি অর্থলোভী ভোজন-লোলুপ ব্রাহ্মণদের প্রতি—আমাদের মত ভিক্ষু শ্রমণদের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধাই নেই। আমি বারণ করলে তিনি শুন্‌বেন কেন?

শিষ্য—আপনি ভেবে একটা উপায় বের করুন—নইলে রাজা এই ভাবে বার-বার প্রবঞ্চিত হবে এবং লক্ষ লক্ষ পশু অযথা জীবন হারাবে।

ভিক্ষু—দেখ, রাজা যদি আমাকে তাঁর স্বপ্নের অষ্ট শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন—তা হলে আমি ব্যাখ্যা ক'রে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারি। নইলে নিজে যেচে গিয়ে তাঁকে কিছু বলতে পারি না।

শিষ্য তখন রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল—

মহারাজ, আপনার উদ্যানে এক বৃদ্ধ শ্রমণ এসেছেন। তিনি আপনার শোনা আটটি শব্দের ব্যাখ্যা করতে পারেন। আপনি যদি নিজে উদ্যানে একবার বেড়াতে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তা'হলে আপনি সদুত্তর লাভ করবেন।

রাজা ভাবিলেন—দেখাই যাক না কেন? বৃদ্ধ শ্রমণই বা কি বলে? তিনি উদ্যানে গিয়া বৃদ্ধ ভিক্ষুকে প্রণাম করিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন।

শ্রমণ বলিলেন—"মহারাজ, ঐ আটটি শব্দের সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই—ওর দ্বারা আপনার কোন অশুভই সূচিত হচ্ছে না। আপনি প্রথমে কয়েকটি বাদুড়ের শব্দ শুনেছিলেন—নয়?

মহারাজ—হ্যাঁ ভদন্ত, আপনি ঠিকই বলেছেন।

শ্রমণ—আমি পশু পক্ষীদের কথা বুঝি। বাদুড়গুলো আপনার রাজ বাড়ীর বাগানে এসে ফল খেত। সেদিন বাগানের মালীরা জাল দিয়ে ফলের গাছ-

গুলোকে ঘিরে ফেলেছিল। তাই বাতুড়গুলো তুঃখ ক'রে বল্‌ছিল—পাঁচ ক্রোশ দূর হ'তে ফলের আশায় এলাম—হায় হায় সব গাছগুলো জাল দিয়ে ঘেরা! রাজার বাগানেও যদি আমরা খেতে না পাই, তবে আমরা কোথায় যাব?

আপনি তার পর শুনেছিলেন—একটি কাকের শব্দ। তাই নয়?

মহারাজ—হ্যাঁ ভদন্ত।

শ্রমণ—আপনার হস্তিশালার তোরণের উপর একটি কাকী বাসা বেঁধেছে। আপনার একজন মাহুত যখন হাতী নিয়ে তোরণ পার হয়—তখন সে ঐ কাকের বাসায় অঙ্কুশের আঘাত করে। তাতে তার তুএকটি ক'রে ডিম পড়ে ভেঙ্গে যায়। তাই ঐ কাকী তুঃখ ক'রে বলছিল—আমি কোন অপরাধ করিনি, মাহুতটা অনর্থক আমার ডিমগুলো ভেঙ্গে দিচ্ছে—এ রাজ্যে কি তার কোন বিচার নেই?

আপনি তৃতীয় শব্দ শুনেছিলেন—একটি গাভীর।

মহারাজ—ঠিক বলেছেন ভদন্ত।

শ্রমণ—আপনার গোশালার একটি গাভী আর্ত্তনাদ করে বল্‌ছিল—রাজার গোয়ালারা এমনি নিঃশেষ ক'রে তার তুধ তুইয়ে নেয় যে, তাহার বাছুরটী রাত্রি কালে পেটভরে খেতে পায় না। রাজার গোশালায় এত গাভী থাক্‌তে কেন যে তারা এমন করে তাদের গা নিঙড়ে তুধ বের করে—তাই সে আক্ষেপ ক'রে জিজ্ঞাসা করছিল। সে বলছিল—বাছুর মেরে তুধ না খেলে কি রাজার পেট ভরে না?

আপনি চতুর্থ শব্দ শুনেছিলেন—একটি পোষা-কোকিলের। পোষা-কোকিল বল্‌ছিল—আমাকে কেন যে খাঁচায় বন্দী ক'রে রেখেছে বুঝি না। খাঁচায় থেকে আমি কখনও গান করি না—আর্ত্তনাদই করি। আমাকে যদি ছেড়ে দেয়, তবে অনায়াসে আমি রাজবাড়ীর আমগাছের ডালে বসে মনের আনন্দে গান করতে পারি। আমার আর্ত্তনাদ শুনে রাজার কি লাভ হয়?

আপনি পঞ্চম শব্দ শুনেছিলেন—একটা পোষা হরিণের। নয় কি?

মহারাজ—হ্যাঁ ভদন্ত, ঠিকই বলেছেন।

শ্রমণ—হরিণটা বলছিল—আহা বিন্ধ্যপর্ব্বতের ঝরণার ধারে কেমন স্বাধীন ভাবে বিচরণ ক'রে আমি কচি কচি ঘাস খেতাম। সেখানে বাঘের ভয় ছিল সত্য, তেমন সুখের জীবন খাঁচার মধ্যে রাজভোগ খেয়েও কি আর ফিরে পাব? আমাকে বন্দী করে রেখে রাজার কি লাভ হয় জানি না।

আপনি ষষ্ঠ শব্দ শুনছিলেন—একটা পোষা বানরের। বানরটি কি বলছিল জানেন? সে বলছিল—"আমি ছিলাম বনে—কোনদিন রাজার বাগানে এসে কোন ক্ষতি করি নি। কোন অপরাধে যে রাজা আমাকে বন্দী ক'রে রেখেছেন—তা বুঝি না। আমাকে দেখেও আর কেউ আনন্দ পায় না—আমার দ্বারা রাজার কোন ইষ্ট সিদ্ধি হয় না। মিছামিছি রাজা আমাকে বন্দী ক'রে রেখেছেন।"

আপনি সপ্তম শব্দ শুনেছিলেন—একটি অশ্বের। তাই নয়?

মহারাজ—হ্যাঁ ভদন্ত।

শ্রমণ—অশ্বটি বলছিল—সহিস প্রত্যহ আমার দানা চুরি করে। আমি পেট ভ'রে খেতে পাই না। হায় এতবড় রাজার রাজ্যে দেখ্‌বার কেউ নেই। শরীরে বলের অভাবে আমি রথ টেনে দ্রুত চল্‌তে পারি না,—সারথী ভাবে আমি ইচ্ছা করেই বুঝি আস্তে চল্‌ছি—তাই ভেবে আমার পিঠে ক্রমাগত চাবুক মারে। রাজা দেখেও বোঝে না।

শেষ শব্দ শুনেছিলেন—আমারই গানের। আমি অন্য গ্রাম হতে বাগানে ফির্‌বার সময় গাইতেছিলাম—রাজা কেবল অপাত্রে দান করে চলেছে। প্রকৃত দান কাকে বলে রাজা তা জানে না। রাজার সুমতি হোক, রাজার অলীক ভয় দূর হোক, রাজার সত্যধর্ম্মে মতি হোক—দুর্জ্জন স্বার্থপরদের হাত হতে রাজা রক্ষা পাক।

ছোটদের গল্পিকে

অষ্ট শব্দ জাতক
শ্রীকালিদাস রায়

অষ্টশব্দের ব্যাখ্যা শুনিয়া রাজার মন ভক্তিতে বিগলিত হইল। পুরোহিতের শিষ্য তখন রাজাকে ভিতরকার কথা সব খুলিয়া বলিলেন এবং পুরোহিত কেন যে তাঁহাকে যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তাহাও বলিলেন।

রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া যজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিলেন, পুরোহিত ও অন্যান্য ভণ্ড ব্রাহ্মণদের দূর করিয়া দিলেন। যূপবদ্ধ পশুগুলি মুক্তি পাইয়া আনন্দে কলরব করিতে লাগিল। তার পর তিনি বাগানে ফলের গাছের জাল খুলিয়া দিলেন, মাহুতকে ডাকিয়া কাকের বাসায় আঘাত করিতে নিষেধ করিলেন, গোয়ালাদের ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—"বাছুরদের পেট ভরে গেলে তবে গরুর দুধ দোয়াবে।" কোকিল, বানর, হরিণ ও অন্যান্য আবদ্ধ জীবগণকে মুক্তি দিলেন, যুবরাজকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি নিজে হাজির থেকে ঘোড়াদের খাওয়াবে।"—সারথী-দের ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিতে নিষেধ করিলেন এবং শ্রমণের নিকট দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। শ্রমণের উপদেশে রাজা রাজ্য হইতে যাগযজ্ঞ, মূর্ত্তিপূজা ও পশুবলি উঠাইয়া দিলেন এবং দীন দুঃখী আতুর অনাথ ও ভিক্ষু শ্রমণদের জন্য দানশালা প্রতিষ্ঠিত করিলেন—আতুরাশ্রম খুলিয়া দিলেন এবং রাজ্যের মধ্যে রাজা অশোকের মত নানাপ্রকার জনহিতকর অনুষ্ঠানের বিধান করিলেন। সর্ব্বজীবের প্রতি কারুণ্যে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। সকলেই বোধহয় বুঝিতে পারিতেছেন—এই শ্রমণই স্বয়ং বোধিসত্ত্ব।




ভূতের গল্প



ধ্বংস-বীজ

শ্রীঅখিল নিয়োগী

তখন আমরা ইউনিভারসিটি কলেজে পড়ি।

রোজই শুন্‌তে পাই, বিনোদদের বাড়ী সন্ধ্যার পর কলেজের ছেলেদের গোপন-সভা বসে—আর সেখানে নাকি 'প্ল্যান্‌চেটে' ভূত আনানো হয়।

প্রথম যেদিন কথাটা শুন্‌লাম, স্রেফ্‌ হেসে উড়িয়ে দিলাম। ভূত? বিংশ শতাব্দীতে এই কল্‌কাতার বুকের ওপর বসে ভূতের কথা বিশ্বাস করতে হবে নাকি? সেই পৌরাণিক যুগের গাঁজাখুরী সব গল্প আর যে-কেউ বিশ্বাস করুক—আমি করবো না।

কিন্তু প্রত্যহ রকমারী কথায় কলেজের 'কমন-রুম' সরগরম হ'তে লাগ্‌লো। কবে নাকি বিদ্যাসাগর মশাই

এসে বলে গেছেন—আজকালকার অদ্ভুত বানান-সমস্যা দেখে—তিনি নাকি স্বর্গে বসেও শান্তি পাচ্ছেন না ;—কবে বঙ্কিমচন্দ্র তার এক অপ্রকাশিত উপন্যাসের হদিস দিতে দিতে—কোথায় যেন কার ডাকে চলে গেলেন। কবে সত্যেন দত্ত এসে—গড় গড় করে "আবিসিনিয়ার পতন" সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখে দিয়ে গেলেন—এই ধরণের সব মুখরোচক কথায় কলেজের সর্ব্বত্র একেবারে গুল্‌জার হয়ে উঠ্‌ল।

ভাব্‌লাম—একদিন সন্ধ্যের দিকে যাবো নাকি রগড়টা দেখ্‌তে? সেদিন বিনোদ এসে আমায় বল্লে, 'হ্যারে নির্ম্মল, তুই এমন কি বড়লোক হয়ে উঠেছিস! সবাই দেখ্‌তে গেল আর তুই যেতে পারলি নে?' আমি মনের আগ্রহ দমন করে বল্লাম, বড়লোকের কথা ত' হচ্ছে না—আমি ও ভূত-ফুত্ বিশ্বাস করি না।

অবাক হয়ে বিনোদ বল্লে, বলিস্ কিরে? না দেখেই অবিশ্বাস? এই ত' সেদিন প্রফেসার সোম গিয়েছিলেন…তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লুম, কিন্তু আমাকে স্বীকার করাতে যদি পারিস তবে বুঝ্‌বো—

উৎসাহিত হয়ে বিনোদ বল্লে, বেশ ত! আজই সন্ধ্যের পর আয় আমাদের ওখানে—

বল্লাম, অনেক লোকের ভিড় হলে কিন্তু আমি যাবো না—জবাবে বিনোদ বল্লে, আচ্ছা চারজন না হলে ত' 'প্লানচেটে' বসা যাবে না। আমি, তুই—আর দুটি বন্ধুকে আমি চুপি চুপি ডেকে নিয়ে যাবো'খন আজ আর কাউকে খবর দেবো না।

যথাসময়ে গিয়ে বিনোদের বাড়ী হাজির হলুম। ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা কর্চ্ছিল। বল্লে, আয়। বিনোদের ডাকে যে ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লুম—সেটা একরকম

অন্ধকারই বলা চলে। খুব অল্প পাওয়ারের একটি 'বাল্‌ব্‌—তা-ও নীল কাগজে জড়ানো বলে একটা আলো-আঁধারি থম্‌থমে ভাব যেন ঘরটিকে ছেয়ে রেখেছে।

মাঝখানে একটি তেপায়া টুল—তারি চারপাশে আমাদের বস্‌তে হবে। টুলের ওপর রয়েছে একখণ্ড কাগজ—আর একটি পেন্সিল। আত্মা যখন আস্‌বে —সে নাকি প্রশ্নের জবাব পেন্সিল দিয়ে ঐ কাগজের ওপর লিখে যাবে—কিন্তু কি লিখ্‌ছে কেউ তা' দেখ্‌তে পাবে না।

ব্যাপারটাকে এমন অদ্ভুত ও অসম্ভব বলে মনে হল যে, আমি না হেসে থাক্‌তে পারলাম না।

বিনোদ আমাকে ধমক দিয়ে বল্লে, দেখ নির্ম্মল, অবিশ্বাস নিয়ে 'প্ল্যান্‌চেটে' বসা চল্‌বে না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি আমার নিজের মনকে স্থির করে ফেল্লাম। বল্লাম, না, আমি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই তোমাদের সঙ্গে বস্‌তে পারবো। কি করতে হবে বলো।

বিনোদের নির্দ্দেশে সেই তেপায়া টুলটার চারপাশে আমরা বস্‌লাম।

বিনোদ বল্লে, এখন বিশেষ কোনো আত্মার কথা আমাদের ভাব্‌তে হবে। র ন বল্লে, এসো আশু মুখুজ্জের কথা আজ ভাবা যাক্‌। পরীক্ষায় পাশ হ'ব কি না—জিজ্ঞেস্‌ করা চল্‌বে।

পরীক্ষার পাশের জন্যে হোক বা না-ই হোক—আশু মুখুজ্জের কথায় কারো আপত্তি হ'ল না। আমরা চারটি প্রাণী বসে সেই বিরাট পুরুষের ধ্যান করতে লাগ্‌লাম।

ঘরটার সেই থম্‌থমে ভাব—তার ওপর আমাদের চারজনের এই মৌন-নিস্তব্ধ অবস্থান, সবটা জড়িয়ে কেমন যেন একটা অলৌকিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করছিল।

ছিন্নপত্রিকে

ধ্বংস-বীজ

শ্রীঅখিল নিয়োগী

কতক্ষণ সেই ভাবে ছিলাম মনে নেই—হঠাৎ বিনোদ প্রশ্ন করলে, আশুবাবুর আত্মা যদি এসে থাকেন—তবে তেপায়ার একটি পায়া তুলে একটা শব্দ করুন।

আমরা সবাই উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শব্দ হ'ল দুটি।

রণেন বল্লে, তা হলে অন্য কারো আত্মা এসেছে হয়ত! বিনোদ বল্লে, আপনি যদি আশু মুখুজ্জে না হয়ে অন্য কোনো আত্মা হন তবে আবার দুটো শব্দ করে আমাদের তা জানিয়ে দিন—

আমরা প্রাণপণে পায়া চেপে ধরে রাখলাম। কিন্তু আবার শব্দ হ'ল—ঠক্—ঠক্!

বিনোদ বল্লে, আমরা বুঝতে পারলাম, আপনি আশুবাবু নন—যাই হোক আমরা আপনাকে প্রশ্ন করবো—আপনি এই কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে লিখে তার জবাব দিন।

প্রশ্ন করলাম—প্রথমে আমি। জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কে?

উত্তর লেখা হল—আমি বহু প্রাচীন যুগের অশরীরী আত্মা।

প্রশ্ন—আপনি আর জন্মগ্রহণ করেন নি?

উত্তর—না, আমার মনে অপূর্ণ বাসনা রয়েছে, সেই জন্য আমি স্বর্গেও যেতে পাচ্ছিনে—জন্ম গ্রহণও করতে পাচ্ছি না—

রণেন জিজ্ঞেস করলে—আমরা পরীক্ষায় পাশ হব কিনা আপনি বল্‌তে পারেন?

তেপায়াতে ক্রমাগত ঠক্ ঠক্ করে শব্দ হ'তে লাগ্‌লো।

বিনোদ বল্লে, আত্মা বিরক্ত হয়েছে। দাঁড়াও আমি প্রশ্ন করি।

বিনোদ জিজ্ঞেস করলে—আপনার নিজের কিছু বলবার আছে?

কাগজে লেখা হ'ল—হ্যাঁ।

ধ্বংস-বীজ

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বিনোদ বল্লে, বেশ, আপনি আমাদের কাছে যা বল্‌তে চান—ঐ কাগজে লিখেদিন।

খস্ খস্ করে কাগজের ওপর কি সব লেখা হ'তে লাগ্‌লো, আমরা অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম।

লেখা যখন শেষ হ'য়ে গেল—আমি কাগজখানা টেনে নিয়ে দেখ্‌লাম—কি সর্ব্বনাশ! এ যে কিছুই পড়তে পাচ্ছিনে!

বিনোদ বল্লে, দেখি—দেখি—

তারপর খানিকক্ষণ কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে বল্লে, এ যে প্রাকৃত ভাষা—আমরা পড়তে পারবোনা।

আমি বল্লাম, তবে চল—এক পণ্ডিতের কাছে যাই, তিনি হয়ত এর পাঠোদ্ধার করতে পারবেন।

পণ্ডিত মশাই চোখে চশমা লাগিয়ে বহুক্ষণ কাগজখানার দিকে তাকিয়ে থেকে বল্লেন, কাগজখানা রেখে যাও, কাল এসো—আমি এর পাঠোদ্ধার করে দেবো।

আমরা চারজনে নানা কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে শঙ্কিত মনে বাসায় ফিরে এলাম।

পর দিন ঘুম ভাঙ্‌তেই ছুটলাম পণ্ডিত মশায়ের বাড়ীর দিকে।

মা পেছু ডেকে বল্লে, হ্যারে নিমু, সকালে উঠেই কোথায় ছুটছিস্—চা খেয়ে যা!

আমি বল্লাম, না, না এখন সময় নেই,—একটা দরকারী কাজে যাচ্ছি।

পণ্ডিত মশায়ের ওখানে পৌঁছে দেখি আমার আর তিনটি বন্ধু বোধ করি রাত্তিরে ঘুমোয় নি—সেই কখন থেকে বসে আছে!

পণ্ডিত মশাই পূজো আর্চ্চা সেরে খানিক বাদেই বৈঠকখানায় পৌছলেন—তারপর এক টিপ্ নস্যি নিয়ে বল্লেন, বাবাজীরা, কাল রাত্তিরে অনেক কষ্টে লেখাটির পাঠোদ্ধার করেছি—কিন্তু এ যে দেখ্‌ছি ভূতুড়ে ব্যাপার—

শিশুসাথী গল্পিকা

ধ্বংস-বীজ

শ্রীঅখিল নিয়োগী

আমরা তিনজনে একসঙ্গে কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করলাম, কেন পণ্ডিত মশাই, কি হয়েছে ?

পণ্ডিত মশাই বল্লেন, বহুকালের প্রাচীন এক প্রেতাত্মা জানাচ্ছে—

আমি বলে উঠ্‌লাম,—কি জানাচ্ছে পণ্ডিত মশাই ?

—জানাচ্ছে—মহেঞ্জডারোতে—যেখানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা হয়েছে, তারি তিন মাইল দক্ষিণে একটা যায়গা সে নির্দ্দেশ করে দেবে—সেখানে মাটী খুঁড়লে পাওয়া যাবে—একটি হাতীর দাঁতের কৌটো। সেই কোটো না খুলে সেটা তারি হাতে দিয়ে দিতে হ'বে। এই উপকারের পরিবর্ত্তে সে তোমাদের অনেক গুপ্তধনের সন্ধান দেবে।

ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস্য বলেই উড়িয়ে দিতাম—কিন্তু কাল এটা আমাদের চোখের সামনে লেখা হয়েছে।

এই যুগে কল্‌কাতার বুকের ওপর বসে ভূত বিশ্বেস করতে হ'বে নাকি ?

হঠাৎ বিনোদ বলে উঠ্‌ল, কিন্তু পণ্ডিত মশাই, ভূতের হাতে কৌটো তুলে দেয়া যাবে কি করে ?

পণ্ডিত মশাই জবাব দিলেন, সে সমস্যার উত্তর-ও চিঠিতেই আছে। প্রেতাত্মা জানাচ্ছে, তারি নির্দ্দেশ মতো একটা জায়গায় কৌটোটা রেখে দিলেই সে পাবে।

আমি বল্লাম, না হয় প্রেতাত্মা আছে একথাটা স্বীকার করা গেল এবং কৌটোটাও তুলে দেয়া গেল তার হাতে ; কিন্তু সে যদি ওটা পেয়ে আর আমাদের গুপ্তধনের সন্ধান না দেয় ?

বিনোদ বল্লে, আমার বিশ্বাস, ঐ হাতীর দাঁতের কৌটোর ভেতর এমন কোনো গুপ্তধন আছে, যার তুলনায় আমাদের টাকা মোহর—সব খোলাম কুচি !

পণ্ডিতমশাই আর এক টিপ্ নস্যি নিয়ে বল্লেন, তা হ'লে কি বাবাজীরা মহেঞ্জ-ডারোতে যাওয়াই স্থির করলে ?

আমাদের আর তুটি বন্ধু কথাটীকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বল্লে, কোথায় কোন্ ভূত—তার খপ্পরে গিয়ে পড়বো কোন পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশে তার ঠিক নেই !

কিন্তু আমার যেন কেমন রোখ চেপে গেল। বল্লাম, এখনই যেতে হয়ত পারবো না—তবে মহেঞ্জডারোতে একবার আমাকে যেতেই হবে।

বিনোদও আমার কথায় সায় দিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগ্‌লো। আমরা পণ্ডিত মশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

এর পর কলেজের ক্লাশ, মেট্রোর ছবি আর মোহনবাগানের খেলার ভেতর দিয়ে সেই অশরীরী প্রেতাত্মা যে কোথায় লুকালো—তার আর কোনো হদিসই পাওয়া গেল না !

এর মাস ছয়েক পরে হঠাৎ অভাবনীয় রূপেই আমাদের মহেঞ্জডারোতে যাবার সুযোগ ঘটে গেল।

আমাদের কলেজ থেকে পুরাতত্ত্ব আলোচনা করবার জন্য অধ্যক্ষ মশাই একটা অভিযানের (excursion) ব্যবস্থা করলেন।

বলাবাহুল্য আমাদের চারজনই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তার আগে নিজেদের ভেতর একটা চুক্তি হয়ে গেল যে, সেই প্রেতাত্মার কাহিনী কাউকে প্রকাশ করা হবে না !

মহেঞ্জডারোর সেই বিরাট ধ্বংসস্তূপের অতি কাছেই আমাদের কলেজের তাঁবু পড়ল।

নিশীথ রাত্রি।

তাঁবুতে আর সবাই ঘুমিয়েছে, কিন্তু আমাদের চক্ষে ঘুম নেই।

নিঃশব্দে আমরা চার বন্ধু বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ধ্বংস-বীজ

শ্রীঅখিল নিয়োগী

ওপরে নক্ষত্র-খচিত অনন্ত নীলাকাশ আর চারি পাশে যেন শতাব্দীর কঙ্কাল নিষ্পলক চক্ষে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

বিনোদই সকলের আগে সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্‌লে।

বল্লে, প্ল্যান্‌চেট্‌টা সঙ্গে নিয়ে এলে ভালো হত। প্রেতাত্মাটাকে ডাকা যেতো—

বিনোদ আরো কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে—একটা কালো মেঘ যেন মাটী ফুঁড়ে বেরুল।

তার দিকে হয়ত আমরা অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়েই থাক্‌তাম—কিন্তু ধীরে ধীরে সেই কালো মেঘটা একটা আবছা আকার ধারণ করল এবং জলদ-গম্ভীর স্বরে বল্লে, আমি ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়েছি। এসো আমার সঙ্গে—

সেই আবছা মূর্ত্তি আমাদের ইঙ্গিত করে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হল আমরাও মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার পেছন পেছন চল্লাম।

কতক্ষণ সেই ভাবে গিয়ে কতখানি পথ চলেছি মনে নেই—হঠাৎ মূর্ত্তি একটা যায়গা দেখিয়ে দিয়ে বল্লে, এই খানটায় খুঁড়তে হবে! তারপর যেন একেবারে হাওয়ায় মিশে গেল।

আমরা পরস্পর কতক্ষণ মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম; তারপর বিনোদের পরামর্শে যায়গাটাতে একটা চিহ্ন রেখে তাঁবুতে ফিরে এলাম।

রাত্রি যোগে যা' ছিল ভয়াবহ—দিনের আলোতে সে ভয়টা অনেক কেটে গেল।

বিনোদ বল্লে, সবাই ঘুমুলে আজ রাত্তিরে গিয়ে আমরা মাটী খুঁড়ে সেই কৌটোটি বের করবো।

বল্লাম, অত শক্ত মাটী আমরা খুঁড়বো কি করে? হয়ত একমাস সময় লাগ্‌বে।

বিনোদ হেসে বল্লে, সে ব্যবস্থা আমি আজ সকালে উঠেই করেছি। এক ডজন কুলির ব্যবস্থা করা গেছে—তারা আজ রাত্তিরেই কাজ শেষ করতে পারবে বলেছে।

জবাব দিলাম, সবই না হয় হ'ল, কিন্তু কৌটোটি কোথায় ফেরৎ দেবে?

মুচ্‌কি হেসে বিনোদ বল্লে, পাগল হয়েছ···অত কষ্ট করে উদ্ধার করে দেবো ফেরৎ? ঐ কৌটোর ভেতর এমন কোনো মূল্যবান জিনিষ আছে—বর্ত্তমান সভ্য জগৎ যার সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

সবাই ঘুমুলে রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আমরা চারটি প্রাণী তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

কুলিরদলও তৈরী হয়েছিল—আমরা পৌঁছুবামাত্রই তারা কোদাল নিয়ে কাজ সুরু করে দিলে।

অনেকখানি মাটি গোঁড়া হল—কিন্তু দু' একটি প্রাচীন মূর্ত্তি ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। রাতও তখন অনেক হয়ে গেছে, আমরা একরকম হতাশই হয়ে পড়লাম। কিন্তু বিনোদের মাথায় যেন রোখ চেপে গেল!

বল্লে, না যত রাতই হোক—কৌটো আমাদের পেতেই হবে। রাত্রির শেষ প্রহরে কৌটোর সন্ধান মিল্‌ল।

মহা উৎসাহে বিনোদ কুলিদের বিদায় করে দিয়ে, আমাদের নিয়ে তাঁবুর দিকে রওনা হ'ল।

প্রায় অর্দ্ধেকটা পথ এসে পড়েছি—এমন সময় আমরা সবাই একসঙ্গে রাস্তার মাঝখানে থম্‌কে দাঁড়ালাম।

কালকের সেই আব্‌ছা-মূর্ত্তি আমাদের প্রায় ত্রিশ-ফুট আগে রাস্তা আগ্‌লে দাঁড়িয়েছে।

প্রিয় গল্পিকে

ধ্বংস-বীজ

শ্রীঅখিল নিয়োগী

শোনা গেল সে বল্‌ছে—কৌটোটা তোমরা ঠিক পেয়েছ দেখছি—ওটা এইখানে রেখে যাও—আমি সাত দিন বাদে তোমাদের বহু গুপ্তধনের সন্ধান বলে দেবো।

বিনোদ বল্লে, না কৌটো আমরা দেবো না। সাতদিন বাদে তোমাকে পাবো কি পাবো না…কে জানে !

মেঘে মেঘে ঘষা লাগ্‌লে যেমন শব্দ হয়—ঠিক সেই রকম একটা আওয়াজ শোনা গেল।

প্রেতাত্মা বল্লে, আমার কথাকে অবহেলা কোরো না—বিপদে পড়বে !

আমি ভয়ে ভয়ে বিনোদের কাণে কাণে বল্লাম, কি দরকার ভাই, ফেলে দেনা কৌটোটা।

বিনোদ চাপা গলায় জবাব দিলে, অশরীরী আত্মা আমাদের কি করবে ? নিশ্চয়ই আমরা এমন একটা জিনিষ পেয়েছি—যার কাছে সোনা রূপো, ধন-দৌলত কিছু নয় ;—আমরা এই কৌটো দিয়ে পৃথিবীতে অমর হব—সেই কি আমাদের বেশী কাম্য নয় ?

মূর্ত্তি গম্ভীর স্বরে বল্লে, কৌটো তোমার দেবার মতলব নয় দেখ্‌ছি ! তবে শোনো ও কৌটো তোমার কোনো কাজে লাগ্‌বে না। বিনোদ বল্লে, কৌটোর ভেতর কি আছে আমাকে বল্‌তে হবে ?

আবার সেই মেঘ গর্জ্জনের শব্দ !

বল্লে, তবে শোনো—কৌটোতে কি আছে তা' তোমাদের জেনে লাভ নেই, ওটা তোমরা ফেলে দাও। তোমাদের কাছে ও কৌটো আর মাটির ঢেলা একই জিনিষ। তার পরিবর্ত্তে আমি তোমাদের দেবো অগাধ ধনরত্ন। যা' তোমরা চিরজীবন খরচ করেও শেষ করতে পারবে না।

বিনোদটা চিরদিনই একগুঁয়ে। যা' একবার ধররে—কিছুতেই ছাড়বে না। বল্লে, কৌটো আমি কিছুতেই দেবো না।



ছোটদের গল্প সংকলন

গম্ভীর স্বরে জবাব এলো,—সত্য বটে ঐ কৌটো মানুষের হাতে থাক্‌লে আমরা কিছুতেই নিতে পারিনে কিন্তু এখনো তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—আমার কথার অবাধ্য হলে বিপদ হবে।

বিনোদটাও গোঁয়ার কম নয়—রুখে দাঁড়িয়ে বল্লে, বিপদকে আমরা থোড়াই কেয়ার করি।

এইবার আত্মার স্বর একটু নরম হল; বল্লে, তবে সত্যি কথাই শোনো, ঐ কৌটোর ভেতর আছে ধ্বংস-বীজ মন্ত্র।

সবাই চম্‌কে উঠ্‌লাম।

বল্লাম, ধ্বংস-বীজ—?

—হ্যাঁ, ধ্বংস-বীজ—গম্ভীর কণ্ঠে জবাব এলো। আজ্‌কের দিনে তোমরা আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ইটালীর 'গ্যাস্ বোমার' কথা শুনে কেঁপে ওঠ—কিন্তু ঐ ধ্বংস-বীজ মন্ত্র আয়ত্তে থাক্‌লে সমস্ত পৃথিবীকে পায়ের তলায় রাখা যায়।

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমি ঐ ধ্বংস-বীজের সৃষ্টি করি, কিন্তু রাজার আদেশে আমাকে ফাঁসি দেয়া হয়; আর আদেশ হয় ঐ কৌটো মাটীতে পুঁতে ফেল্‌বার। কতদিন পর আবার তা' উদ্ধার হল—তোমাদেরই চেষ্টায়। ওটা আমায় দাও, আমি তোমাদের পুরস্কার দেবো।

বিনোদ বল্লে, এই ধ্বংস-বীজের কাহিনী না শুনলে হয়ত বা কৌটোটা ফেরৎ দিতাম, কিন্তু এই ভয়াবহ ব্যাপারের কথা জেনে আমি কিছুতেই তা তোমার হাতে তুলে দেবো না; এই কৌটো ফেরৎ দিলে পৃথিবীর বুকে তোমার স্বেচ্ছাচারিতায় অবাধ ধ্বংস-লীলা চল্‌বে—মানব জাতির এমন সর্ব্বনাশ আমি কিছুতেই হতে দেবো না।

বিনোদের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট অট্টহাস্য শুনে আমরা

সবাই আঁৎকে উঠ্‌লাম, দেখা গেল···সেই আব্‌ছা মূর্ত্তি···দূরে আকাশের গায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

ভয়ে ভয়ে সবাই তাঁবুতে ফিরে এলাম।

ফিরতি-মুখে বিনোদকে বল্লাম, ভাই, কি বিপদ হবে কে জানে—কৌটোটা ফেলে দিলেই হত!

বিনোদ চোখ গরম করে বল্লে, ও কথা শুনেও তুই ফেরৎ দিতে বল্‌ছিস্?—কাপুরুষ!

কৌটো নিয়ে সে তার নিজের কামরায় ঢুকে পড়ল!

পরদিন সকালবেলা ছেলেদের চ্যাঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল! গিয়ে দেখি বিষম ব্যাপার! বিনোদকে কে যেন গলা টিপে অজ্ঞান করে রেখে গেছে! চারদিকে চেয়ে দেখ্‌লুম—সে কৌটোটিও নেই!

বুঝ্‌লাম—বিনোদ বোধ করি টেবিলের ওপর কৌটোটি রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল—সুযোগ বুঝে প্রেতাত্মা কৌটো নিয়ে পালাবার সময় রাগ মিটিয়ে গেছে!

কিন্তু তখন আর এ সব কথা ভাব্‌বার সময় নেই; শোনা গেল কিছুদূরে একটা ডাক বাংলো আছে এবং সেখানে একটি ডাক্তারও থাকেন। সবাই মিলে সেখানেই বিনোদকে পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু আমরা আর তিনজন ভয়ে প্রফেসরকে প্রেতাত্মার কথা আর কিছু বল্লুম না।

এর কিছুদিন পরের কথা—

আমরা সবাই কল্‌কাতায় ফিরে এসে আবার ক্লাশ করতে সুরু করে দিয়েছি। বিনোদ প্রাণে বেঁচে গেছে বটে, কিন্তু তারপর থেকেই কি রকম অসংলগ্ন কথা বলে!

ধ্বংস-বীজ

শ্রীঅখিল নিয়োগী

ডাক্তাররা রায় দিয়েছেন—ওর নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

একদিন সকালবেলা চায়ে চুমুক দিতে দিতে 'বার্ত্তাবহ' কাগজখানা ওল্টাচ্ছিলুম হঠাৎ একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপনের ওপর চোখ পড়ল। বিজ্ঞাপনটিতে এই লেখা:

"নির্ম্মল,

মনে হয় তুমি তোমার বন্ধুর মতো একগুঁয়ে নও, আমার সঙ্গে আগামী অমাবস্যায় রাত্রি ৩টার সময় বাবুরাম ঘাটে দেখা করবে। তোমার ভাল হ'বে। ইতি—

তোমাদের—

মহেঞ্জডারোর বন্ধু।"

লেখাটা পড়েই আমার সমস্ত মন কেঁপে উঠ্‌ল। সেই অশরীরী আত্মা এখন মানুষ হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নাকি? শুধু তাই নয়—সে খবরের কাগজে গিয়ে বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত দিয়েছে! কল্‌কাতার বুকের ওপর কি সবই সম্ভব?

প্রথমে মনে করলুম, আর দুটি বন্ধুর চালাকি! কিন্তু তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে—তারাও কাঁপ্‌তে সুরু করে দিলে। বল্লে, এর পর কি আমাদের কাছেও চিঠি আস্‌বে নাকি?

বুঝ্‌লাম ওরা এ কাজ করেনি। সোজা উঠ্‌লাম গিয়ে 'বার্ত্তাবহ' আপিসে। তাঁরা বল্লেন, এ বিজ্ঞাপন কে দিয়েছে আমরা জানিনে—একটা খামের ভেতর এই বিজ্ঞাপন, দশ টাকার একটি নোট এবং বিজ্ঞাপনটি ছাপবার একটি অনুরোধ-পত্র ছিল। চিঠি ডাকে এসেছিল।

হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরলাম। ভাব্‌লাম এ যখন পেছু নিয়েছে সহজে ছাড়বে না, তার চাইতে গিয়ে কি তার অভিপ্রায় জিজ্ঞেস করাই ভালো—এ ক্ষেত্রে পুলিসের সাহায্য চাওয়া বৃথা; তাতে হিতে বিপরীত হ'তে পারে।

মনে মনে স্থির করলাম—ভয় পাবার ছেলে আমি নই—গিয়ে দেখাই করি না কি হয়—

শিশুসাথী ইতিকে

ধ্বংস-বীজ

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বাড়ীতে কাউকে কিচ্ছু বল্লাম না।

অমাবস্যার রাত্তিরে দুটো বাজ্‌তেই বাড়ী থেকে বেরুলাম। যখন গিয়ে বাবুরাম ঘাটে পৌঁছ্‌লাম—তিনটে বাজ্‌তে তখনো মিনিট দশেক বাকি।

মনটা ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল—আপন মনে পাইচারী করতে লাগ্‌লাম—আর চারদিকে তাকাতে লাগ্‌লাম, কখন সেই মেঘের মতো আব্‌ছা মূর্ত্তি এসে হাজির হয়।

খানিক বাদে আর পাইচারীও ভালো লাগ্‌লো না। ভাবলাম—একটু বসা যাক্।

হঠাৎ কে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বল্লে, কতক্ষণ হ'ল এসেছ?

পেছন ফিরে চেয়ে দেখি এক ভদ্রলোক—দিব্যি জামা-জুতো পরা!

খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বল্লাম, কৈ আমি ত' আপনাকে চিন্‌তে পাচ্ছিনে!

ভদ্রলোক এইবার হো-হো করে হেসে উঠ্‌লেন। বল্লেন, আমিই তোমাদের সেই মহেঞ্জডারোর বন্ধু!

আমাকে হা করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে দেখে বল্লেন, ঐ কৌটোর এমন কতকগুলো অলৌকিক গুণ আছে, যার জোরে আমি তোমাদেরই মতো বিংশ শতাব্দীর লোক হতে পেরেছি। কিন্তু সব কাজ এখনও আমার শেষ হয়নি—সেই কাজটি হয়ে গেলে পৃথিবীতে আমার অসাধ্য কিছুই থাক্‌বে না—সেজন্য আমার সত্যিকারের জীবন্ত মানুষের সাহায্য প্রয়োজন। ভাব্‌লাম পুরোণো বন্ধু ত' তুমি রয়েছ—তুমি নিশ্চয়ই একগুঁয়ে হয়ে আমার আর তোমার উভয়ের সর্ব্বনাশ করবে না। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি—এই উপকারের বিনিময়ে তোমাকে আমি কোটিপতি করে দেবো।

বুঝ্‌লাম এ সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। যথাসম্ভব গম্ভীর হ'য়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কি করতে হ'বে ?

ভদ্রলোকটি বল্লেন, গঙ্গায় স্নান করে—কৌটোর ভেতর একটি সংস্কৃত শ্লোক লেখা আছে সেইটি পাঠ করতে হবে। পর পর তিনটি অমাবস্যা রজনীতে শ্লোকটি আমাকে শোনালেই তোমার কাজ শেষ।



উপায় যখন নেই—তখন রাজী হয়ে গেলাম। গঙ্গায় বেশ করে স্নান করলাম—তখনো আপন মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম কি করা যায়! ভেজা কাপড়েই গিয়ে তীরে উঠ্‌লাম। ভদ্রলোকটি পকেট থেকে কৌটোটি বের করে আমার হাতে তুলে দিলেন।

হঠাৎ মন যেন কেমন বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল! যে জন্য আমার প্রিয়তম বন্ধু বিনোদ আজ পাগল, আমি সেই কাজ করে সমস্ত মানব জাতির অকল্যাণ করবো ?

ধ্বংস-বীজ
শ্রীঅখিল নিয়োগী

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা বুদ্ধিও খেলে গেল।……প্রেতাত্মা ত' এখন এই কৌটোর গুণে মানুষ হ'য়ে গেছে—এই কৌটো যদি তার হাতে আর না যায় ত' কোনো ক্ষমতাই তার আর থাক্‌বে না—আমার আর কোনো অনিষ্টও সে করতে পারবে না।

ভদ্রলোকটি আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে বল্লেন, অত কি ভাবছ, পড় শ্লোকটা—

আমি চোখের নিমেষে কৌটোটা ছুঁড়ে গঙ্গার জলে ফেলে দিলাম।

গঙ্গায় গিয়ে কৌটোটা পড়ল—স্পষ্ট শুনতে পেলাম—"ঝুপ্" করে শব্দ হল।

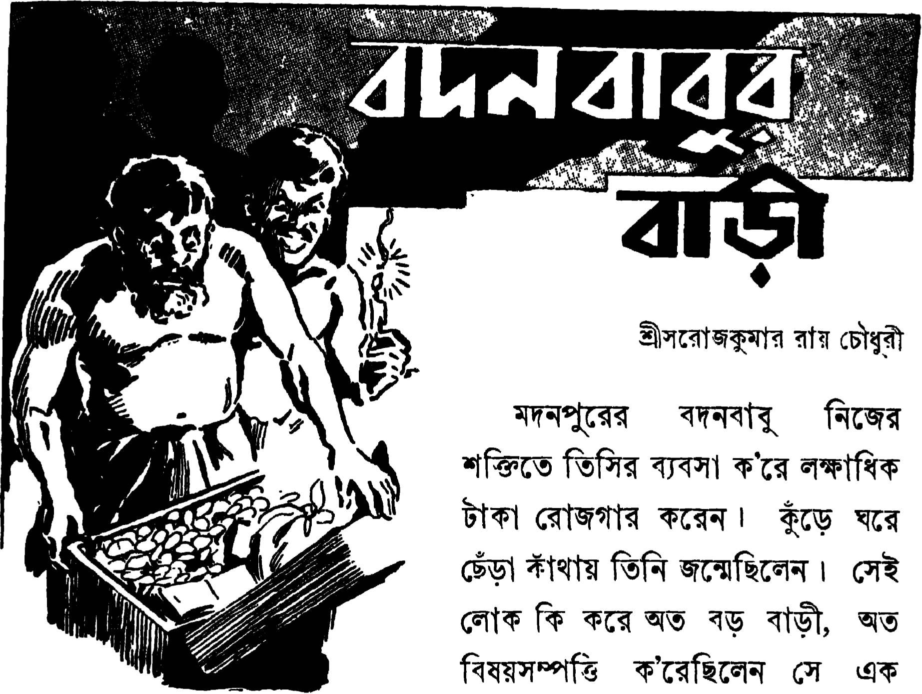
মুহূর্ত্ত মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার!

সেই ভদ্রবেশী আর সাধারণ মানুষ নেই। যুগযুগান্তরের সেই কোন অশরীরী বুভুক্ষিত আত্মা, নিশুতি রাতের স্তব্ধতা ভেঙে চীৎকার করে উঠল। আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল গাঢ় কালো এক করাল মূর্ত্তি—তার দেহ নেই অথচ দেহাকারে এক জমাট অন্ধকারের স্তূপ! একি! পৃথিবীতে কি এতটুকু আলো নেই—এই ত' পাশেই গ্যাস্-পোস্ট ছিল কোথায় গেল! আমার সারা দেহে রক্তস্রোত যেন বাণের জলের মত কল্ কল্ করে ঘুরে ফিরে চলেছে বেশ অনুভব কচ্ছি।

সে মূর্ত্তি চীৎকার করে মহাশূন্যে লাফিয়ে উঠে মনে হল যেন সশব্দে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাত সাগরের জল যেন জলস্তম্ভের মতো উঁচু হয়ে উঠ্‌ল।

*　　*　　*　　*

তারপর কি হল জানিনে—আমি এখন হাসপাতালে।



বদনবাবুর বাড়ী

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

মদনপুরের বদনবাবু নিজের শক্তিতে তিসির ব্যবসা ক'রে লক্ষাধিক টাকা রোজগার করেন। কুঁড়ে ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় তিনি জন্মেছিলেন। সেই লোক কি করে অত বড় বাড়ী, অত বিষয়সম্পত্তি ক'রেছিলেন সে এক আশ্চর্য্যের ব্যাপার। বিশেষ ক'রে তাঁর তিসির গোলা-বাড়ী দেখলে তাক লেগে যায়। একটা প্রকাণ্ড বড় খামারে সার সার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলা। এক একটা গোলায় আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকার তিসি। এমনি গোলা পঞ্চাশটা।

ছেলে বেলায় বদনবাবু লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি। কোনো রকমে ভাঙা ভাঙা মোটা মোটা অক্ষরে হিসাবের খাতা লিখতে পারতেন। তাও বড় একটা লিখতে হ'ত না। এজন্যে একজন মুহুরী ছিল। বদনবাবু লোহার সিন্দুকের পাশে একটা ফরাসের উপর ব'সে খবরদারী করতেন। এককালে নিজে মাথায় ক'রে তিসি বয়ে এনেছেন। এখন আর তা করতে হয় না। খালি একটা বেনিয়ান গায়ে দিয়ে আর একখানা মোটা ক্যাঁট কেঁটে আট হাত

বদনবাবুর বাড়ী

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

ধুতি প'রে সব দেখাশুনা করেন। তাঁর একমাত্র ছেলে মহেন্দ্র বড় হয়েছে। সেই সব করে।

কিন্তু মহেন্দ্রের উপর বদনবাবুর মনে মনে আস্থা নেই। তার চোখে সোনার চশমা। মাথায় টেরী। গায়ে সিল্‌কের পাঞ্জাবী। হাতে সোণার রিষ্ট্‌ওয়াচ। পরণে সত্ত-ধোয়া দেশী ধুতি। গায়ে কোথায় তিসির ধূলো লাগবে এই ভয়েই সর্ব্বদা সশঙ্কিত। আগে যেখানে দোকানে পনেরো জন লোক খাটত, সেখানে সে আরও দশজন বাড়িয়েছে। কাজেই শুধু ব'সে ব'সে হুকুম করলেই তার কাজ শেষ হয়। বদনবাবু ছেলের এই বাবুগিরি মনে মনে অপছন্দ করেন। কিন্তু পুত্র-স্নেহে মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারেন না। কেবল এতদিনের এত কষ্টের গড়া ব্যবসা দুদিনে নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়ে যতদিন পারেন প্রত্যহ একবার ঠুক ঠুক করে আড়তে গিয়ে বসেন।

কিন্তু তাও বেশী দিন পারলেন না। একদিনের ওলাওঠা জ্বরে বদনবাবুর স্ত্রী মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বদনবাবু কেমন যেন হয়ে গেলেন। কান্নাকাটি করলেন না। হৈ হৈ করলেন না! কেবল কথা বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। তার পরে শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেলে হাজার খানেক টাকা নিয়ে চলে গেলেন কাশী। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেন কিছুকাল। তারপরে আবার এসে কাশীতে বসলেন। সেখানে একটা বাড়ী কিনে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। দেশে ফিরলেন প্রায় পাঁচ বৎসর পরে।

তখন আর সে বদনবাবু নন।

মাথায় বড় বড় চুল। শাদা শাদা দাড়ি নাভিতে পর্য্যন্ত ঝুলছে। পরণে রক্তাম্বর। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক। মুখে সর্ব্বদা কালী কালী শব্দ। বৈষ্ণব বদনবাবু শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। সেই বিনীত শান্ত প্রকৃতি আর নেই।

কারণ বারি-পানে চোখ সর্ব্বদা রক্তবর্ণ। কণ্ঠস্বরে একটা ভীষণতা এসেছে। এখন লোকে তাঁর কাছে যেতেই ভয় করে। বদনবাবু তেতালার ঘরে নিরিবিলি থাকেন, আর ধ্যান-ধারণা করেন। পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনী কারও সঙ্গে বড় একটা কথা বলেন না।

এমনি ক'রে দিন পনেরো কাটানর পর একদিন মহেন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন্। এ ক'দিন তার সঙ্গে একটা কথাও হয়নি। মহেন্দ্রও বাবার রক্তচক্ষু আর রুক্ষ মেজাজ দেখে কাছে আসতে সাহস করেনি। ভয়ে ভয়ে এসে প্রণাম ক'রে মেঝেতে এক পাশে চুপ ক'রে বসল।

একটা বাঘের চামড়ার উপর আসন ক'রে বদনবাবু ব'সে ছিলেন। মহেন্দ্রকে দেখে একটু ন'ড়ে বসতেই রুদ্রাক্ষের মালা খট্-খট্ শব্দ ক'রে উঠল।

একটুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে পুত্রের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ ক'রে বদনবাবু বললেন, পরশু গুরুদেব আসবেন।

মহেন্দ্র ভয়ে ভয়ে শুধু বললে, ও।

—পাশের ঘরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

—যে আজ্ঞে।

—আর পরশু সন্ধ্যেয় দশ হাজার টাকা চাই।

—বেশ।

—পূজোর দালানে কিছু মেরামত করতে হবে কি?

এবারে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাবার দিকে চাইলে। অস্ফুট কণ্ঠে বললে, না।

—মালাকারকে ব'লে দাও আগামী অমাবস্যায় ছিন্নমস্তার পূজো হবে। প্রতিমা গড়ে দিতে হবে।

শুনে মহেন্দ্র মুখ হাঁ ক'রে চেয়ে রইল। ছিন্নমস্তার পূজো! সে তো ভীষণ

তান্ত্রিক পূজো। গৃহস্থ কখনও সে পূজো করতে সাহস করে না। তাতে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।

মহেন্দ্র অস্পষ্ট স্বরে শুধু একবার বললে, ছিন্নমস্তার···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছিন্নমস্তার। তুমি এখন যাও। ভয় নেই, গুরুদেব নিজে আসবেন। পূজোও তিনিই করবেন।

ব'লে বোধ হয় সাধনার জন্যে চোখ বন্ধ করলেন।

মহেন্দ্র আর কিছু বলতে সাহস না ক'রে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

গুরুদেব নিজে অবশ্য এসেছিলেন। পূজোও তিনিই ক'রেছিলেন। অমাবস্যার অন্ধকার নিশুতি রাত্রে সে এক ভীষণ ব্যাপার। কিন্তু ভয় নেই এ ভরসা বেশী দিন রইল না। গুরুদেব আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন পূজো নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়েছে। মা হাসিমুখে পূজো গ্রহণ ক'রেছেন। কিন্তু তিনি বিদায় নেবার দিন পনেরো পরে মহেন্দ্রের বড় ছেলেটি বসন্তে আক্রান্ত হ'ল এবং তিন দিন অশেষ কষ্ট ভোগের পর মারা গেল। তারপরে এক সঙ্গে তার স্ত্রী আর মেজ ছেলে পড়ল। বহু চেষ্টা ক'রেও তাদের বাঁচান গেল না। তারপরে মহেন্দ্র নিজে আর তার শেষ সন্তান কোলের মেয়েটি ওই একই রোগে মারা গেল।

বদন বাবু নিঃশব্দে শান্ত ধীরভাবে তাঁর বংশের শেষ প্রদীপটিও নিবে যেতে দেখলেন। নিজে সকলের পিছু পিছু শ্মশানে গেলেন, শ্মশান থেকে ফিরে এলেন। লোকে তাঁর মুখ দেখে ভাবলে, মানুষ এমন পাথরও হয়!

বাড়ীর চাকর-বাকর সব ইতিপূর্ব্বেই বেগতিক দেখে পালিয়েছিল। কেবল একটি বুড়ো চাকর তখনও পর্য্যন্ত মমতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, সেই ছিল। বদন বাবু বাড়ীতে আলো জ্বালতে দিলেন না। চাকরটিকে তাঁর ঘরে ডাকলেন।

অন্ধকারে তার হাতে কি কতকগুলো কাগজ দিয়ে বললেন, তোমাকে যা দিলাম তাতে দু'পুরুষ ব'সে খেতে পারবে। এবারে তোমার ছুটি।

বুড়ো চাকর হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেললে। কিন্তু বদনবাবু গম্ভীর কণ্ঠে তাকে এমন এক ধমক দিলেন যে, সে পালাতে পথ পেল না। যাবার সময় সে বদনবাবুর লোহার সিন্ধুক বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল।

সে ভাবলে, বাবুর মন খারাপ। হয়তো আবার কাশী কিম্বা অন্য কোনো তীর্থে চলে যাবেন। তাই তাকে বিদায় দিলেন। হয়তো সেই রাত্রেই যাবেন, কিম্বা পরের দিন সকালে।

[illegible]ই ভেবে পরের দিন সকালে বড়বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেল। [illegible]খে সদর দরজা বাইরে থেকে চাবি বন্ধ নয়। সে গত রাত্রে আসবার সময় [illegible]ক'রে ভেজিয়ে রেখে এসেছিল তেমনি আছে। কেবল বোধহয় ঝড়ে আর একটু [illegible]াক হয়ে গেছে। তার ভরসা হ'ল, বদনবাবু এখনও তাহ'লে যান নি। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে দেখে অন্দরের দরজাও ভেজান। বুড়ো সটান তেতালার ঘরে গিয়ে উঠল। আস্তে ক'রে দরজায় একটু ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে যেয়ে তার বুকের স্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম!

বদনবাবু কড়িকাঠে ঝুলছেন!

তাঁর চোখ কপালে উঠেছে, জিভ বেরিয়ে এসেছে! তিনি রাত্রেই আত্মহত্যা করেছেন!

বুড়োর চীৎকারে পাড়ার লোক জড় হ'ল। পাশেই থানা, পুলিশও এল। তারা লাস নামিয়ে নিয়ে থানায় চ'লে গেল। এবং বাড়ীর মালিক কে, স্থির না হওয়ায় বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর এবং আড়ত তালা বন্ধ ক'রে শিলমোহর ক'রে গেল। পাড়ার লোকে বলাবলি করতে লাগল, এ ছিন্নমস্তার পূজোর ফল। মায়ের পূজোয় নিশ্চয় কোনো বিঘ্ন ঘটেছে। বাবাঃ! ছিন্নমস্তার পূজো চারটিখানি

কথা নয়। একটুখানি ত্রুটি ঘটেছে কি বংশলোপ। আমরা তখনই ব'লেছিলাম…

বাড়ী ওই রকমই রইল। বদনবাবুর উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে লম্বা মামলা বেধে গেল। সে মামলা একবার নীচের কোর্ট থেকে জজ কোর্ট, সেখান থেকে হাই-কোর্ট যায়, আবার সেখান থেকে নীচের কোর্টে ফিরে আসে। তাঁতের মাকুর মতো এমনিধারা ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

ইত্যবসরে একটা কাণ্ড ঘটল :

বাড়ীটার উপর পাড়ার গুটি-কয়েক বিখ্যাত চোরের চোখ পড়ল। বদন-বাবুর ধনশালিতা কারও অবিদিত নেই। তাঁর টাকার প্রত্যেকটি পয়সা লোহার সিন্ধুকে থাকত। মফঃস্বলে ব্যাঙ্কে টাকা রাখার প্রথা নেই। [illegible] থেকে হাজার কয়েক টাকা বুড়ো চাকরটা পেয়ে গেছে। বাকীটা ওরা পেলে আর ভবিষ্যতের ভাবনা কয়েক পুরুষের মধ্যে ভাবতে হবে না।

এই না ভেবে একদিন রাত্রে ছ'জন চোর বদনবাবুর বাড়ী হানা দিলে। দু'জন রইল বাইরে ঘাঁটি আগলে, আর চারজন পাঁচীল টপ্‌কে ভেতরে গেল। ভয় তো কিছুই নেই। ভেতরে জনমানবের চিহ্ন নেই। যে ঘরে লোহার সিন্ধুক সে ঘর চোরেদের বিশেষ জানা। কিন্তু সে ঘরে ঢোকা যায় কি ক'রে ? পুলিশ এসে সব ঘর তালা বন্ধ ক'রে শিলমোহর ক'রে দিয়ে গেছে। কি উপায় করা যায় এই ভেবে একজন অন্ধকারে দরজায় হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ, কি আশ্চর্য্য, দরজা গেল খুলে। ঢোক, ঢোক, দু'জন তো তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। আর দু'জন ছুটল পাশের ঘরে, যে ঘরে মহেন্দ্র থাকত। সেই ঘরে আছে মহেন্দ্রের স্ত্রীর রাশি রাশি গহনা। সে ঘরেও ঠিক তাই হ'ল। হাত দেওয়ামাত্র দ্বার খুলে গেল। দু'জন ঢুকল তার মধ্যে। ঘরের মধ্যে ঢুকে ওরা

পিওগমিকে

মোমবাতি জ্বাললে। পাছে কেউ দেখতে পায় ব'লে এতক্ষণে আলো জ্বালতে সাহস হ'ল। বন্ধ ঘরে কোনো ভয়ই নেই।

লোহার সিন্ধুকে হাত দিতে সিন্ধুক খুলে গেল। ও ঘরেও তাই। এ ঘরে লোহার সিন্ধুকে টাকা, পয়সা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি, পয়সা, আধলা থরে থরে সাজান। একদিকে থাকে থাকে নোট। ওঘরে রাশি রাশি সোনার আর জড়োয়া গহনা যেন অনেকদিন পরে বাতির আলো দেখে হেসে উঠল। চোরেদের সে দৃশ্য দেখে আর চোখের পলক পড়ে না। তারা দু'হাতে যা ওঠে, তোলে আর আঁচল বোঝাই করে। ভারে আঁচল ছিঁড়ে পড়ে আর কি! অনেকক্ষণ পরে তারা কাজ সেরে যখন বার হ'তে যাবে, দেখে দরজা বন্ধ!

দরজা বন্ধ! আশ্চর্য্য!

ওরা এদিকে টানে, ওদিকে টানে, প্রাণপণে টানে, কিছুতেই কিছু না। দরজা কিছুতেই খোলে না।···

এদিকে বাইরে যারা ঘাঁটি আগলে আছে তারা অপেক্ষা করছে তো করছেই। সঙ্গীরা কিছুতে আর ফেরে না। একটা বাজে, দুটো বাজে, তিনটে বাজে··· পাখীরা এক আধটা ঘুম ভেঙ্গে হঠাৎ ডেকে ওঠে···শেয়াল শেষ প্রহরের ডাক ডেকে গেল···কিন্তু সঙ্গীরা আর ফেরে না। অথচ ধীরে ধীরে পূবদিকে আলো জাগছে, আর অপেক্ষা করাও চলে না। ওদের কেমন ভয় হ'ল। সঙ্গীর মমতার চেয়ে প্রাণের মমতা বেশী। ওরা আরও একটু অপেক্ষা ক'রে অবশেষে চুপি চুপি স'রে পড়ল। ওদের বরাতে যা হবার তাই হোক।

কিন্তু সঙ্গীরা আর ফিরলই না।

চোরের পরিজনের ফুক্‌রে কাঁদার শক্তি নেই। দিন-কয়েক তারা চেপে রইল। রোজ ভাবে আজ ফিরবে, আজ ফিরবে। অবশেষে ব্যাপারটা আর

বেশীদিন গোপন রইল না। পাঁচ কাণ হ'তে হ'তে পুলিশের কাণে পৌঁছল। পুলিশ এসে পাঁচীল টপ্‌কে বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখে যেমনকার তালা, শিলমোহর তেমনি আছে, বাইরের চোর ঘরে ঢুকবে কি ক'রে? তারা বিশ্বাসই করল না। তবে পুলিশ সাহেবকে এই গুজবের কথাটা জানাল।

পুলিশ সাহেব দিন-কয়েক পরে চাবি নিয়ে সদলবলে এসে উপস্থিত হ'লেন। বিশ্বাস তাঁরও হ'ল না। তবু তালা খুলে দেখেন, ঠিক। এঘরে দুটো, ওঘরে দুটো কঙ্কাল প'ড়ে রয়েছে বটে। তিনি তো অবাক। কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। ব্যাপারটা হয় তো ভৌতিক।

ভৌতিক ব্যাপারে পুলিশ সাহেবের আগ্রহ অপরিসীম। তিনি স্থির করলেন, কয়েকটা রাত্রি এখানে কাটিয়ে ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত দেখে যেতে হচ্ছে। সন্ধ্যের পরে বাড়ীর বাইরে, ভিতরে, প্রত্যেক গলিতে গলিতে সশস্ত্র সিপাই পাহারা রাখলেন। আর নিজে দুটো গুলিভরা রিভলবার নিয়ে ব'সে রইলেন—লোহার সিন্দুকের ঘরে। সঙ্গে রইল বাঘা—বাঘা দুটো বিলিতি কুকুর।

বারোটা বাজল।

কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ নেই। বাইরে ফুট্‌ফুট্ করছে চাঁদের আলো। গাছের নীচে ঝোপে ঝোপে অন্ধকার জমে জমে আছে। কোথাও পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে প'ড়ে যেন মাটিতে আল্‌পনা কাটছে। হাওয়ায় পাতা নড়ছে শির্ শির্ ক'রে। চাঁদিনী রাত্রি, তবু বাইরেটা থম থম করছে। ভিতরে একটা দেওয়ালগিরি জ্বলছে।

সাড়ে বারোটা···একটা···

হঠাৎ হু হু ক'রে একটা দমকা হাওয়া এসে দপ্ ক'রে দেওয়ালগিরি নিবিয়ে দিলে। সে তো হাওয়া নয়, কে যেন হা হা ক'রে সেই আধ-অন্ধকারে হেসে উঠল।

বদনবাবুর বাড়ী

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

সাহেব দুটো রিভলবার দু'হাতে ধ'রে সতর্ক হয়ে ব'সে রইলেন।

আলো জ্বালার প্রয়োজন হ'ল না। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘর আলো করে দিলে। তখনও মৃদু মৃদু বাতাস বইছে, যেন বাইরে কার কাপড়ের খস্‌খসানি।

আর কিছু নয়। আরও আধ ঘণ্টা এমনি কাটল।

হঠাৎ ঘরের যে প্রান্তে সাহেব রিভলবার নিয়ে ব'সে ছিল, তার অপর প্রান্তে বারান্দার দিকের জানালাটা খড় খড় ক'রে ন'ড়ে উঠল। দুটো কুকুরই ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটি শুভ্র বসনাবৃত মূর্ত্তি ওই জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। সাহেব গুলি ছুঁড়লেন, কুকুর দুটো তেড়ে গেল। মূর্ত্তি অন্য জানালার ফাঁক দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে বেরিয়ে গেল, একটা কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে তার পিছুপিছু জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। অথচ গরাদের ফাঁক তিন আঙুলের বেশী নয়। তার মধ্যে দিয়ে অত বড় একটা কুকুর যে কি ক'রে বিনায়াসে গ'লে যেতে পারে তা মানুষের কল্পনার অতীত।

সাহেবের কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। কণ্ঠ শুষ্ক। সাহেব বোতল থেকে মদ ঢেলে এক নিশ্বাসে ঢক্ ঢক্ ক'রে সবটা খেয়ে ফেললেন। আর তাঁর সঙ্গের কুকুরটির আর্ত্তনাদে ঘর যেন ফেটে যাবার উপক্রম। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, এত কাণ্ডেও বাইরের সশস্ত্র সিপাহীদের কেউ এসে জুটল না। তাদের যেন এ-শব্দ কানে গিয়ে পৌছয়ই-নি।

সাহেব এবার স্থির হয়ে বসলেন। এবার যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। দেওয়ালগিরিটাও জ্বাললেন। সিপাহীদের কাকেও ইচ্ছা ক'রেই ডাকলেন না। পাছে তারা ভাবে সাহেব ভয় পেয়েছেন।

কিন্তু আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আধ ঘণ্টার উপর কেটে

গেল। শিকারী যেমন শিকারের জন্যে ছট্‌ফট্ করে, সাহেবও তেমনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অবশেষে হ'তাশ হয়ে রিভলবার নামিয়ে বোতল বের ক'রে আর একটু মদ ঢেলে খেতে যাবেন—এমন সময় জানালাটা আবার খড় খড় ক'রে উঠল।

সাহেব তাড়াতাড়ি বোতল নামিয়ে রিভলবার তুলে নিলেন। হঠাৎ কে যেন হুড়মুড় ক'রে আলোর উপর প'ড়ে আলো নিবিয়ে দিলে। কুকুরটা চীৎকার ক'রে যেন কাকে ধরতে জানলার দিকে ছুটে গেল। সাহেব উপরি উপরি তিনবার গুলি ছুঁড়লেন। ফল কি যে হ'ল কিছু বোঝা গেল না। কেবল অতি দূর থেকে যেন সাহেবের প্রিয় কুকুরটির ক্ষীণ আর্ত্তনাদ কানে ভেসে এল।

ধোঁয়ার অন্ধকার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। জানালার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। সাহেব বিস্ফারিত নেত্রে দেখলে ঘরে জন-প্রাণী নেই,—মূর্ত্তি না, কুকুর না, কেউ না। শুধু ঘরের দেওয়ালগুলো থর থর কাঁপছে।

তারপরে মেঝের উপরকার চাঁদের আলো ক্ষীণতর হ'তে হ'তে ধীরে ধীরে মিলিয়ে···কি যেন একখানা কালো যবনিকা চাঁদকে দিলে ঢেকে···চরাচর ব্যাপ্ত ক'রে একটা জমাট অন্ধকার সাহেবের চারদিকে ঢেউএর মতো দুলতে দুলতে ফিরে এল···

তারপরে আর কিছু মনে নেই···

পরদিন সকালে সিপাহীরা এসে দেখলে, সাহেব মেঝের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর দুই পাশে দুটো রিভলবার প'ড়ে আছে। কুকুর দুটোই নেই। আর দেওয়ালের এখানে ওখানে গুলির দাগ। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, ওরা বাইরে থেকে গুলির আওয়াজ কিম্বা অন্য কোনো শব্দ শুনতে পায়নি।



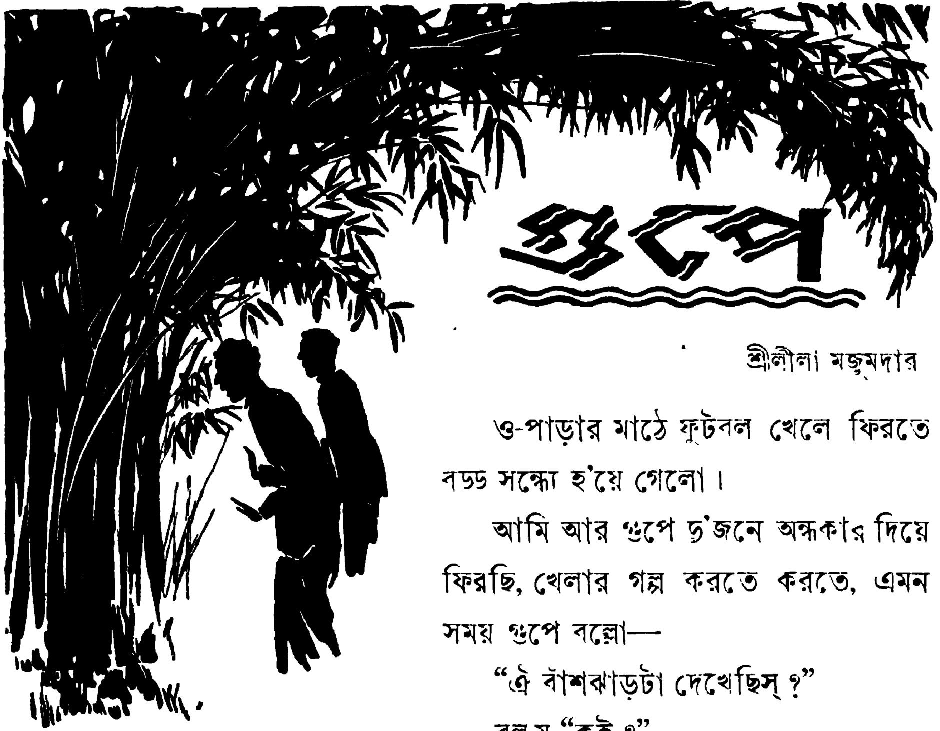
কিন্তু গুলি যে ছোঁড়া হয়েছে সে বিষয়েও কোনো ভুল নেই। দেওয়ালে গুলির চিহ্ন আছে, রিভলবারেও গুলি কম। আর কুকুর দুটোই বা গেল কোথায়?

বহুকষ্টে তারা সাহেবের চৈতন্য সম্পাদন করলে। সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও জনপ্রাণীর চিহ্ন মিলল না। কেবল জানালার নীচে যে বাগান সেই বাগানে কুকুর দুটো ম'রে পড়ে আছে। মানুষ যেমন ক'রে গামছা নিংড়োয় তেমনি ক'রে তাদের যেন কে নিংড়ে দিয়েছে। তাতে আর রক্ত বলতে কিছু নেই।

এই কাণ্ড ঘটেছিল আজ থেকে অনেককাল আগে। এ কাণ্ডের কর্ত্তা কে, কি ক'রেই বা ঘটল তার অর্থ আজ পর্য্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। লোকে ভৌতিক ব'লে এক কথায় এর মীমাংসা ক'রে দিয়েছে। কিন্তু যারা ভূতে বিশ্বাস করে না, তারা কি ক'রে এ সমস্যার সমাধান করবে জানি না।

বদনবাবুর বাড়ী আজ শ্রীহীন, ভগ্নদশায়। তার দেওয়াল ভেঙে প'ড়েছে। কড়ি-কাঠ খ'সে ঝুলছে। স্থানে স্থানে ইটের স্তূপ হয়েছে। মাঝে মাঝে আগাছার জঙ্গল। যারা এই বাড়ীর উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে মামলা করছিল, সাহেবের কাণ্ডের পর তারা আর কেউ এ সম্পত্তির মালিক হ'তে রাজি হয়নি। এ বাড়ী এখন বেওয়ারিস অবস্থায় প'ড়ে। সন্ধ্যের পর আর কেউ বাড়ীর ধার দিয়ে যায় না। বাড়ীর একখানি ইট কেউ ছোঁয় না। এখন অবশ্য আর কিছু দেখা যায় না বটে, কিন্তু কেউ কেউ বলেন, অমাবস্যার নিশুতি রাত্রে বাড়ীর চারদিকে কে যেন কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। কে কাঁদে কেউ জানে না।





গুপে

শ্রীলীলা মজুমদার

ও-পাড়ার মাঠে ফুটবল খেলে ফিরতে বড্ড সন্ধ্যে হ'য়ে গেলো।

আমি আর গুপে দু'জনে অন্ধকার দিয়ে ফিরছি, খেলার গল্প করতে করতে, এমন সময় গুপে বল্লো—

"ঐ বাঁশঝাড়টা দেখেছিস্?"

বল্লুম "কই?"

সে বল্লে, "ঐ যে হোথ   মনে হয় ওখানে কবে কি একটা লোমহর্ষক ব্যাপার ঘটেছিলো, না?"

গুপের দিকে তাকালুম, এমন সময় এমন কথা আশা করিনি।

আমি বল্লুম "গুপে, তুই কিছু খেয়েছিস্ নাকি?"

গুপে বল্লো, "চোখ থাক্‌লেই দেখা যায়, কাণ থাক্‌লেই শোনা যায়।"

আমি বল্লুম, "নিশ্চয়ই। মাথা না থাক্‌লে মাথাব্যথা হ'বে কি করে?"

গুপে বল্লো, "তুই ঠিক আমার কথা বুঝ্‌লি না! দেখ্‌বি চল্ আমার সঙ্গে।"

বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগ্‌লো। পেঁচোর মার কথা মনে পড়ে গেলো। সেও সন্ধ্যেবেলা মাছ কিনে ফিরছে, বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে আস্‌ছে, এমন সময়

কাণের কাছে শুন্‌তে পেলো, পেঁ-চোঁর মাঁ মাঁছ দেঁ!" পেঁচোর মা হন্‌ হনিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু সেও সঙ্গে চল্লো—"দেঁ বঁলছিঁ, মাঁছ দেঁ!"

গুপে ক্লাশের লাষ্ট বেঞ্চে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোম-হর্ষণ সিরীজের বিকট বিকট বই পড়তো। আমায় একটা দিয়েছিলো, তার নাম "তিব্বতী-গুহার ভয়ঙ্কর" কি ঐ ধরণের একটা কিছু। আমায় বলেছিলো "দেখ, রাত্রে যখন সবাই ঘুমুবে, একা ঘরে পিদীম জ্বেলে পড়বি। দেয়ালে পিদীমের ছায়া নড়বে, ভারী গা শিরশির করবে, খুব মজা লাগ্‌বে।" আমি কিন্তু একবার চেষ্টা করেই টের পেয়েছিলুম ও-রকম মজা আমার ধাতে সইবে না।

আজ আবার এই।

গুপে বল্লে, "কি ভাবছিস্? চল্‌ দেখি গিয়ে। বাবার কে এক বন্ধু একবার দিল্লীতে একটা সেকেলে পুরণো বাড়ীতে একটা শুক্‌নো মরা বুড়ী আর এক ঘড়া সোণা পেয়েছিলেন। দেখেই আসি না। হয় তো গুপ্তধন পোঁতা আছে। যক্ষে পাহারা দিচ্ছে।"

তারার আলোয় দেখ্‌লুম্, তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে। তাই দেখেই আমার ভয় করতে লাগ্‌লো,—আবার বাঁশঝাড়ের যক্ষ!

কিন্তু কি করি, গুপেটা আঠালির মতন লেগে রইলো। অগত্যা দু'জনে অন্ধকার ঘন ঝোপের মাঝ দিয়ে আস্তে আস্তে চল্লুম। গুপে আবার কি একটা মস্তকহীন খুনীর গল্প সুরু করলো। কবে নাকি কোন পুরণো ডাকবাংলোয় কেউ রাত কাটাতে চাইতো না। লোকে বল্‌তো, যারাই থেকেছে তারাই রাতারাতি মরে গেছে। কেউ কিছু ধরতে পারে না। বাবুর্চি বলে "হাম তো মুরগী পাকাকে আউর পরটা সেঁককে সাবকো খিলাকে ঐ হামারা কোঠি চলাগিয়া। রাতমে কভি ইধার আতা নেই, বহুৎ গা ছম্‌ছম্‌ করতা আউর যো সব কাণ্ড হোতা যো মালুম হোতা আলবৎ শয়তান আতা হ্যায়।"

সন্দেশ পত্রিকা

গুপে

শ্রীলীলা মজুমদার

শেষে কে এক সাহসী মস্ত এক কুকুর নিয়ে বন্দুকে গুলি ভরে বসে রইলো, কি হয় দেখ্‌বে। কোথাও কিছু নেই, ঘরদোর ঝাড়াপোঁছা পরিষ্কার। আশ্চর্য্য দেয়ালে একটা টিকটিকি কি ঘুমন্ত মাছি অবধি নেই। অনেক যখন রাত, লোকটা আর জেগে থাক্‌তে পারছে না, দেশলাই বের করেছে সিগারেট খাবে, কুকুরটাও ঝিমোচ্ছে, এমন সময় পাশের ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও কমে এলো—

গল্প বল্‌তে বল্‌তে আমাদের চারিদিকের আলোও কমে এসেছিলো, আর গুপের স্বর নীচু হ'তে হ'তে একেবারে ফিস্‌ফিসে দাঁড়িয়েছিলো। আর তার চোখ দুটো যেন আমার কপাল ছ্যাঁদা করে ভেতরের মগজগুলোকে ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধিয়ে দিচ্ছিলো।

আমার গলা শুকিয়ে এলো, কাণ বোঁ বোঁ করতে লাগ্‌লো। নিশ্চয়ই মূর্চ্ছা যেতাম, তারপর সেখান থেকে টেনে আনোরে, কিন্তু হঠাৎ চেয়ে দেখি সামনেই বাঁশ্‌ঝাড়। দেখে থম্‌কে দাঁড়ালুম, অন্য একটা ভয় এসে কাঁধে চাপ্‌ল। বাঁশঝাড়ের মধ্যে স্পষ্ট শুন্‌লাম, খপ্‌খপ্‌ শব্দ—যেন বুড়ো সাপ নিবিষ্টমনে একটার পর একটা কোলাব্যাং গিলে যাচ্ছে।

গুপের দিকে তাকালুম, জায়গাটার থম্‌থমে ভাব সেও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে। তার মুখটা অন্ধকারে সাদা মড়ার মতন দেখাচ্ছিলো, আর চোখ দুটো বেড়ালের মতন জ্বলছিল। জায়গাটাতে হাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছিলো, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকও ভালো করে শোনা যাচ্ছিলো না।

আমার মনে হতে লাগলো—"আর কখনও কি বাড়ী যাব না? পিসিমা আজ মাল্‌পো ভেজেছেন। সেকি দাদা একা খাবে? মাষ্টার মশাইও এতক্ষণে এসে বসে রয়েছেন, হয়তো শক্ত শক্ত অঙ্ক ভেবে রাখছেন। আঃ, গুপেটা কেন জন্মেছিলো?"

গুপে

শ্রীলীলা মজুমদার

গুপে আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে বল্লো "চল্ কাছে যাই।"

বাঁশগাছগুলো ঘেঁষাঘেঁষি করে গোল হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো, মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো, তারার আলোয় মধ্যিখানটা একেবারে ফাঁকা। আশে-পাশে ঘন বিছুটি পাতা, সে জায়গাটা শুক্‌নো ঘাসে ঢাকা। থেকে থেকে দু একটা বুনো কচুগাছ, বিষম ভূতুড়ে গাছ।

তারপর চোখ তুলে আর যা দেখলাম, বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলো। মনে হোলো ছেলেবেলায় একবার মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে দেখি ঘরের আলো নিবে গেছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার আর তার মধ্যে খস্‌খস্ শব্দ, যেন কিসে বসে বসে শুক্‌নো কিসের ছাল ছাড়াচ্ছে! এতো কথা মনে করবার তখন সময় ছিলো না, কারণ আবার ভালো করে দেখলাম দুটো সাদা জিনিষ, মানুষের মতন, কিন্তু মানুষ তারা হ'তেই পারে না। জায়গাটা যে শাঁকচুন্নীর আস্তানা সে বিষয় কোন সন্দেহই থাক্‌তে পারে না। স্পষ্ট একটা ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধও নাকে এলো। অন্ধকারে দেখলাম দুটো খুব লম্বা আর খুব রোগা কি, আপাদমস্তক সাদা কাপড় জড়ানো, মাথায় অবধি ঘোমটা দেওয়া, নড়চে চড়ছে। দেখলুম তাদের মধ্যে একজন ছোট্ট কোদাল দিয়ে নরম মাটি অতি সাবধানে খুঁড়ছে, অন্যজন কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে পড়লো জ্যাঠামশাই একবার কলকাতায় পুরণো চক্-মেলানো বাড়ীতে ছিলেন, সেখানে একদিন দুপুর রাত্রে দিদিরা ভূত দেখছিলো—কল-তলায় গোছা গোছা বাসন মাজছে। তারপর থেকেই তো ছোড়দির ফিটের রোগ। কিছুই না, ভূতের কু-দৃষ্টি।

আবার তাকিয়ে দেখি খোঁড়া শেষ হয়েছে, গভীর একটি গর্ত মনে হলো। এতক্ষণ অত্যন্ত অস্বোয়াস্তি বোধ হচ্ছিলো। ঘাড়ে মশা কামড়াচ্ছিলো, চুলের মধ্যে কাঠ-পিঁপড়ে হাঁটছিলো, আর পা বেয়ে কি একটা প্রাণপণে উঠতে চেষ্টা করছিলো। গুপের পাশে তো অনেকক্ষণ থেকে একটা গো-সাপের বাচ্চা

ওৎ পেতে বসেছিলো। গুপে দেখছিলো না, আমি কিছু বল্‌ছিলাম্ না। ওকে কামড়াক্, আমার ভালোই লাগবে।

সেই সাদা দু'টো এবার উঠে দাঁড়িয়ে কি একটা ভারী জিনিষ অন্ধকার থেকে টেনে বের করলো। গর্ত্তের পাশে একবার নামালো, মনে হোলো ছালায় বাঁধা —মাগো কি!

একটা নতুন কথা মনে ক'রে ভয়ে কাদা হয়ে গেলাম এরা হয়তো ভূত নয়, খুনী-ডাকাত, কাকে যেন মেরে ছালায় বেঁধে গভীর অন্ধকারে বাঁশঝাড়ে নিরিবিলি পুঁতে বাড়ী চলে যাবে। কেউ টের পাবে না।

ভাবলাম নিঃশ্বাস অবধি বন্ধ করে থাকি। তারা এদিকে কালো জিনিষটাকে পুঁতে এ ওর দিকে তাকিয়ে বিশ্রী ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাস্‌তে লাগলো, কালো মুখে সাদা লম্বা লম্বা দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্ করে উঠ্‌লো। তারপর তারা অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেলো।

সে সন্ধ্যের কথা কাউকে বল্‌তে সাহস হয়নি, বিশেষতঃ গুপে যখন বাড়ীর দরজার কাছে এসে আস্তে আস্তে বল্লো "কাউকে বলিস্ না, বুঝ্‌লি কাল আবার যাবো, এর মধ্যে নিশ্চয় একটা সাংঘাতিক কোন ব্যাপার জড়িত আছে।"

আমি কথা না ব'লে মাথা নাড়লাম। বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না জ্যান্ত বাড়ী ফিরেছি!

পরদিন মনে করলাম আজ কিছুতেই গুপের সঙ্গে যাবো না। এতো ভারি আহ্লাদ! উনি সখ্ করে আগাড়ে বাগাড়ে ভূত তাড়িয়ে বেড়াবেন আর আমায় ওঁর সঙ্গে ঘুরে মরতে হ'বে। কেনরে বাপু! শাঁকচুন্নী যদি অতই ভালো লাগে—একাই যানা। আমায় কেন?

অনেক ক'রে মন শক্ত ক'রে রাখলাম, আজ কোনোমতেই যাবো না। এমন কি মেজদাদামশাইয়ের বাড়ী চণ্ডীপাঠ শুন্‌তে যাবো, তবু বাঁশঝাড়ে যাবো না।

গুপে

শ্রীলীলা মজুমদার

সারাদিন গুপের ত্রিসীমানায় গেলুম না। ক্লাশে ফার্স্ট বেঞ্চে বস্‌লুম। টিফিনের সময় পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে ব্যাকরণ বুঝ্‌তে গেলুম্। এমনি করে কোনোমতে দিনটা কাট্‌লো। কিন্তু বাড়ী ফেরার পথে কে যেন পেছন থেকে এসে কাঁধে হাত দিলো! আঁৎকে উঠে ফিরে দেখি গুপে! সে বল্লে "মনে থাকে যেন সন্ধ্যেবেলা!"



হঠাৎ বলে ফেল্‌লুম "গুপে, আমি যাবো না!"

সে একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লে—"ও বুঝেছি, ভয় পেয়েছিস্। তা তুই বাড়ী গিয়ে দিদিমার কাছে ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমীর গল্প শোন্‌গে, আমি কেলোকে নিয়ে যাবো। তোর চেয়ে ছোট হ'লেও তার খুব সাহস!"

বড় রাগ হোলো, "ওরে গুপে, সত্যিই কি আর ভয় পেয়েছি, ঝোপজঙ্গলে সাপখোপের বাসা তাই ভাবছিলুম। আচ্ছা না হয় যাওয়াই যাবে।"

গুপে বল্লো—"তাই বলো!"

গুপে

শ্রীলীলা মজুমদার

আবার চারদিক ঝাপ্সা ক'রে সন্ধ্যে এলো। মাঠ থেকে ফিরতে গুপে ইচ্ছে ক'রে দেরী করলো। সূর্য্য ডুবে গেলো, আমরাও বাঁশঝাড়ের দিকে রওনা হলুম। আজ আমি প্রাণ হাতে নিয়ে এসেছি, মারা যাবো তবু শব্দটি করবো না! বাঁশঝাড়ের কাছে এসেই গা কেমন করতে লাগ্লো। সত্যিই জায়গাটাতে ভূতে আনাগোনা ক'রে। এতো ভালো ভালো জায়গা থাক্তে এই মশাওয়ালা বাঁশঝাড়ে আড্ডা গাড়বার আমি কোন কারণ ভেবে পেলাম না।

আজ তারার আলো একটু বেশী ছিলো, সেই আলোতে দেখ্তে পেলাম, তা'রা আবার এসেছে। ঠিক মানুষের মতন দেখ্তে তবে পা উল্টো কি না বুঝ্তে পারলাম না। মনে হোলো এদের উল্টো হ'য়ে গাছে ঝোলা কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

তারা এ ওর দিকে তাকিয়ে শকুনের মতন হাস্তে লাগ্লো। তারপর কোদাল বের ক'রে ঠিক সেই জায়গাটায় খুঁড়তে লাগ্লো। দম্ আট্কে আসছিলো। কে জানে কি বীভৎস ভোজের আশায় ওরা এসেছে! খুঁড়ে সেই কালো জিনিষটা টেনে তুল্ল, দেখ্লুম ছালা নয়, চিত্তির আঁকা কলসী! ভাব্লুম গুপ্তধন।

তারা কলসীর মুখ খুল্তেই আবার সেই দুর্গন্ধ! নিশ্চিৎ কিছু বিশ্রী জিনিষ আছে ওর মধ্যে! কিন্তু তারা খাবার কোন আয়োজন করলো না। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট খুদির মা'র গলায় বল্লো "হ্যাঁলা বাগ্দীবৌ, পদীপিসি ঠিকই বলেছিলো, দেখ্ না বাঁশঝাড়ে পুঁতে সুঁট্কিগুলো কেমন মজেছে!" গুপে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শিউরে উঠ্লো। বল্লো "চল্, পৃথিবীতে দেখ্ছি অ্যাড্ভেঞ্চার ব'লে কিছু নেই!" আমি তৎক্ষণাৎ বাড়ীমুখো রওনা দিলাম। গুপে বাড়ীর কাছে এসে বল্লো "কোথায় মড়া, কোথায় গুপ্তধন আর কোথায় সুঁট্কি-মাছ! আর কারু কাছে কিছু আশা করবো না।"

আমি কিন্তু ব্যাপারটাতে বড়ই খুসি হ'লাম। কিছু বল্লাম না, কেবল মনে মনে সঙ্কল্প করলাম, "খোক্কসের হাতে বরং পড়বো, তবু গুপের হাতে কখনও নয়।"

মাহুরি কুঠিতে এক রাত



শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

ট্রেণে যেতে যেতে ব্যাপারটা যতই ভেবে দেখছিলাম ততই আরো অদ্ভুত লাগছিল। বাস্তব ঘটনা অবশ্য অনেক সময়েই কাল্পনিক গল্পের চেয়ে বিস্ময়কর হয় জানি, তবু যেন এই ব্যাপারটায় বিশ্বাস করতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হচ্ছিল না।

দুদিন আগেই বিমলের সঙ্গে আমার মেসের ঘরে প্রায় একটা পর্য্যন্ত জেগে তুমুল তর্ক করেছি। শেষ পর্য্যন্ত এ বয়সের তর্কাতর্কির যা পরিণাম হয় তাও আমাদের বচসায় হয়েছে। দুজনেরই জেদ ও রাগ বেড়ে গেছে এবং পরস্পরকে যা তা বলে যুক্তির অভাব পূরণ করেছি।

আমি বলেছি, "যেমন ছাতুখোরের দেশে জঙ্গলের মাঝে থাকিস্ তেমনি জংলী বুদ্ধিও হয়েছে।"

বিমল বলেছে—"শহরের মাঝখানে ইলেকট্রিক লাইটের তলায় বসে বারফট্টাই সবাই মারতে পারে! একরাত ভেরেণ্ডির জঙ্গলের ধারে মাহুরিকুঠিতে কাটাতে পারলে বুঝতাম।"

হেসে উঠে বলেছিলাম,—"কাটাবার কি দরকার! তোর ভূত শহর আর

ইলেকট্রিক লাইটকেই বা ডরায় কেন? বেছে বেছে যত পোড়ো বাড়ি আর জঙ্গলে না থেকে সেই ত এখানে এলে পারে!"

বিমল চটে উঠে জবাব দিয়েছে,—"তার দায় পড়েছে! তোর কাছে ভূত আছে একথা প্রমাণ করার জন্যে তার ত মাথাব্যথা নেই!"

বিমলকে আরো রাগিয়ে দিয়ে বলেছি—"তার না হোক তোর ত আছে। তুই নিজে কোনদিন মাহুরি না মুহুরি কুঠিতে থেকে দেখেছিস!"

বিমল বলেছে—"এখনও রাত কাটাইনি তবে বাইরে থেকে যা দেখেছি তাই যথেষ্ট!"

আমি একথার উত্তরে এমন ভাবে বিদ্রূপের স্বরে "ওঃ!" বলেছি যে, বিমল মর্ম্মাহত হয়ে চুপ করে গেছে।

খানিক বাদে গম্ভীর মুখে শুধু বলেছে—"সাহস থাকে ত একবার সেখানে যাস্।"

আমি ব্যঙ্গ করে বলেছি—"গেলে, অন্ততঃ মুহুরিকুঠির বাইরে থাকব না।"

পরের দিন সকালে অবশ্য আমাদের এই তর্ক নিয়ে মন কষাকষির কোন চিহ্ন আর ছিল না। বিমল সকালের ট্রেণেই তার কাজের জায়গায় চলে যাবে। আমি ষ্টেশনে তাকে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। আগের রাতের তর্কের কথা দুজনে একবার ভুলেও উত্থাপন করিনি।

কিন্তু কে জানত সে তর্কের জের অমন করে মেটাবার নয়। দুদিন বাদেই আমাকে সত্যিসত্যিই ভেরেণ্ডির জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়তে হবে তাই বা কে ভেবেছিল!

বিমল চলে যাবার পর একটা রাত পার হতেই দুপুর বেলা হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। "বিমল মরণাপন্ন, এখুনি আমার যাওয়া দরকার।"—টেলিগ্রামের মর্ম্ম এই।

মাহুরি কুঠিতে এক রাত

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

যাওয়া যে দরকার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ছোটনাগপুরের একটা নগণ্য ষ্টেশনে নেমে মাইল দশ বারো গেলে ভেরেণ্ডির জঙ্গল পাওয়া যায়। এই জঙ্গলের মাঝখানে একটা পুরোণো তামার খনিকে নূতন করে আবিষ্কার করে আজ দু'বছর বিমল কাজ করছে। সে নির্ব্বান্ধব পুরীতে যে সমস্ত কুলি মজুর নিয়ে সে দিন কাটায়, সাঙ্ঘাতিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা যে কোন সাহায্যই করতে পারবে না এটা ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম।

টেলিগ্রাম পাবার পরই বিকেলে রওনা হয়ে পড়েছি। ভেরেণ্ডির জঙ্গলে বিমলের নিমন্ত্রণ ঐভাবে রক্ষা করতে যেতে হচ্ছে ভেবে সত্যই অদ্ভুত লাগছিল। আর বিরক্তি লাগছিল যেতে এমন দেরী হওয়ায়। যে ষ্টেশনে নেমে ভেরেণ্ডির জঙ্গলে যেতে হয়, অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের প্যাসেঞ্জার ছাড়া আর সব গাড়ির কাছে সে অস্পৃশ্য। তাই বাধ্য হয়ে প্যাসেঞ্জারেই চাপলেও তার শামুকের মত গতি ক্রমশঃই অসহ্য হয়ে উঠছিল। এতক্ষণে কি যে বিপদ সেখানে হচ্ছে কে জানে! বিমল অত্যন্ত শক্তধাতের ছেলে। সহজে সে কাতর কিছুতেই হয় না। সেই সুদূর জঙ্গলে একলা আজ সে দু'বছর যেভাবে বাস করে আসছে, তা থেকে তার কাঠামের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং অত্যন্ত বিপদে না পড়লে সে যে আমায় তার করত না, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এরকম গদাইলস্করি চালের গাড়িতে আমি সেখানে পৌঁছোবই বা কখন! তাকে সাহায্যই বা করব কি!

বিকেলবেলা যে গাড়ি রওনা হয়েছিল, সমস্ত রাত গুটি গুটি করে চলে ভোর প্রায় পাঁচটার সময় টিনের চাল দেওয়া নিতান্ত আখ্‌খুটে চেহারার একটি ষ্টেশনে সে গাড়ি আমায় নামিয়ে দিলে। প্ল্যাটফর্ম্ম বলতে কাঁকর ফেলা খানিকটা জায়গা, ট্রেণের সব কটা পা-দানি বেয়ে সেখানে নামতে হয়।

ষ্টেশন নয়, মনে হল যেন জনহীন কোন প্রান্তরে নেমেছি, শীতের রাত্রে

মাহুরি কুঠিতে এক রাত

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

ভোর পাঁচটার সময় বেশ অন্ধকার থাকে। তার ওপর গাঢ় কুয়াশায় ষ্টেশনের একটি মিটমিটে তেলের বাতি প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্ম্মে জনমানব কেউ আছে বলে মনে হ'ল না। মিনিট খানেক থেমে গাড়িটা ষ্টেশন ছেড়ে চলে যেতেই তার নির্জ্জনতা আরো যেন ভয়াবহ হয়ে উঠল। ট্রেণের আলোয় ও আওয়াজে নিজের নিঃসঙ্গতা এতক্ষণ এমন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি।

কিন্তু এ-ষ্টেশন থেকে ত' বেরুতে হবে। ভেরেণ্ডির জঙ্গলের রাস্তা এখান থেকে দশ বার মাইল দূর এইটুকু মাত্র জানি—কোন দিকে যেতে হবে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। জিজ্ঞাসাই বা কাকে করি! টিকিট চাইতেও ত' কেউ আসে না!

ষ্টেশনের অস্পষ্ট বাতিটার দিকে এবার এগিয়ে গেলাম। ষ্টেশনের ঘরে কোন না কোন লোক নিশ্চয় আছে।

"ঠারিয়ে!"

সত্যিই একেবারে আঁৎকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম, মানুষ নয় যেন বাঘের গলার আওয়াজ! পিছন ফিরে কুয়াশায় ঘোলাটে একটা নীল আলো ছাড়া কিন্তু কিছুই প্রথমটা দেখতে পেলাম না। নীল আলোটা আর একটু কাছে এগিয়ে আসার পর বিশাল একটা বস্তার মত জিনিষ অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল। জিনিষটা বস্তা নয় মানুষের মাথা। প্রকাণ্ড কম্ফর্টার ও তার ওপর কম্বল জড়িয়ে অতবড় হয়েছে। সেই কম্বল ও কম্ফর্টারের সামান্য একটু ফাঁকের মধ্যে এবার প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ ও দুটি জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেল। শরীরের অন্যান্য অংশ অন্ধকারে অস্পষ্ট!

সত্যিই প্রথমটা কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেছলাম। সেই কম্বল জড়ান মুখ থেকে, গম্ভীর বাজখাঁই গলায়—'টিকস্' শুনেও যেন প্রথমে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারিনি।

আবার আওয়াজ এল, 'টিকস্ কাঁহা ?'

এবার ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পকেট থেকে টিকিট বার করলাম এবং পরমুহূর্ত্তে ভাল্লুকের মত একটা মোটা লোমওয়ালা হাত হঠাৎ অন্ধকার থেকে যেন বেরিয়ে এসে আমার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিলে মনে হ'ল।

সাহস করে এবার জিজ্ঞাসা করলাম—"ভেরেণ্ডির জঙ্গলের রাস্তাটা কোন দিকে বলতে পারেন ?"

নীল আলোটা দূরে সরে যেতে সুরু করেছিল ইতিমধ্যে। সেটা থামল এবং কুয়াশার ভেতর থেকে শোনা গেল—সবিস্ময় প্রশ্ন—"কাঁহা ?"

'ভেরেণ্ডির জঙ্গল, যেখানে তামার খনি আছে।"

নীল আলোটা আমার কাছে সরে এল। কম্ফর্টার ও কম্বলের বস্তার তলা থেকে দুটি চোখ আমায় তীক্ষ্ণ সবিস্ময় দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে বুঝতে পারছিলাম। ব্যাপারটা কি !

হঠাৎ "উধর্ মৎ যানা" শুনে চমকে উঠলাম। এবং কিছু জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই বিমূঢ় হয়ে দেখলাম লোকটা চলে যাচ্ছে। পরমুহূর্ত্তে নীল আলোটাই হঠাৎ বোধহয় নিবে গেল, অন্ধকারে অন্ততঃ আর কিছু দেখা গেল না।

কিন্তু আমার এখন প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে থাকলে ত' চলবে না। ষ্টেশনের সেই আলোটি লক্ষ্য করে আবার এগিয়ে গেলাম। সেই আলোর কাছেই বাইরে বেরুবার গেটটা পেয়ে তবু আশ্বস্ত হওয়া গেল। পাশেই ষ্টেশনের একটি মাত্র ঘর। ভেতর থেকে টরেটক্কা টেলিগ্রাফের আওয়াজ আসছে। গেট দিয়ে বেরুতে বেরুতে কৌতূহল ভরে একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে সত্যি বিস্মিত হলাম। একটা কুলি বা চাপরাসিরও সেখানে দেখা নেই।

বাইরেও কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার, শুধু একটা অস্পষ্ট পায়ের ধূসর ধোঁয়াটে রেখা কোনরকমে চেনা যাচ্ছে। আপাততঃ আর কোন পথ না দেখতে পেয়ে

শিশুতোষ গল্পের পরিক্রমা

মাহুরি কুঠিতে এক রাত

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

সেইটিকেই অনুসরণ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হ'ল। খানিকবাদেই অন্ধকার কেটে গেলে আর ভাবনার কিছু থাকবে না। তখন কাউকে জিজ্ঞাসা করে নিলেই চলবে।

কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও কাউকে জিজ্ঞাসা করবার সুবিধা কিছু হ'ল না। এরকম নির্জ্জন পথ কোথাও আছে বলে জানতাম না। চারিধারে বিশাল ঘন-জঙ্গল একেবারে নিস্তব্ধ। মানুষ দূরের কথা, এই ভোরের বেলা একটা পাখীর আওয়াজও সেখানে শোনা যায় না। সৌভাগ্যের কথা জঙ্গলের মধ্যে পায়ে-চলার দু'একটা রেখা ছাড়া এ-পথ কোথাও দু'ভাগ হয়ে যায়নি !

ঘণ্টা চারেক চলবার পর পথ ক্রমশঃ ওপরে উঠছে বুঝতে পারলাম। জঙ্গলও সেখানে আরো নিবিড়। একট চড়াই পার হয়েই দূরে একটা পাথুরে টিবির ধারে ছোট একটা বস্তির মত দেখতে পাওয়া গেল। সে বস্তির পিছনে একটা বিশাল ভাঙ্গা পোড়ো-বাড়ি পাথুরে টিবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জঙ্গলের ওপরে মাথা তুলেছে।

কাছে গিয়ে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির চিহ্ন পেয়ে বুঝলাম, সেইটেই খনি। কিন্তু এখানেও যে জন-মানব নেই। খোলার চালের ঘরগুলি অধিকাংশই সকাল বেলাও বন্ধ। টালিতে ছাওয়া বাঙলো প্যাটার্ণের একটি বাড়ি তার মধ্যে দেখতে পেয়ে সেইটেই বিমলের থাকবার জায়গা হবে মনে করে দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। কোন সাড়াশব্দ নেই।

দরজায় মৃদু একটা ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল। সামনেই বসবার ঘর, কয়েকটা বেতের চেয়ার ও একটা টেবিল পাতা। পেছন দিকে ভেতরের দিকের দরজায় পর্দ্দা ঝুলছে। এঘরেও কেউ নেই।

পর্দ্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময়ে পেছনে পদশব্দ শুনে চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। চমকে উঠবার কথা বটে। প্রায় ছ'ফুট লম্বা অত্যন্ত

রোগা ও সরু যে লোকটি ঘরে ঢুকেছে। বিজ্ঞাপনের ব্যঙ্গচিত্রে ছাড়া অমন চেহারা কোথাও চোখে পড়েনি।

জিজ্ঞাসা করলাম,—"বিমলবাবু কোথায় আছেন বলতে পার!"

"কৌন বাবু"

"বিমলবাবু। আমি তাঁর অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি! কেমন আছেন এখন!"

"নিঞ্জিনিয়ার বাবু-কো মাঙ্‌তা!" বলে লোকটা হাতের ও মুখের অপরূপ একটা ভঙ্গি করলে!

কিছু বুঝতে না পেরে বল্লাম, "নিঞ্জি-নিয়ার বাবুই হোল, কিন্তু তিনি কোথায়!"

লোকটা আমার দিকে খানিক অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থেকে যা বল্লে, তার মর্ম্ম বুঝতে আমার মিনিট দু'এক লাগল এবং তারপর স্তম্ভিত হয়ে আমি ঘরের একটি চেয়ারে বসে পড়লাম।



ধীরে ধীরে তারপর সমস্ত ব্যাপারই শুনলাম। আমি টেলিগ্রাম পেয়ে যখন

শিশুসাথী

মাহুরি কুঠিতে এক রাত

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

ট্রেণে রওনা হয়ে পড়েছি তখন বিমল এ-জগৎ থেকেই রওনা হয়ে গেছে। সব চেয়ে আঘাত পেলাম যেভাবে সে মারা গিয়েছে তার বিবরণ শুনে। এক হিসাবে আমিই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। কারণ কোন অসুখে বিমল মারা যায়নি, তার মৃত্যু অত্যন্ত রহস্যজনক।

কলকাতা থেকে ফিরে এসে বিমল বোধহয় আমার বিদ্রূপ স্মরণ করেই জেদের বশে মাহুরি কুঠিতে সমস্ত রাত একলা কাটায়। তার সঙ্গে যারা কাজ করে তারা সকলেই মানা করেছিল কিন্তু সে শোনে নি।

শেষ রাত্রে একটা অদ্ভুত গোঙানি শুনে তার বেয়ারা রামদীন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের মাঠে বিমলকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। ধরাধরি করে তাকে ভিতরে তুলে আনার পর দেখা যায়, তার মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন, গায়েও নানা জায়গায় দাগ আছে। সে নিজেই পড়ে যাক বা কেউ তাকে ফেলে দিয়ে থাকুক, কোন উঁচু জায়গা থেকে পড়ার দরুণ যে তার মাথায় দারুণ চোট লেগেছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

অনেক সেবা শুশ্রূষার পর সকালের দিকে আধঘণ্টাটাক তার জ্ঞান হয়েছিল, সেই সময়েই সে আমায় টেলিগ্রাম করতে বলে। কিন্তু তারপর উন্নতির বদলে ক্রমশঃ তার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। বিকেল চারটার সময় সে মারা যায়।

এদেশের লোকের, বিশেষতঃ অশিক্ষিত কুলি-মজুরদের কুসংস্কার অত্যন্ত বেশী। তাদের ইঞ্জিনিয়ার বাবুকে ভূতেই যে ফেলে দিয়েছে এ বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ নেই, সেইজন্যে বিমলের মৃত্যুর পর তার সৎকার করেই তারা সদলবলে খনির বস্তি থেকে চম্পট দেয়।

আমি সেইজন্যেই সকালে এসে কাউকে কোথাও দেখতে পাইনি। বেচারা রামদীনও পালিয়েছিল। যাবার সময় তবু বুদ্ধি করে সে ষ্টেশনে আমার

ঠিকানায় আর একটা তার করে দেয়। আগেই রওনা হবার দরুণ আমি সে 'তার' পাইনি। যে স্টেশন মাষ্টার সে 'তার' নিজের হাতে পাঠিয়েছিল তার অদ্ভুত আচরণের ও কথাবার্ত্তার মানে এবার যেন একটু বোঝা গেল।

যার কাছে সমস্ত খবর পেলাম, ব্যঙ্গচিত্রের মত চেহারার অদ্ভুত সেই লোকটিই রামদীন। আজ সকালবেলা সে সাহস করে বাবুর জিনিষপত্রের তদারক করতে কিম্বা চুরির মতলবে, যে কারণেই হোক 'নিঞ্জিনিয়ার' বাবুর কুঠিতে এসেছে।

সমস্ত ব্যাপার শোনবার পর আমার মনের অবস্থা যা হ'ল তা বর্ণনা করা অসম্ভব। বিমলের এ পরিণামের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কিন্তু এ ব্যাপারের পর চুপ করে চলে যাওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। ভূতই হোক্ আর যাই হোক এ ব্যাপারের রহস্যভেদ আমায় করতেই হবে। আমার সঙ্কল্প আমি তখনই ঠিক করে ফেলেছি।

ভেরেণ্ডির জঙ্গল থেকে নিকটস্থ থানা প্রায় এক বেলার পথ, দুপুরে রামদীনকে সেখানে খবর দিয়ে পাঠিয়ে, আমি রাত্রের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

আর কিছুর জন্যে না হোক অন্ততঃ বিমলের কাছে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্যেই মাহুরি কুঠিতে এক রাত আমায় কাটাতে হবে। তার জন্যে আয়োজন অবশ্য বেশী কিছু করবার নেই। শুধু একটা জোরালো বৈদ্যুতিক টর্চ্চ ও একটা ছোট লোহার রডই আমি সঙ্গে নেব ঠিক করলাম।

সন্ধ্যার আগে রামদীনের ফিরে আসবার কথা, কিন্তু রাত প্রায় সাতটা হয়ে গেলেও তার কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। মুখে আমায় কথা দিলেও ভূতের ভয়ে সে শেষ পর্য্যন্ত সরে পড়েছে বুঝতে পারলাম। কিন্তু পুলিশের লোকেরও দেখা নেই কেন! রামদীন কি থানায় খবরও তাহলে দেয়নি?

জঙ্গলের মাঝে পরিত্যক্ত খনির বস্তিতে আমি সম্পূর্ণ একা। রাত নটা

পিয়ালি গাঙ্গুলিকে

মাহুরি কুঠিতে এক রাত

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বাজবার পর আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। পুলিশের লোক আসুক বা না আসুক মাহুরি কুঠিতে একাই আমায় যেতে হবে।

বিমলের বাঙলো থেকে মাহুরি কুঠি বেশী দূর নয়। দিনের বেলা বাড়িটিকে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছি। প্রকাণ্ড দোতলা দু'মহলা কুঠি, কি খেয়ালে যে এখানে এত বড় বাড়ি কেউ নির্ম্মাণ করেছিল বোঝা কঠিন। বাড়িটির অবশ্য অত্যন্ত ভগ্নদশা। বড় বড় গাছ তার দেওয়াল ভেদ করে বেড়ে উঠেছে। বাইরের দিকের ঘরগুলির জানলা দরজার চিহ্ন আর নেই। এই শুকনো দেশেও ভেতরের ঘরগুলিতে শ্যাওলা ও আগাছা জন্মেছে প্রচুর। ভাঙ্গা দেউড়ি দিয়ে বাইরের মহলা পার হয়ে গেলে ভেতরের বিশাল যে সমস্ত উপর নীচের গোলক ধাঁধার মত অসংখ্য ঘর পাওয়া যায়, দিনের বেলাতেও সেগুলি অন্ধকার। দরজা জানালা অধিকাংশেরই নেই, যেগুলির আছে সেগুলিও কব্জা থেকে খুলে পড়েছে। আসবাব পত্র অনেক ঘরে এখনো অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় টিঁকে আছে শুধু বোধ হয় ভূতের ভয়ে চোরও সেখানে প্রবেশ করেনি বলে।

অমূলক ভয় আমার নেই তবু টর্চ্চ হাতে বাইরের দেউড়ি দিয়ে মাহুরি কুঠিতে প্রবেশ করবার সময় নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও গা ছমছম করে যে উঠেছিল তা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। এমন গাঢ় জমাট অন্ধকারের সঙ্গে পরিচয় আমার সত্যি কখনও হয়নি, টর্চ্চের আলোকে যেন সবলে তাকে কেটে বেরুতে হচ্ছে। বাইরের মহলের ওপর নীচের সমস্ত ঘরগুলো ঘুরে দেখে ভেতরের মহলে ঢুকলাম। নীচের ঘরগুলির দুর্দ্দশা অত্যন্ত বেশী। আগাছায় মেঝে প্রায় ছেয়ে গেছে ইট সুরকী পাথর জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে স্তূপাকার হয়ে। ঘরগুলিতে ঢোকাও বিপজ্জনক। সে সমস্ত ঘর ছেড়ে এবার ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠলাম। দোতালার ঘরগুলি এখনো অনেকটা ভালো অবস্থায় আছে। একটার পর একটা টর্চ্চের আলোয় ভালো করে পরীক্ষা করে যেতে যেতে কিন্তু

মাহুরি কুঠিতে এক রাত

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

অস্বাভাবিক কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। বিমলের মৃত্যুর রহস্য এ বাড়ির সঙ্গে জড়িত না থাকলে অনায়াসে মনে করা যেত যে নেহাৎ কুসংস্কারের দরুণ এখানকার লোক এই পোড়ো বাড়িটিকে এমন বিভীষিকাময় করে তুলেছে।

বাড়িটির একটি বিশেষত্ব অবশ্য আগেই উল্লেখ করেছি। ঘরগুলি এমন বিশৃঙ্খলভাবে সাজান, যেখানে সেখানে দরজা ঘুলঘুলি প্রভৃতি এমন ভাবে ছড়ান যে সব শুদ্ধ একটা বিরাট গোলক ধাঁধা বলে মনে হয়। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে যেতে পথ গুলিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা এখানে অত্যন্ত বেশী।

সম্প্রতি সত্যই তাই গুলিয়ে ফেলেছি বলে মনে হচ্ছিল। খানিক আগে যে ঘর ছেড়ে গেছি সেই ঘরেই আবার ঘুরে এসে সবিস্ময়ে তখন দাঁড়িয়ে পড়েছি। ওপরে ওঠবার সিঁড়িটাও যে ঠিক কোন দিকে হবে বুঝতে পারছিলাম না।

খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মাথাটা ঠিক করে নিয়ে আবার এগুতে যাব এমন সময় পায়ে যেন একটা কি ঠেকল। টর্চ্চের আলো সেখানে ফেলে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলাম। জিনিষটা আর কিছু নয়। একটা চামড়ার ব্যাগ কিন্তু এ ব্যাগটির সঙ্গে আমি পরিচিত। কলকাতায় বিমলের কাছে আমি এটা দেখেছি এবং তার সুন্দর চামড়ার কাজের প্রশংসাও করেছি।

ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে খুলে ফেলে আরো আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। ব্যাগের ভেতর একটি খোপে সুতো দিয়ে বাঁধা একতাড়া কড়কড়ে নতুন দশ টাকার নোট। আর একটি খোপে খুচরো কয়েকটা টাকা পয়সা ও একটি ছোট কাগজের টুকরা। এ কাগজের টুকরাটি দেখেই আমি চিনলাম নিজের হাতে বিমলকে এই কাগজে আমার ঠিকানা আমি দিয়েছিলাম।

বিমল তার মৃত্যুর আগের রাত্রে এই ঘরে যে ঢুকেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আর নেই, কিন্তু এ ব্যাগ তার পকেট থেকে পড়লই বা কি করে। এবং

কোন শত্রুর হাতে যদি তার প্রাণ গিয়ে থাকে তাহলে তারা এ ব্যাগ ছোঁয়নিই বা কেন !

টর্চ্চের আলোয় ঘরটা এবার আমি খুব ভালো করে তন্নতন্ন করে দেখলাম। ঘরটি আকারে বেশ বড় অন্যান্য ঘরের চেয়ে আসবাব পত্রও একটু বেশী—তুটি ভাঙা তক্তপোষ, একটা পা ভাঙা টেবিল। দেয়ালে লাগান একটা কাঠের উইয়ে-খাওয়া বড় আলমারী ছাড়া খুচরো আরো অনেক জিনিষ ঘরময় ছড়ান। কিন্তু বিমলের আর কোন চিহ্ন সেখানে পেলাম না। এমন কি কাল সে যে এখানে ছিল তার কোন পরিচয়ও নয়।

তবু এ ঘরেই রাতটা কাটাবার সঙ্কল্প আমি তখন করে ফেলেছি। রাত কাটাবার ব্যবস্থা আমার করাই ছিল, পকেট থেকে মোমবাতি বার করে ভাঙা একটা তক্তপোষের ওপর রেখে জ্বেলে ফেল্লাম। টর্চ্চের আলো ত সারা রাত জ্বালা যায় না।

বাতিটা জ্বেলে তক্তপোষের ওপর বসতে গিয়ে কিন্তু উঠে পড়তে হ'ল। পাশের ঘরে হঠাৎ হুড়মুড় করে কি একটা ভারী জিনিষ পড়ে যাবার শব্দ। এতক্ষণ এই পোড়ো বাড়িতে এধরণের কোন শব্দ কিন্তু শুনিনি।

টর্চ্চটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে কিন্তু প্রথম একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলাম, হুড়মুড় করে পড়বার মত কোন জিনিষ সেখানে নেই। অথচ আমি স্পষ্ট সে শব্দ শুনেছি। হতভম্ব হয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আবার আগের ঘরে ফিরলাম। বাতিটা কেমন করে ইতিমধ্যে নিভে গেছে কে জানে! দেশলাই বার করে আবার সেটা জ্বালতে গিয়ে জ্বালা আর হ'ল না।

বাইরের বারান্দায় চটি পায়ে দিয়ে ফটফট করে চলার স্পষ্ট শব্দ। ঝড়ের মত এবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। টর্চ্চ ফেলবার আগেই কিন্তু শব্দটা থেমে

গেছে। টর্চ্চ ফেলে অবাক হয়ে দেখলাম সত্যি দুটো মান্ধাতার আমলের শুকনো চিমড়ে ছেঁড়া বেহারী চটি সেখানে পড়ে রয়েছে।

না, ভয় তখনও আমি পাইনি, বরং কোন দুষ্ট লোকের কারসাজি যে এর ভেতর আছে সেই সন্দেহই আমার তখন দৃঢ় হয়েছে। সে কারসাজির সমুচিত শাস্তি দিতে হবে!

চটি দুটো হাতে করে তুলে নিয়ে আবার ঘরে ফিরলাম এবং বাতি জ্বেলে গ্যাঁট হয়ে ভাঙ্গা তক্তপোষের ওপর বসলাম—ঘটনার পরিণতি দেখবার জন্যে। ভূতুড়ে চটি যদি হয় ত আমার চোখের সামনেই চলুক দেখি! মিনিট দশেক কোন কিছুই হ'ল না। ভূতুড়ে চটির ক্ষমতার বহর দেখে নিজের মনেই হাসছি এমন সময় সত্যিই সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

চুপি চুপি আমার পেছনে কে যেন স্পষ্ট আমার নাম ধরে ডাকলে একবার!

মোমের বাতিতে ঘরে তেমন আলো না হলেও সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পেছনে কেউ কোথাও নেই। তবে এ শব্দ কোথা থেকে এল!

আমার মনের ভুল? কিন্তু মনের এ রকম ভুল হওয়াও ত ভালো লক্ষণ নয়। ভয় পেয়ে যাদের মাথা খারাপ হয়ে যায় তারাই চোখে নানারকম ভুল দেখে কাণে নানারকম আওয়াজ শোনে বলে ত জানি।

না, আরো সতর্ক ও সজাগ হয়ে থাকতে হবে এবার। নিজের মনের ভুলে ভয় পাওয়ার মত লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। এতক্ষণ শুধু ঘরগুলো ঘোরাফেরা করতেই কেটে গেছে বুঝতে পারিনি। শীতকালের ভোর হতে এখনও প্রায় ছ ঘণ্টা বাকি। এই ছয় ঘণ্টায় শুধু ঘুমে চোখ না জড়িয়ে আসে এইটুকু দেখতে হবে! বসে থাকলে পাছে ঘুম আসে বলে এবার ঘরে পায়চারী করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

কিন্তু আশ্চর্য্য! আমার প্রত্যেক পা ফেলার শব্দের সঙ্গে বাইরে আর একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে যদি কারুর পায়ের শব্দ হয় তাহলে তার চেহারা খানা যে কি রকম তা কল্পনা করাও কঠিন! বারান্দায় একটা হাতী হাঁটলেও বোধহয় অমন শব্দ হত না।

পায়চারী করতে করতে ইচ্ছে করে একবার থমকে দাঁড়ালাম। বাইরের শব্দও গেল থেমে। আবার চলতে সুরু করার সঙ্গেই সে শব্দ শোনা গেল।

আবার বাইরে ব্যাপারটা দেখতে যেতেই হল। টর্চ্চ নিয়ে সমস্ত পথটা কিন্তু তন্ন তন্ন করে বৃথাই খুঁজে দেখলাম।

ফিরে এসে দেখি আবার আলো গেছে নিভে। না ব্যাপারটা ক্রমশঃই বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশলাইটা বার করেছি এমন সময়—

"আলো জ্বেলো না ভূপেন!"

মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই, সমস্ত শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বরফ গলানো জলের স্রোত নেমে গিয়ে সমস্ত শরীর অবশ করে দিলে। এ যে স্পষ্ট বিমলের গলা!

খানিকক্ষণ শুকনো গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না, তারপর জড়িত স্বরে কোন রকমে বল্লাম—"কে তুমি?"

"আমি! আমি বিমল! দোহাই তোমার আলো জ্বেলো না।"

"কেন?"

"তাহলে আমার এখানে থাকা হবে না। তোমাকে দুটো কথা বলে যেতে চাই, তাও বলতে পারব না। তুমি ভয় পেয়েছ ভূপেন?"

ধরা গলায় ঢোক গিলে বল্লাম—"না।"

"তাহলে বস, টর্চ্চ না জ্বেলে এগিয়ে এসে তক্তপোষটায় বস।"

আমি হাতড়ে হাতড়ে তক্তপোষটায় এসে বসলাম।

অন্ধকারে আবার শোনা গেল—"তুমি আসাতে কি খুশী যে হয়েছি বলতে পারি না!"

কথাটা শুনে নিজে যথেষ্ট খুশী না হলেও বল্লাম—"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ, তুমি না এলে আমায় এইখানে কতকাল বন্দী হয়ে থাকতে হত কে জানে!"

"কেন?"

দুটো দরকারী কথা না বলে আমি পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারছিলাম না।"

"পৃথিবী ছেড়ে কোথায়!"

খানিকক্ষণ কোন উত্তর পাওয়া গেল না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় বল্লে না?"

"সে কথা জানতে চেয়ো না, তোমাদের জানবার অধিকার নেই।"

"ও, কিন্তু তুমি কি বরাবর এখানে আছ!"

"বরাবর। যতক্ষণ তুমি এসেছ তোমার পাশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছি এখন একটু তোমার পাশে বসব?"

তাড়াতাড়ি বল্লাম—"না না, কি দরকার! কিন্তু ওসব শব্দ টব্দ কি তুমি করছিলে?"

"আমি! না না আমি নয়, ও ওরা সব করেছে!"

সভয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"ওরা!"

"হ্যাঁ ওরাও আছে, ওরা ওই রকম করতে ভালবাসে, আমার কিন্তু ভাল লাগেনা। তবে—"

"থামলে কেন? কি তবে?"

তবে অনেকদিন পৃথিবীতে থাকতে হলে বিরক্তি আসে, তখন ওই সব বদ খেয়াল হয়!"

মাহুরি কুঠিতে এক রাত

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

"'ওরা' কি অনেক দিন আছে ?"

"অনেক দিন! যোধমল ত মানসিংহের সঙ্গে মনসবদার হয়ে এসেছিল, আর দেবদত্ত অশোকের সময়ের !"

"এতদিন ওরা কেন এখানে আছে !"

"কি করবে মায়ার বন্ধন ! যোধমল এখানকার এক রাজকোষ লুট করবার সময় দামী একটা মোতির মালা পেয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। কাউকে সে লুকোন জায়গা জানাবার আগেই তরোয়ালের খোঁচায় মারা যায় বলে বেচারার আজো মুক্তি হ'ল না।"

একটু উৎসুক ভাবে বল্লাম,—"কাউকে জানালেই ত পারে।"

"উঁহুঃ যাকে তাকে জানালে হবে না, ওর বংশধর, আত্মীয় স্বজন, অন্ততঃ দেশের লোক না হলে জানাবার উপায় নেই।"

"অর্থাৎ মাড়োয়ারী চাই।"

"হুঁ—মাড়োয়ারীরা আবার এধার মাড়ায় না।"

যোধমল সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হয়ে বল্লাম—"আর দেবদত্ত ?"

"দেবদত্ত ? দাঁড়াও জিজ্ঞেস করে দেখি !"

খানিকক্ষণ সব নিস্তব্ধ ; তারপর শোনা গেল—"দেবদত্ত উদ্ধার হওয়া আরো শক্ত।"

"কেন ?"

"অশোকের সময় ও মঞ্জুশ্রী না ধ্যানশ্রীর কি একটা মূর্ত্তি গড়েছিল।"

"সেটা এখনো আবিষ্কার হয়নি বুঝি ? কোথায় সেটা ! আমি না হয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে······

"না না, আবিষ্কার হয়েছে বই কি ! কিন্তু পণ্ডিতরা তর্কাতর্কি করে তার

নাম নিয়ে বাধালে গোল, কেউ বলছে সেটা মূর্ত্তিই নয়, কেউ বলছে—কি বলে—প্রজ্ঞা পারমিতা !"

"তাতে কি !"

"চুপ চুপ ! দেবদত্ত একেবারে ক্ষেপে উঠবে এক্ষুণি ! তাতেই ত সব ! নাম ঠিক হওয়া না দেখে ও কিছুতেই যেতে পারছে না এখান থেকে !"

"আমি না এলে তুমিও যেতে পারতে না !"

"বোধহয় না।"

"ওই সব বদখেয়াল !"

"তাও হয়ত হ'ত ! এক্ষুনি ত মাঝে মাঝে কি রকম নিশপিশ করে…"

"কি নিশপিশ করে ? হাত !"

একটু হাসির শব্দ শোনা গেল…"হাত তাকে বলে না ! তবে…"

গলার স্বরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে বল্লাম…"যাক্‌গে ভাই, তোমার কি কথা ছিল না, যা বল্লেই তোমার ছুটি ?"

"হ্যাঁ ছুটি, একেবারে ছুটি !"

একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম…"বলা হলেই তুমি চলে যাবে !"

"তৎক্ষণাৎ !"

"কিন্তু তুমি চলে গেলে এই…এই যোধমল আর দেবদত্ত……"

"না, না তোমার কোন অনিষ্ট করবে না, আমার বারণ আছে।"

"তবে বল এবার !"

"এই বলছি…কুঁক্ !"

"ও আবার কি ?"

"ও কিছু না !"

"কিন্তু হেঁচ্‌কির মত শোনাল যেন !"

"পাগল ! হেঁচ্‌কি কোথায়—কুঁক্‌ ।"

"কিন্তু আমরা ত ওকেই হেঁচ্‌কি বলি ।"

"আমরা বলি না !"

"তবে কি ওটা !"

"ও আমাদের ভৌতিক দেহের বুৎকার !"

"বুৎকার কি !"

"ওকথার মানে তোমরা বুঝবে না ! ওটা এজগতের কথা !"

"ওজগতের কথা আলাদা নাকি ! এতক্ষণ ত বেশ বাঙ্গলা বলছিলে !"

"অনেক কষ্টে অনুবাদ করে বলতে হচ্ছিল । কিন্তু বুৎকারের অনুবাদ হয় না। —কুঁক্‌ ।"

"নাঃ ভাই এটা হেঁচকি !"

"উঁহুঃ বুৎকার"

"আমি তাহলে আলোটা জ্বালছি !"

"দোহাই তোমার ! এখনো আমার কথা বলা হয় নি···কুঁক্‌ ।"

"কথা তুমি পরে বোলোখন । এখন একটু জলের চেষ্টা দেখি ।"

"আমাদের জল লাগে না, আলো জ্বাললেই আমায় চলে যেতে হবে। —কুঁক্‌ ।"

"তা না হয় খানিক চলে গিয়ে তোমার 'বুৎকারটা' থামিয়ে এসো ।" বলে সত্যি দেশলাই বার করে মোমবাতিটা জেলে ফেল্লাম ।

কিন্তু একি সত্যিই ঘরে যে কেউ নেই ! একি ব্যাপার !

···কুঁক্‌·········

"বিমল তুমি আছ এখানে ?"

বিমলের কোন উত্তরের বদলে শোনা গেল—"কুঁক্ ।"

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর আমার মনে কোন সংশয় আর রইল না। এগিয়ে গিয়ে কড়া দুটো ধরে সজোরে কাঠের আলমারীর পাল্লা দুটো আমি খুলে ফেল্লাম।



"একি বিমল তুমি! —সশরীরে ?"

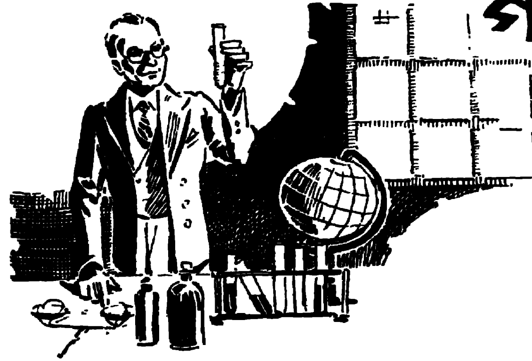
বিমলের গলা থেকে বেরুল···"কুঁক্ ।"

ব্যাপারটা এতক্ষণে বোধ হয় অনেকখানিই বোঝা গেছে। হেঁচ্‌কি-টুকু উঠে সব না খেচড়ে দিলে বিমলের ফন্দিকে সার্থক বলা চলত। তার টেলিগ্রামে আমি বিশ্বাস করেছিলাম, এবং আগের দিন মাইল দশেক দূরের এক মস্ত মেলার জন্যে খনির লোকজনকে ছুটি দেওয়ায় তার অন্যদিকে সুবিধেও হয়ে গেছল।

শুধু রামদীনকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাকে টানতে হয়েছিল। পোড়ো বাড়িতে তার দুরমুষ ফেলা ও পেটানর আওয়াজের যে নমুনা সে দেখিয়েছে তাতে তারিফ তাকে অবশ্যই করতে হয়। অবশ্য স্টেশন মাষ্টারের অদ্ভুত মূর্ত্তি ও আচরণ বিমলের ফন্দিকে সাহায্য করবে একথা সেও ভাবে নি।



বিজ্ঞানের গল্প





মরণ জয়ী

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

আমাদের মাথার ওপর সুনীল আকাশ। ওখানে দিন-রাত্রির আলো-অন্ধকারের খেলা চলে। তার সঙ্গে দিবসে প্রচণ্ড জ্বলন্ত সূর্য্য, রাত্রে অন্ধকারে নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ উল্কা দেখা দেয়। এই দৃশ্য অতি পুরাতন। একই দৃশ্য নিয়ত দেখ্‌তে ভাল লাগে না; ইচ্ছা হয় আর কোন নূতন দৃশ্য দেখি।

কিন্তু রাত্রের এই নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ভরা ও উল্কার স্নিগ্ধ আলোকে সহসা আলোকিত আকাশখানিকে আমরা নিয়ত দেখেও তৃপ্তি পাই না। মনে হয়, কত গভীর রহস্য ওর মাঝে লুকানো। নক্ষত্রগুলো যেমন অসংখ্য ও নানা রংয়ের এবং নানা আকারের তেমনি ওদের কাহিনীও বড় বিচিত্র।

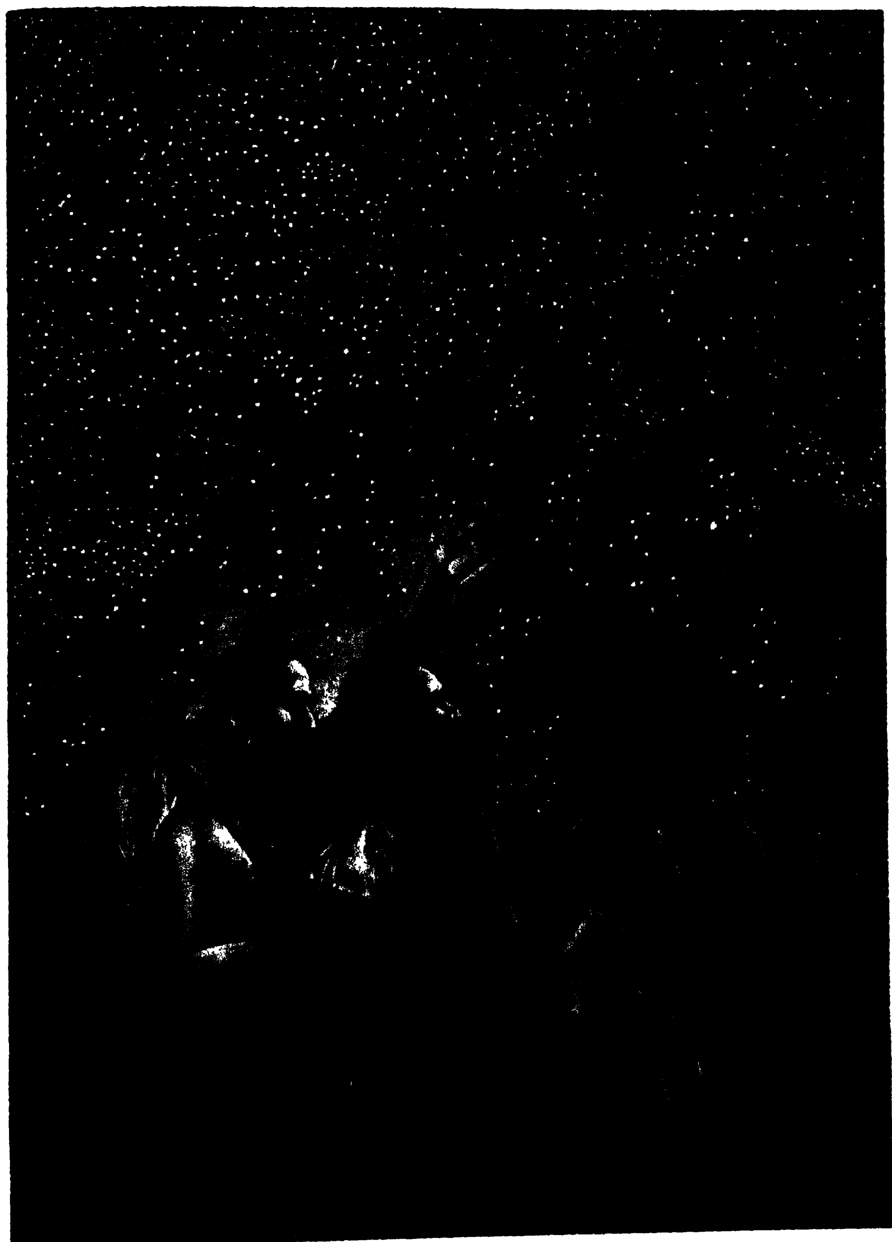
অন্ধকার রাত্রের নক্ষত্র-ভরা আকাশখানার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখ—কোন নক্ষত্রের রং লাল, কোনটার রং হল্‌দে, কোনটা সাদা, কোনটার বা সব্‌জে। আকারেও প্রভেদ কত—বড়, মাঝারি, ছোট; কোনটাকে দেখা যায় কি না যায়, যেন একটা জোনাকী। সবগুলোই কাঁপছে। এই চঞ্চলতার মাঝখানে এক বিশেষ জায়গায় একটিকে দেখা গেল, পলকহীন চোখে

তাকিয়ে আছে। আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখ, দেখবে এই নক্ষত্রের মেলায় জায়গায় জায়গায় একটু একটু মেঘ, যেন তিন বা চার ইঞ্চি জায়গা মাত্র জুড়ে। এ সবের ওপর দিয়ে দক্ষিণ আকাশ থেকে উত্তর আকাশের সীমান্তে আর এক গভীর রহস্য বিস্তৃত—সাদা পাত্‌লা মেঘের মত ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা।

তোমরা হয়ত শুনেছ, নক্ষত্রগুলো এক একটি সূর্য্য—কোনটা আমাদের সূর্য্যের চেয়ে ছোট, কোনটা দশ, বিশ বা ত্রিশগুণ বড়। তারা সুদূর আকাশ-পথে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে চলেছে। কোথায়? কোন একটি লক্ষ্যে। এ কথাও হয়ত জান, নক্ষত্রগুলোই মিট্ মিট্ করে, গ্রহগুলোর আলো স্থির। কিন্তু ঐ যে মেঘকণার মত সারা আকাশের এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত ওগুলো কি? আর, ঐ ছায়াপথের কথাও কি জান?

প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখ—দেখবে, ওগুলোর চেহারা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। মেঘের কণাগুলো অগণিত নক্ষত্র, ছায়াপথও নক্ষত্ররাশি। মেঘকণাগুলোকে বলা হয় নীহারিকা। তবে সব নীহারিকাই যে নক্ষত্র-রচিত তা নয়। কোন কোনটাতে বাস্তবিকই বাষ্প আছে। আবার নীহারিকাগুলির চেহারাও এক রকমের নয়--কোনটিকে দেখ্‌লে মনে হয় একটা পাকানো স্প্রীং, কোনটি আংটি, কোনটি বা বায়ু বিক্ষিপ্ত মেঘরাশি। এগুলি আকাশের লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে জ্বল্‌ছে। কিন্তু কোনটাই স্থির নয়। বিশ্বে কিছুই স্থির থাকবার উপায় নেই—সবই ছুট্‌ছে, ঘুরছে, জ্বল্‌ছে। আর, আমাদের কাছ থেকে ওগুলো সবই এত দূরে, অর্থাৎ ওদের কাছ থেকে আমাদের ব্যবধান এত যে অহরহ ছুট্‌তে থাক্‌লেও দশ হাজর বছরেও ওদের কাছে পৌঁছতে পারব না, নক্ষত্র-লোক যে সুদূরে সেই সুদূরেই থাক্‌বে।

তবে কি ওদের কথা আমরা কিছুই জান্‌তে পারব না? নক্ষত্র-লোক চিরদিন রহস্যাবৃতই থাক্‌বে? না, তা নয়। বুদ্ধিবলে মানুষ নানা বিষয়ের



জ্ঞান সঞ্চয় করছে। আজ পর্য্যন্ত সে জীবনের বা বিশ্বের সকল রহস্য ভেদ করতে না পারলেও কিছু কিছু সে জেনেছে। পৃথিবীতে যতকাল মানুষ থাক্‌বে, ততকাল তাকে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা না করে উপায় নেই।

সেকালে ঋষিরা ছিলেন। তাঁরা নিভৃতে গভীর চিন্তা ও নানা পরীক্ষা করে সারা জীবন কাটিয়েছেন। কি কঠোর তাঁদের সাধনা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি! জানবার কি প্রবল তৃষ্ণা। জীবনের এক মুহূর্ত্তও কেউ নিশ্চেষ্ট বা অলস হয়ে বসে থাক্‌তে পারেন নি। আহার, নিদ্রা, আরাম এসব ছিল তাঁদের জীবনের গৌণ কর্ম্ম; জ্ঞানাহরণই হয়ে উঠেছিল মুখ্য। তাঁদের সেই সাধনার ফলই আমরা আজ ভোগ করছি।

কেবল যে আমাদের ভারতভূমিই ঋষিদের দেশ তা নয়; পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই ঋষিরা জন্মগ্রহণ করেছেন। আজও পৃথিবীতে ঋষিরা বর্ত্তমান। তাঁদের কঠোর সাধনার কথা শুন্‌লে বিস্মিত হতে হয়।

মাত্র দু শতাব্দী পূর্ব্বের একজন ঋষি ও তাঁর সাধনার কথা শোন। এঁর নাম ছিল উইলিয়াম হার্‌সেল্। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। থাক্‌তেন ইংলণ্ডে। জার্ম্মাণীর অন্তর্গত হ্যানোভারে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে হার্‌সেলের জন্ম হয়। এর বোনের নাম ক্যারোলিন। ক্যারোলিন ছিলেন উইলিয়ামের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। এঁরা দরিদ্রের সন্তান। দরিদ্র যারা তারা আর কি আশা করতে পারে? জীবনে সাফল্য লাভ তাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। সম্মান, খ্যাতি, উচ্চ শিক্ষা, ঐশ্বর্য্য এ সব তাদের স্বপ্ন।

হার্‌সেল্ কিন্তু দুটি গুণ নিয়ে জন্মেছিলেন, তা হচ্ছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অদম্য জ্ঞানপিপাসা! তিনি অঙ্কও ভাল জানতেন। তাঁর এক খেয়াল ছিল, নক্ষত্র-লোকের দিকে তাকিয়ে থাকা। জীবনে যে কিছু একটা করে যেতে হবে, এ চিন্তা তাঁর মনে সতত জাগ্রত ছিল। প্রথমে তিনি সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হ'ন।

মরণ জয়ী

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

উন্মুক্ত প্রান্তরে শুয়ে নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে ঘুম আর আস্‌ত না। তিনি ভাবতেন 'জীবনটা বৃথা গেল।' কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা যার প্রবল তার উন্নতির পথরোধ করে কে? এক রাত্রে হার্‌সেলের সৈন্যদলের বিশ্রামের ব্যবস্থা হল উন্মুক্ত প্রান্তরে। অন্ধকার রাত্রি। আকাশ ভরা নক্ষত্র জ্বল্‌ছে। হার্‌সেল্ তার দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হ'ল, পূর্ব্বের নক্ষত্ররাশি পশ্চিমে সরে গেল, পশ্চিমের যারা তারা অস্তসাগরে ডুবে গেছে, কিন্তু হার্‌সেলের চোখে ঘুম নেই। তিনি ভাব্‌ছেন, "জীবনটা কি বৃথা গেল?"

তিনি উঠে দাঁড়ালেন; দেখ্‌লেন সঙ্গীরা সকলে নিদ্রামগ্ন। তিনি পলায়ন করলেন।

ভেবেছিলেন, দেশে ফিরে কোন একটা বড় কাজ করবেন। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে জুটল সঙ্গীত বিদ্যাদানের কাজ। তাতে সামান্য কিছু আয় হতে লাগ্‌ল। ফলে দারিদ্র্যও ঘুচল না, উচ্চাকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হ'ল না। কিন্তু সন্ধ্যার পর তিনি এক মুহূর্ত্তও বাইরে কোথাও কাটাতেন না; ছুটে বাড়ী আস্‌তেন এবং আকাশের নক্ষত্রগুলির দিকে তাকিয়ে বসে থাক্‌তেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হত, সন্ধ্যা হলেই নক্ষত্রলোক যেন তাঁকে পরম স্নেহ ভরে ডাক্‌ত। তিনি সে ডাক উপেক্ষা করতে পারতেন না।

এই ভাবে কিছুদিন যায়। হার্‌সেল্ দেখ্‌লেন, সঙ্গীতবিদ্যা ভাল করে আয়ত্ত করতে হলে, অঙ্কশাস্ত্রেও গভীর জ্ঞানের দরকার। তিনি অঙ্কশাস্ত্রের নানা শাখার চর্চ্চা করতে লাগলেন। আবার, ঐ সঙ্গে দূরবীক্ষণ দিয়ে নক্ষত্রলোকটা দেখবার ইচ্ছা তাঁর মনে প্রবল হল। দূরবীক্ষণের সাহায্যে নক্ষত্রলোকের অনেক রহস্যের সমাধান হয়েছে। খালি চোখে যে নক্ষত্রকে মনে হয় একটি,

দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়, সেখানে দুটি, তিনটি বা চারটি নক্ষত্র রয়েছে। হার্‌সেল্ দূরবীক্ষণ কেনবার জন্যে দোকানে গিয়ে তার দাম যা শুনলেন, তাতে কেনার আর আশা রইল না। অত টাকা তাঁর কোথায়? তিনি বেতন পান সামান্য। কিন্তু তাতেও নিরুৎসাহ হলেন না। নিজেই বাড়ীতে কাচ ঘষে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করতে লেগে গেলেন। এতে যে কি পরিমাণ পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও অঙ্কশাস্ত্রে জ্ঞান থাকা দরকার, তা ধারণা করা সুকঠিন। কিন্তু ভাগ্য উদ্যোগী পুরুষের কপালেই জয়টীকা পরিয়ে দেন। হার্‌সেলের এই সব কাজে প্রধান সহায় হলেন, ক্যারোলিন।

মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকে জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চ্চা করে আস্‌ছে। নক্ষত্রগুলি অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের সুপরিচিত। আর্য্যরা যে নক্ষত্রটিকে সরস্বতী বা সিন্ধু নদীর চঞ্চল স্রোত ধারায় ছায়া ফেলে আকাশ প্রান্তে বা মধ্য আকাশে প্রস্ফুটিত দেখ্‌তেন, যেটিকে আকাশের বিশেষ একটি স্থানে দেখে দেশও দেশান্তরে যাত্রা করতেন আমরাও আজ সে নক্ষত্রটিকে দেখি ও তাঁদেরই দেওয়া নামে তাকে ডাকি। তপোবন প্রান্তে যে তারাটিকে কখনও রাত্রিশেষে, কখনও দিনান্তে উদিত দেখে আর্য্যঋষিরা ধ্যান বা বিশ্রাম করতেন, সেটি আজও আকাশে উঠছে। তাঁদের ও আমাদের মাঝ দিয়ে বহু শতাব্দী চলে গেছে, বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে। হার্‌সেলের সময় পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ জান্‌তেন মাত্র ছয়টি গ্রহ তাদের উপগ্রহগুলি নিয়ে সৌরজগতের পথে ছুট্‌ছে। শনি গ্রহ অবধিই বুঝি আমাদের সৌর জগতের সীমা।

এদিকে হার্‌সেলের বহু পরিশ্রমের ফলে সাড়ে ছয় ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত সাতফুট দীর্ঘ একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী হল। দুই ভাই বোনের মনে সাফল্যের সে কি আনন্দ! তাঁরা আকাশখানাকে এবার তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগ্‌লেন! দারুণ শীত, চারধারে তুষার রাশি তবুও দুই ভাইবোনের শ্রান্তি নেই। আকাশের

মরণ জয়ী
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

নক্ষত্রপুঞ্জ যেন তাঁদের আলোকবন্ধনীতে বেঁধেছিল—তাঁরা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে সারা রাত আকাশখানা দেখ্‌ছেন! শেষে একদিন হার্‌সেলের দৃষ্টিপথে একটি নূতন নক্ষত্র দেখা দিল। তার আলোক স্থির এবং আকারেও সেটি বড়। নক্ষত্রটিকে আকাশের সেইখানটিতে দেখে হার্‌সেল্‌ বিস্মিত হলেন। প্রথমে মনে করলেন, ধূমকেতু। ধূমকেতু সূর্য্যের কাছ থেকে যখন দূরে থাকে তখন তার লেজ থাকে না। সূর্য্যের যত কাছে আসে, তার লেজ তত বাড়ে।

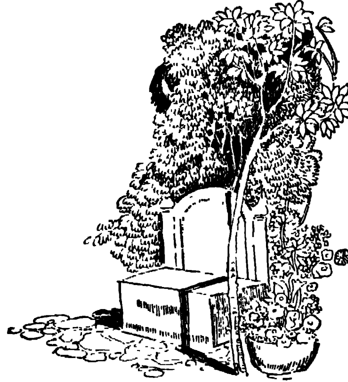
যাহোক, নক্ষত্রটিকে বেশ ভাল করে নিরীক্ষণ করে, তিনি তার কথা সকলকে জানালেন। কিন্তু তাঁর কথায় বিশ্বাস করবে কে? তিনি একজন সামান্য লোকমাত্র—ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি, উচ্চশিক্ষা কিছুই ত তাঁর নেই। তার ওপর এটা একটা অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। পৃথিবীর নানা দেশে, এমন কি ইংলণ্ডেও তখন পণ্ডিতের অভাব নেই। তাঁরা যা পারলেন না, হার্‌সেল্‌ একজন সামান্য লোক হয়ে তা কি করে পারবেন? কিন্তু হার্‌সেল্‌ যখন পণ্ডিতদের নিজের সেই দূরবীক্ষণ দিয়ে জ্যোতিষ্কটিকে দেখিয়ে দিলেন, তখন সকলে বুঝ্‌লেন তাঁর কথাই ঠিক। তাঁরা একথাও স্বীকার করলেন, হার্‌সেল্‌ যথার্থ একজন অসাধারণ জ্ঞানী তপস্বী। তবে তিনি যেটাকে ধূমকেতু বল্‌ছেন, সেটা ধূমকেতু নয়, সৌরজগতের আর একটি গ্রহ।

তখন ইংলণ্ডে রাজা তৃতীয় জর্জ্জ রাজত্ব করছেন। তাঁর কাছে ও পৃথিবীর দিকে দিকে পণ্ডিত সমাজে এ কথা রাষ্ট্র হল। সকলে জান্‌লেন, ঋষি হার্‌সেল্‌ কঠোর সাধনায় একটি গ্রহের দেখা পেয়েছেন। রাজা তাঁকে ও ক্যারোলিনকে রাজ-সম্মান দিলেন; তাঁরা প্রচুর পুরস্কার ত পেলেনই, সেইদিন থেকে হার্‌সেল্‌ হলেন, রাজজ্যোতিষী। তারপর পণ্ডিতদের সভা করে, ঐ গ্রহটির নাম দেওয়া হল, ইউরেনাস।

মরণ জয়ী

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

হার্‌সেল্‌ জ্যোতিষ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেছিলেন। অনেক নূতন কথা তিনি বলে গেছেন ; নক্ষত্রলোকে তিনি অনেক সৌরজগতের ইঙ্গিত পেয়েছেন। কিন্তু এ সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছে তাঁর কঠোর সাধনা ও প্রবল জ্ঞানপিপাসা। এ দুয়ের ফলেই তিনি নক্ষত্রলোকের মতই পণ্ডিত সমাজে চিরদিন অমর ও উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।





একটি আবিষ্কারের গল্প

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

প্রায় এক শ' বছর আগেকার কথা বলিতেছি। স্কট্‌ল্যাণ্ডের একটি ছোট গ্রামে ছোট একটি পাঁউরুটীর দোকান; দোকানে লোকজন নাই, শুধু এক কোণে ছোট একটি ছেলে টুলের উপর বসিয়া অতি নিবিষ্ট মনে কি যেন পড়িয়া চলিয়াছে। সম্মুখে রাস্তার উপর তারই সমবয়সী আর কয়েকটি ছেলে মহানন্দে খেলা করিতেছে, পাড়া কাঁপাইয়া চীৎকার করিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া তাদের অট্টহাসিতে দোকান শুদ্ধ তোলপাড় হইবার গতিক; কিন্তু দোকানের ছেলেটির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে আপন মনে বইএর মধ্যেই ডুবিয়া আছে।

একজন লোক রুটী কিনিতে দোকানে ঢুকিল, ছেলেটি বই রাখিয়া রুটী বাহির করিয়া দিল। লোকটি চলিয়া যাইতেই আবার সেই কল্পরাজ্য। রাস্তার একটি ছেলে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "সিম্‌সন্‌, তোর পড়া শেষ হ'ল? আমাদের

খেলা যে জমছে না ভাই!" দোকানের ছেলেটি, তার নাম জেম্‌স্‌ সিম্‌সন্‌ (James Simpson) মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিল, কহিল, "এই—এই টুকু সেরে নিয়েই যাচ্ছি।" পরমুহূর্ত্তে আবার সে তার ভাবরাজ্যে ডুবিয়া গেল। সঙ্গীরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল। সিম্‌সন্‌কে না হইলে তাদের কোন খেলাই জমে না। ছেলেটা যেন যাদু জানে—এমন হাসাইতে পারে, এমন মিষ্টি ব্যবহার, খেলাধূলায়ও সকলের চেয়ে ওস্তাদ্‌, দুষ্টামীতেও কাহারও চেয়ে কম নয়, অথচ ঐ কেমন একটা স্বভাব, একেবারে বইএর পোকা—বই পাইল তো আহার-নিদ্রা জ্ঞান নাই! তা'ও কি তোমার-আমার মত গল্পের বই? দুনিয়ার যত বিদ্‌ঘুটে বিদ্‌ঘুটে রস-কষ-হীন বই—সব তার পড়া চাই।

আরও কয়েক বছর পরের কথা! এডিন্‌বরা সহরে একজন বড় ডাক্তার স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েক দিন যাবত বক্তৃতা দিতেছেন। বিষয়টি খুব সরস নয়—ডাক্তার ছাড়া অন্য লোকদের বিশেষ ভাল লাগিবারও কথা নয়; তাই কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছাড়া অন্য কোন শ্রোতা আর সেখানে জোটে নাই। কিন্তু বক্তৃতা আরম্ভ হইবার সময়ে দেখা গেল ঘরের এক কোণে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত রুটীওয়ালা ছেলেটি আসিয়া জুটিয়াছে (যদিও সে মোটেই ডাক্তার নয়, মেডিক্যাল কলেজে পড়েও না) এবং সকলের চেয়ে উদ্‌গ্রীব হইয়া বক্তৃতাগুলি যেন গিলিতেছে।

বক্তৃতা শেষ হইলে ছেলেটি তার দু'টি বন্ধুর সঙ্গে (তারা দু'জনেই মেডিক্যাল্‌ কলেজের ছাত্র) বাহির হইয়া আসিল। তার মুখ-চোখে তখন দৃঢ় সংকল্প ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে তার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে।

ছেলেকে ডাক্তারী পড়াইবার মত অবস্থা—বিশেষতঃ এডিনবরার মত ব্যয়বহুল জায়গায়—সিম্‌সনের বাবার ছিল না। কিন্তু সিম্‌সন্‌ তাহাতে দমিলেন না, অদ্ভুত রকম ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া, তরুণ বয়সের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা

করিয়া তিনি ডাক্তারী পড়িতে লাগিলেন, অবসর সময়ে সংসারে সাহায্য করিতেও ত্রুটী করিলেন না। তার পর যথাকালে ডিগ্রী লইয়া ডাক্তারী স্থরু করিলেন।

কিন্তু ডাক্তারী ব্যবসার স্থরুতেই এক বিষম গোলমাল বাধিল। এখনকার ডাক্তারী আর তখনকার ডাক্তারীতে ছিল আকাশ পাতাল তফাৎ। চিকিৎসার ধরণটা ছিল যেমন কাঁচা, ডাক্তারেরাও ছিলেন তেমনি। তাঁরা শুধু চিনিতেন টাকা—রোগীর স্থখস্থবিধার দিকে—রোগযন্ত্রণার দিকে তাঁরা ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, বিশেষতঃ অস্ত্র-চিকিৎসার ব্যাপারে। সিম্‌সন্ দেখিলেন, যে বীরপুরুষ যোদ্ধা নিঃসঙ্কোচে কামানের সামনে বুক পাতিয়া দেয়, অস্ত্র চিকিৎসার সময়ে ডাক্তারের হাতে ছুরি দেখিয়া তারও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। ব্যাপারটা তো নেহাৎ সহজ নয়! একে তো রোগের যন্ত্রণা, তার উপর ডাক্তার নির্ব্বিকার চিত্তে যেখানে সেখানে ছুরি বসাইয়া দিবে,—হয়তো বা একটা ঠ্যাংই এম্পুটো করিয়া দিল! একটা জ্যান্ত মানুষের পক্ষে ব্যাপারটা নেহাৎ তাচ্ছীল্য করিবার মত নয় তো? তারপর ক'মাস যে বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইবে তারও ঠিক নাই। রোগীর যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কোমল প্রাণ সিম্‌সনের বুকে বড় ব্যথা লাগিল। তিনি ভাবিলেন, 'দূর ছাই' এ বিশ্রী ব্যবসা আমার পোষাইবে না, আমি ডাক্তারী ছাড়িয়া অন্য কিছু ধরিব।'

কিন্তু কিছুদিন পরেই সিম্‌সনের মত বদ্‌লাইল। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন তিনি ডাক্তারী ছাড়িলেও রোগীদের রোগ-যন্ত্রণা এতটুকু কমিবে না, শুধু তাঁর চোখে পড়িবে না এই যা, তার চেয়ে তিনি যদি এমন কিছু করিয়া যাইতে পারেন যার ফলে রোগীর যন্ত্রণার কিছু মাত্র লাঘব হয়, তা' হইলে একটা কাজের মত কাজ করা হইবে। তা' কি তিনি পারিবেন না? দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সিম্‌সন্ কাজে নামিলেন।

একটি আবিষ্কারের গল্প

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

এইখানে আর কিছু দিন আগেকার একটা ঘটনার কথা বলা দরকার। সেটা ইংরাজী ১৮৮০ সন। ইংলণ্ডে তখন স্যর্ হামফ্রী ডেভি নামে এক মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক নানা রকম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতেছিলেন। ডেভি 'নাইট্রাস্ অক্সাইড্' নামে এক রকম গ্যাস্ লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন; এই গ্যাস্ নাক দিয়া শুঁকিলে ঘাড়ের কাছে কেমন একটা সুড়সুড়ি ভাব আসে তাই একে বলা হয় 'লাফিং গ্যাস্'। ডেভি দেখিলেন, এই গ্যাস্ যে শুধু লোক হাসাইতে পারে তা' নয়, এর খানিকটা ভাল করিয়া শুঁকাইয়া দিতে পারিলে মানুষকে খানিক ক্ষণের জন্য বে-হুঁস করিয়া রাখা যায়। ডেভি নিজে ডাক্তার ছিলেন না, কাজেই ডাক্তারীতে এ ব্যাপারটিকে কাজে লাগাইবার কথা তখন কাহারও মনে আসে নাই। কিন্তু প্রায় বছর কুড়ি পরে একজন আমেরিকান্ ডেণ্টিষ্ট্ (দাঁতের ডাক্তার) ডেভির এ আবিষ্কারটি কাজে লাগাইলেন। তিনি দাঁত তুলিবার সময়ে রোগীকে লাফিং গ্যাস্ দিয়া বে-হুঁস করিয়া দাঁত তুলিতে সুরু করিলেন—ফলে দাঁত তোলার বেদনা হইতে রোগী আশ্চর্য্য রকম আরাম পাইতে লাগিল। তার কিছু দিন পরে উইলিয়াম্ মর্টন্ নামে আর একজন আমেরিকার ডাক্তার দেখাইলেন, নাইট্রাস্ অক্সাইডের বদলে দাঁতের গোড়ায় 'ইথার' নামে একটা রাসায়নিক ওষুধ (বেতারে যে ইথারের কথা শোনা যায় তা নয় কিন্তু) লাগাইয়া দিলে ফল আরও ভাল পাওয়া যায়—রোগী একদম্ বেদনা বোধ করে না।

উইলিয়াম্ মর্টনের এ আবিষ্কারের কথা সিম্সনের কানে আসিল। সিম্সন্ এই রকমই একটা কিছু চাহিতেছিলেন। মর্টনের এ সাফল্যের কথা শুনিয়া তাঁর আশা শত গুণ বৃদ্ধি পাইল। মর্টনের আবিষ্কার খুবই বড় দরের সন্দেহ নাই কিন্তু সিম্সনের চাই আরও শক্তিশালী ওষুধ। বড় বড় অস্ত্রোপচারের সময়েই রোগীর কষ্ট হয় বেশী, এমন একটা কিছু চাই যা দীর্ঘকাল ধরিয়া রোগীকে সকল দুঃখ-কষ্টের অতীত করিয়া রাখিবে।

একটি আবিষ্কারের গল্প

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

ডাক্তারীতে সিম্‌সনের তখন দারুণ পশার, হাতে একেবারে সময় নাই; রোগীর আত্মীয়স্বজন বাড়ীতে 'হত্যা' দিয়া পড়িয়া থাকে, তাদের সঙ্গে না গেলেও চলে না। কিন্তু সিম্‌সন্ তাহাতেও দমিলেন না; দুপুর রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া তিনি তাঁর পুঁথি-পত্র আর ওযুধ-বিষুধ লইয়া বসিতেন, তারপর চলিত পরীক্ষার পর পরীক্ষা। তাঁর কয়েকটি বন্ধুও মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁর কাজে যোগ দিত।



বড় বড় ওযুধের দোকানে সিম্‌সনের বলা ছিল, নতুন কোন তীব্র ওষুধ আসিলেই যেন তাঁকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নতুন ওষুধ আসিলেই তিনি তা লইয়া নিজের উপর পরীক্ষা করিতেন। ব্যাপারটাকে নেহাৎ সহজ বলিয়া মনে করিও না—দস্তুর মত মারাত্মক পরীক্ষা। একবার তো একটুর জন্য তিনি প্রাণই হারাইতে বসিয়াছিলেন। এক বন্ধুর বাড়ীতে একটা অত্যন্ত উগ্র ওষুধের খোঁজ

পাইয়া সিম্‌সন্ ছুটিলেন বন্ধুর বাড়ী, তখনই সে ওষুধ তিনি শুঁকিয়া দেখিবেন। ওষুধের চেহারা দেখিয়া বন্ধুটির কেমন সন্দেহ হইল, তিনি সিম্‌সনকে কিছুতেই সে ওষুধ শুঁকিতে দিবেন না, সিম্‌সনও নাছোড়বান্দা। শেষে বন্ধুটি বলিলেন, "আচ্ছা, একটা খরগোসের উপর পরীক্ষা করে দেখ, তার পর না হয় নিজের ওপর ক'র।" খরগোসের নাকের কাছে সে ওষুধ ধরিতেই হতভাগ্যের প্রাণহীন দেহ মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

অবশেষে একদিন এক ওষুধওয়ালা সিম্‌সনকে এক শিশি নতুন ওষুধ পাঠাইল,—ওষুধটির চেহারা দেখিয়া কোন রকম আশার উদ্রেক হয় না, কেমন যেন মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ! যাই হোক্, সিম্‌সন্ তাঁর অভ্যাস মত সে রাত্রেও তাঁর দু'টি বন্ধুকে লইয়া টেবিলের পাশে গিয়া বসিলেন—নতুন ওষুধটা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। গল্প করিতে করিতে তিন জনে ওষুধটা শুঁকিতে লাগিলেন, প্রথমটা মনে বেশ স্ফূর্ত্তি আসিল, কিন্তু একটু পরেই তাঁদের শরীর কেমন অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল, তারপর আর কোনও সাড়া-শব্দ নাই—সব চুপ্।

বাড়ীর লোকেরা আসিয়া দেখে তিন বন্ধু টেবিলের নীচে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন, কাহারো দেহে প্রাণ আছে কিনা কে জানে? বাড়ীর এক বুড়ী ঝি তো চীৎকার করিয়া কান্নাই স্রুরু করিয়া দিল—আর সকলেও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল। এমন সময়, হঠাৎ দেখা গেল সিম্‌সন্ উঠিয়া বসিয়াছেন, মুখ-চোখ তার আনন্দে ফাটিয়া পড়িতেছে, তিনি পাশের তখনও-অচেতন বন্ধুদের ঠেলিয়া বলিতেছেন, "আরে, এ যে ইথারের চাইতেও অনেক ভাল!" ওষুধটির নাম ক্লোরোফর্ম্ম।"

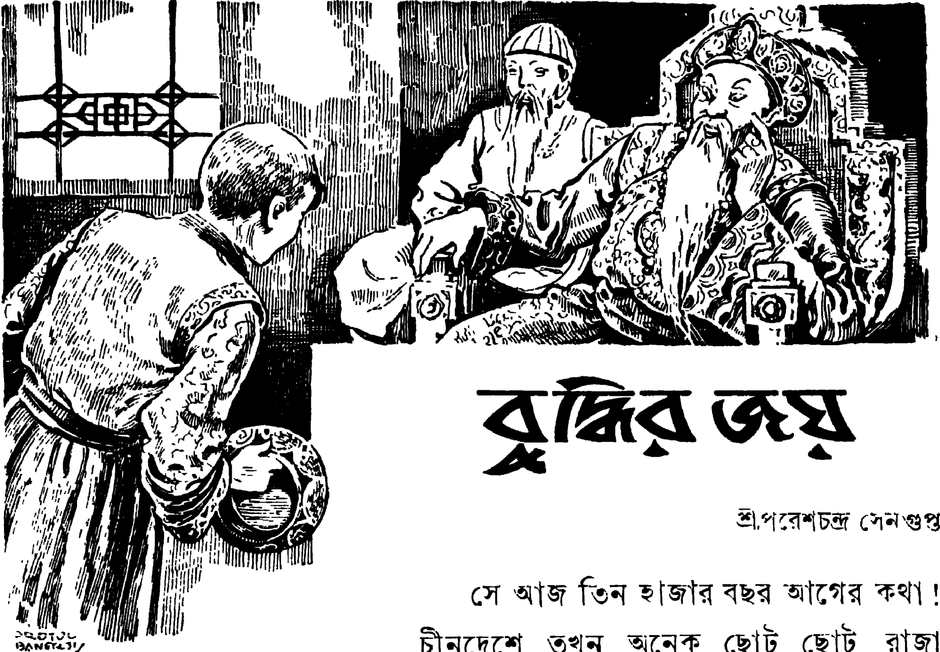
ক্লোরোফর্ম্মের নাম তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই অজানা নয়। বড় বড় অস্ত্রোপচারের সময়ে রোগীকে ক্লোরোফর্ম্ম্ দিয়া অজ্ঞান করিয়া লইয়া তবে অস্ত্র ব্যবহার করা হয় এ কথাও তোমরা জান। এই ক্লোরোফর্ম্মের কৃপায় রোগী

অস্ত্র করিবার সময়ে অসহ্য যন্ত্রণার কিছুই টের পায় না, নির্ব্বিকার চিত্তে ডাক্তারের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে। রোগীর দুঃখময় জীবনে ক্লোরোফর্ম্ম্ ভগবানের আশীর্ব্বাদ ; এ আশীর্ব্বাদ আমাদের আনিয়া দিয়াছেন সিম্‌সন্।

দুষ্ট, হিংসুক লোকের কোন কালেই অভাব নাই,—দু'-চার জন লোক ক্লোরোফর্ম্মের আবিষ্কার লইয়াও আপত্তি তুলিতে ছাড়ে নাই। কেউ কেউ বলিয়াছিল, "বেদনা, যন্ত্রণা এ সব ভগবানের দেওয়া—তাঁরই ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসিয়াছে ; তার বিরুদ্ধে যাওয়াটা ভগবানকে অমান্য করা ছাড়া আর কিছুই নয়।" কি রকম হাস্যকর যুক্তি বল তো ? কিন্তু এ শ্রেণীর লোক পৃথিবীতে বেশী থাকে না, তাই রক্ষা।

সিম্‌সন্ আজ বাঁচিয়া নাই। তাঁর ভক্তেরা লণ্ডনের বিখ্যাত ওয়েষ্ট্‌মিন্‌ষ্টার য়্যাবির এক কোণে বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তাঁরও একটা স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া দিয়াছে ; কিন্তু তাঁর আসল স্মৃতিচিহ্ন ক্লোরোফর্ম্মের রূপ ধরিয়া চিরকাল মানুষের দুঃখ মোচন করিয়া আসিতেছে। এমনটা না হইলে আর মানুষ ?





বুদ্ধির জয়

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

সে আজ তিন হাজার বছর আগের কথা! চীনদেশে তখন অনেক ছোট ছোট রাজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন।

চুং ফো-ও ছিলেন এমনই একজন স্বাধীন রাজা। ছোট রাজা, ছোট তাঁর রাজ্য! কিন্তু তাঁর সুশাসনে প্রজাদের কোন দুঃখকষ্ট ছিল না। প্রজারা যেমন রাজাকে ভালোবাসতেন, রাজাও তেম্‌নি প্রজাদের সুখশান্তির জন্য দিন রাত

কিন্তু রাজ্যের এ সুখশান্তি বেশীদিন রইল না। এর উপর চীন সম্রাটের নজর পড়তেই তিনি এর স্বাধীনতাটুকু হরণ করবার সঙ্কল্প করলেন। শেষে একদিন সম্রাটের একদল সৈন্য এসে ছোট রাজ্যটীতে হানা দিলে।

চুং ফো-ও দেখলেন, মহা বিপদ! একদিকে দেশের স্বাধীনতা, আর একদিকে যুদ্ধ বিগ্রহে প্রজাদের ধনপ্রাণ নাশ!

অম্‌নি মন্ত্রী সেনাপতি সকলকে নিয়ে তিনি মন্ত্রণাসভা বসালেন। সে সভায়

বুদ্ধির জয়

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

কি স্থির হ'ল তারাই জানেন। দেখা গেল, সম্রাটের সৈন্য হাঁকডাক বন্ধ ক'রে দিন-কয়েকের জন্য চুপ ক'রে গেল, আর এদিকে চুং ফোর হাতীশালার সব চেয়ে বড় হাতীটি নিয়ে এক দূত চীন সম্রাটের রাজধানীর দিকে রওনা হ'ল।

যথা সময়ে দূত সম্রাটের রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। রাজসভার দোর-গোড়ায় হাতীটি বেঁধে রেখে সে সম্রাট্‌কে আভূমি নমস্কার ক'রে তাঁর হাতে একখানা চিঠি দিলে।

চিঠিতে লেখা ছিল, রাজা চুং ফো চীন সম্রাটের নিকট একটা হাতী পাঠাচ্ছেন, এটাকে জ্যান্ত রেখে তিনি যদি একদিনের মধ্যেই এর ঠিক ঠিক ওজন বলতে পারেন, তবে রাজা বিনা যুদ্ধেই সম্রাটের অধীনতা মেনে নেবেন। কিন্তু সম্রাট্‌ যদি তা' না পারেন, তবে যেন তিনি দয়া করে তাঁর সমস্ত সৈন্য-সামন্ত ফিরিয়ে আনেন এবং আর কোনদিন যেন চুং ফোর রাজ্যের দিকে পা না বাড়ান।

চিঠি পড়েই সম্রাট্‌ রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। অমনি দূতের মাথা কাটবার হুকুম হ'ল।

দূতটি ছিল বুদ্ধিমান্‌। তাই সম্রাটের হুকুমে ঘাব্‌ড়ে না গিয়ে সবিনয়ে বল্লে, "মহারাজ! আমার মাথা কাটা এমন আর শক্ত কি! সে ত' তলোয়ারের এক কোপের ব্যাপার। কিন্তু তাতে ত' প্রশ্নের মীমাংসা হবে না! তা' ছাড়া দেশের সবাই জানবে, আপনার এই বিরাট রাজ্যে এমন একটা লোক'ও নেই, যিনি রাজ্যের মুখরক্ষা করতে পারেন।"

কথাটা সম্রাটের মনে খুবই লাগলো। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীকে হুকুম দিলেন, যেমন করেই হোক্‌ সেদিনের মধ্যেই হাতীটির ওজন বার করা চাই!

রাজার হুকুম শুনে ত' মন্ত্রীর একবারে চক্ষু স্থির! কি ক'রে যে হাতীর মত এমন একটা বিরাট জিনিষের ওজন হতে পারে তা' তাঁদের মাথায়ই এল না। প্রধান মন্ত্রী চাইলেন ছোট মন্ত্রীর মুখের দিকে, ছোট মন্ত্রী তাকালেন সভা-পণ্ডিতের

মুখের দিকে, সভা-পণ্ডিত মাথা চুলকোতে চুলকোতে আবার আর একজনের দিকে তাকালেন। এম্‌নি মাথা চুলকানি আর মুখ চাওয়াচাওয়ি-ই সার হ'ল।

শেষে প্রধান মন্ত্রী সাহসে ভর ক'রে সম্রাটকে জানালেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে এর ওজন বার করা অসম্ভব। কারণ হাতীর মত একটা বিরাট জীবকে পাল্লায় চড়িয়ে ওজন করবার মত নিক্তি তৈরী করতেই এক সপ্তাহ কেটে যাবে। দাড়ি পাল্লা ছাড়া ত' আর ওজন করা চলে না!

মন্ত্রী সম্রাটকে আরও বুঝালেন, এ যে অসম্ভব তা' রাজা চুং ফো-ও জানেন। তাই তিনি কৌশলে সম্রাট্‌কে ধোকা দিয়ে নিজের স্বাধীনতাটুকু বজায় রাখবার ফন্দি এঁটেছেন!

রাজা মহারাজার মন! উজির মন্ত্রীরা যা' বুঝান, তাই বুঝেন। সম্রাট্‌ বুঝলেন, এ অসম্ভব। কেউ কোনদিন এ অসম্ভব সম্ভব করতে পারেনি, কোন দিন পারবেও না।

তাই তিনি রাজা চুং ফোর দূতকে বল্লেন, "হাতীটি রইল। তোমার রাজাকে বলো, চালাকি করবার জায়গা এ নয়। তিনি এসে যদি হাতীর ওজন বার না করতে পারেন, তবে তাঁর যে দশা হবে, সে আমার মনেই রইল।"

দূত সম্রাট্‌কে অভিবাদন করে স্বরাজ্যে ফিরে গেল।

দূতের মুখে সম্রাটের আদেশ শুনে রাজা চুং ফোর ত' চক্ষু স্থির! তাঁর নিজের জালেই যে তাঁকে এমন ভাবে আটকা পড়তে হবে, তা' ত' আর তিনি আগে ভেবে দেখেন নি!

অম্‌নি যত দোষ গিয়ে পড়ল মন্ত্রীর ঘাড়ে! তাঁর বুদ্ধিতেই হাতী পাঠানো হয়েছে! এখন উপায়? মন্ত্রীও হতাশ হয়ে মাথা চুলকাতে লাগলেন।

বুদ্ধির জয়

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

চুং ফো-ও রেগে টং হয়ে হুকুম দিলেন, হাতীর ওজন বার করবার উপায় ঠাউরাতে না পারলে মন্ত্রীর মাথা আর তাঁর কাঁধে থাকবে না।

রাজার আদেশ শুনে মন্ত্রী সারা পথ শুধু ভাবতে ভাবতেই বাড়ী ফিরলেন। তাঁর উদ্বেগ মলিন চোখমুখ দেখে বাড়ীর সবাই একটা ভীষণ বিপদের আশঙ্কা করতে লাগলেন। অথচ কি যে ঘটেছে, ভরসা ক'রে তা' জিজ্ঞেস করতেও সাহস পেলেন না।

খান্ লো ছিল মন্ত্রীর একমাত্র ছেলে। বয়স ছিল মাত্র বারো। কিন্তু এই বয়সেই তার বুদ্ধির ধার দেখে সবাই তাকে ভালোবাসত। মন্ত্রীর ত' ছিল একেবারে চোখের মণি!

দুপুর গড়িয়ে যায়, অথচ বাপের নাওয়া খাওয়ার নাম নেই, রাজসভা থেকে ফিরে অবধি কেবলই কি ভাবছেন, দেখে খান্ লো ধীরে ধীরে তার পাশটীতে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর তাঁর কাঁচা-পাকা চুলগুলোর ভেতর তার কচি কচি আঙুল বুলোতে বুলোতে আব্দারের সুরে জিজ্ঞেস করলে, "এত কি ভাবছো বাবা?"

মন্ত্রী জানতেন, তাঁর সমস্যার কথা ছেলেকে বলে কোন লাভই নেই; [illegible]ও তাকে খুব ভালোবাসতেন বলে' একে একে সব কথাই [illegible] বল্লেন

বাপের কথা শুনে খান্ লো মিনিটখানেক চুপ করে [illegible] তার [illegible] ধীরে ধীরে বল্লে, "এ আর এমন কি শক্ত কাজ বাবা! তুমি নি[illegible] আমি হাতীর ওজন বার করব।"

খান্ লোর ছেলেমানুষের মত উত্তর শুনে মন্ত্রী শুধু একটুখানি হাসলেন। ভাবলেন, ছেলেমানুষ এ বিপদের গুরুত্ব কিইবা বুঝবে!

বুদ্ধিমান্ খান্ লো বাপের মনোভাব বুঝতে পেরে বল্লে, "সত্যি বলছি বাবা, হাতীর ওজন আমি বার করবই। এ জন্য তুমি ভেবোনা।"

মন্ত্রী জিজ্ঞাসু নেত্রে ছেলের মুখের দিকে চাইতেই খান্ লো আব্দারের সুরে



বল্লে, "এখন কিস্‌সু জিজ্ঞেস করতে পারবে না বাবা। হাতীর ওজন বার ক'রে সম্রাটের কাছ থেকে যেদিন এ দেশের স্বাধীনতার পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'রে আসব, সেদিন সবই শুনবে!"

পরদিন খান্ লো বাপের সহিত রাজসভায় উপস্থিত হ'ল। মন্ত্রীর মুখে বালকের অভিপ্রায় শুনে চুং ফো ত' হেসেই অস্থির। বারো বছরের ছেলে, সে করবে এই জটিল সমস্যার সমাধান!

কিন্তু খান্ লো নাছোড়বান্দা। কাজেই রাজা বাধ্য হয়েই তাকে চীনদেশে যাবার অনুমতি দিলেন।

খান্ লো দূতের সহিত চীন সম্রাটের রাজধানী অভিমুখে রওনা হ'ল।

এতটুকু ছেলে করবে হাতীর ওজন! চীন সম্রাট্ খান্ লো-কে দেখেই রেগে একবারে অগ্নিশর্ম্মা! বল্লেন, "ঠাট্টা করবার আর জায়গা পেলেনা! বেশ দেখা যাক্, পারোত' ভাল, নইলে রাজা চুং ফো-ও এর উপযুক্ত শিক্ষাই পাবেন।"

সম্রাটের কথায় খান্ লোর মুখে শুধু একটু হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

সে হাসিতে সম্রাট আরও জ্বলে উঠলেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, "বেশ! দেখা যাবে তোমার বুদ্ধির দৌড়। এজন্য তোমার কি কি চাই বলো।"

"আমার তিনটী প্রার্থনা সম্রাট্।"

"বলো!"

"প্রথমে চাই একখানা বড় নৌকো।"

"বেশ! তোমার দ্বিতীয় প্রার্থনা।"

"আর চাই সমান ওজনের কয়েক হাজার ইট।"

"তোমার তৃতীয় প্রার্থনা কি খান্ লো?"

"অভয় দিন সম্রাট্, যদি আমি হাতীর ওজন বার করতে পারি, তবে আপনি

কোনদিন আমাদের স্বাধীনতা হরণ করবার চেষ্টা করবেন না। শুধু তাই নয়, এ পর্য্যন্ত যাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছেন, তাদেরও আপনি আপনার শৃঙ্খলপাশ থেকে মুক্তি দেবেন !"

ছেলেটির কথা বলবার ভঙ্গীতে সম্রাট্ মুগ্ধ হলেন। তিনি খুসী হয়ে বল্লেন, "তোমায় অভয় দিলাম, খান্ লো। তোমার তিনটী প্রার্থনাই আমি পূর্ণ করবো। নৌকো এবং ইট কাল নদীর ঘাটে প্রস্তুত থাকবে।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে এ কথা রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়লো। পরদিন ভোর হ'তে না হ'তেই রাজ্যের লোক দলে দলে নদীর ঘাটে ভেঙে পড়ল। সবার মনেই গভীর ঔৎসুক্য ! হাতীর মত একটা বিরাট জীবের ওজন করা হবে শুধু একটা নৌকো আর খান-কতক ইটের সাহায্যে ! নিক্তি নেই, ওজন নেই—এ যে কি ক'রে হ'তে পারে সবাই তা' নিয়ে মহা জল্পনা-কল্পনা সুরু করলে।

অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার শেষ হ'ল। একটা প্রকাণ্ড কালো ঘোড়ায় চড়ে খান্ লো ধীরে ধীরে নদীর ঘাটে উপস্থিত হ'ল। তার দু'পাশে দু'জন দেহরক্ষী, পেছনে সেই হাতীটি।

খান্ লো এসেই হুকুম দিলে, হাতীটাকে নৌকোর ওপর তোলা হোক্ ! অনেক কায়দা কানুন, অনেক ধস্তাধস্তি করে ত' সে কাজ সমাপ্ত হ'ল।

হাতীর ভারে নৌকোর কাঠ যতটুকু অবধি জলে ডুব্ ল, খান্ লো খুব সাবধানে সেখানে একটা দাগ কেটে দিলে।

তারপর হাতীকে নৌকো থেকে নাবানো হ'ল। সেও কি সহজ কাজ !

এবার খান্ লো হুকুম দিলে—গুণে গুণে নৌকোয় ইট বোঝাই করা হোক্ !

যারা তামাসা দেখতে এসেছিল, তারা খান্ লোর এই কাণ্ড দেখে বলাবলি সুরু করলে, "হাতীর ওজন বার করবে, না কচু করবে। আসলে ছেলেটার মাথাই খারাপ হয়েছে"...

বুদ্ধির জয়

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

খান্‌লো অবশ্য কারও কোন কথায়ই কান দিলে না। তার চোখ শুধু সেই দাগের ওপর। শেষে ইটের ভারে নৌকোটা যখন সেই দাগ অবধি ডুবে গেল, তখন মজুরদের থামতে হুকুম করে বল্লে, "হাতীর ওজন বার হয়ে গেল সম্রাট্!"

ওজন বার হয়ে গেল! ছোক্‌রা বলে কি!

সম্রাটের মত সবাই খান্‌লোর মুখের দিকে হাঁ' করে চেয়ে রইল। তারা কেউ এ হেঁয়ালির কোন মানেই বুঝে উঠতে পারলে না।

খান্‌লো বিজয়ী বীরের মত সম্রাটের সুমুখে উপস্থিত হয়ে বল্লে, "ব্যাপারটা খুবই সহজ সম্রাট্! আপনি হয়ত লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, হাতীটাকে নৌকোয় তুললে নৌকোটি যতটা অবধি জলে ডুবেছিল, আমি সেখানে একটা দাগ দিয়েছি! তার পর হাতীটাকে নাবিয়ে আবার এমন ভাবে ইট বোঝাই করেছি যাতে নৌকোটা ঠিক আগের দাগ অবধি ডুবে যায়। এতেই বুঝা যায় হাতীর ওজন আর ইটের ওজন সমান। এখন, ইটগুলো সবই সমান ওজনের, ক'খানা ইট বোঝাই হয়েছে সে আমি বোঝাই করবার সাথে সাথেই গুণে গেছি, কাজেই ইটের সংখ্যা দিয়ে একটা ইটের ওজনকে গুণ করলেই হাতীর ওজন বেরিয়ে যাবে।"

মিনিট খানেক থেমে খান্‌লো আবার বল্লে, "ইটগুলো সমান ওজনের না হ'লেও কোন ক্ষতি হ'ত না। শুধু সেগুলোকে এক একখানা ক'রে ওজন করতে হ'ত।"

বিস্মিত সম্রাট্ আনন্দে খান্‌লো-কে বুকে তুলে নিয়ে বল্লেন, "ধন্য তোমার বুদ্ধি! তোমার মত ছেলে যে দেশে জন্মায়, সেখানকার স্বাধীনতা হরণ করা সত্যি শোভা পায় না। এমনি ভাবেই তোমার বুদ্ধির গৌরবে তোমার দেশের মুখ উজ্জ্বল করো, তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করছি।"

বলেই তিনি তাঁর গলা থেকে মহামূল্য মণিহার খুলে খান্‌লোর গলায় পরিয়ে দিলেন।

দর্শকদের মধ্যে আনন্দ ধ্বনি উঠ্‌ল।

এম্‌নি ক'রে একটী বারো বছরের ছেলে শুধু বুদ্ধির জোরে স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখলে!



তিন হাজার বছর আগে চীন সম্রাটের মনে যে প্রশ্ন জাগেনি, তোমাদের মনে হয়ত সে প্রশ্ন উঠতে পারে।

প্রশ্নটী এই। দু'বারই নৌকোটী একই দাগ অবধি জলে ডুবলো বলে' হাতী আর ইটের ওজন সমান হবে কেন?

এ প্রশ্নের মীমাংসা করেছিলেন আর্কিমিডিস্‌ নামে সাইরাকিউজের একজন বৈজ্ঞানিক। সেও এক চমৎকার গল্প। গল্প বাদ দিয়ে তোমাদিগকে এখানে শুধু বিজ্ঞানের তথ্যটুকুই বলছি।

আর্কিমিডিস্‌ পরীক্ষা করে দেখান, কোন জিনিষ জলে ডুবালে তার ওজন কমে যায়। তোমরা নিজেরাও হয়ত লক্ষ্য ক'রে থাকবে, জলভরা যে কলসীটি

শিশুসাথী (stamp)

একটু নড়াতে গেলেই তোমাদের পরিশ্রম হয়, পুকুরে জলের নীচে সেটাকে অনায়াসেই এখানে ওখানে বয়ে নিতে পারো!

এখন, যে জিনিষটি তুমি জলে ডুবাতে চাও সেটা দু'রকমের হতে পারে— জলের চেয়ে ভারী, অথবা জলের চেয়ে হাল্‌কা।

যেটা জলের চেয়ে ভারী সেটা যে ডুবে যাবে, সে ত' জানা কথা। কিন্তু জলের নীচে তার ওজন কমে যাবে। কতটুকু কমবে? না, ভারী জিনিষটার যা' আয়তন, সেই আয়তনের জলের যা ওজন, ভারী জিনিষটার ওজন জলের নীচে ঠিক ততটুকুই কমবে।

যে জিনিষ জলের চেয়ে হাল্‌কা তা' জলে ভাসবে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে হাল্‌কা জিনিষটার যা' ওজন ঠিক ততটুকু জল স্থানচ্যুত হবে। কথাটা একটু শক্ত হয়ে গেল। একটা উদাহরণ দিয়ে বল্‌লে বোধ হয় বুঝতে সুবিধা হবে।

একটা মেজার গ্লাসের একটা নির্দ্দিষ্ট দাগ অবধি জলে ভর্ত্তি কর। তারপর তার মধ্যে এমন এক টুকরো কাঠ ফেলে দাও যাতে জলের মাথা এক আউন্স বা আধ আউন্স উপরে উঠে যায়। এখন সেই এক আউন্স বা আধ আউন্স জলের ওজন করলে দেখবে, জলের ওজন আর সেই শুক্‌নো কাঠটার ওজন এক।

এ অবধি যদি বুঝে থাক, তবে ইটের ওজন আর হাতীর ওজন এক হ'ল কেন তা' অনায়াসেই বুঝতে পারবে।

দু'বারই নৌকোটা একই দাগ অবধি জলে ডুবেছিল। তার মানে দু'বারেই একই পরিমাণ জল স্থানচ্যুত হয়েছিল। কাজেই সেই স্থানচ্যুত জলের ওজন দু'বারেই একই হবে। ফলে হাতীর ওজন আর ইটের ওজন ঠিক সমানই হবে।

শুধু জল নয়, যে কোন তরল জিনিষের মধ্যে কোন ভারী বা হালকা জিনিষ ডুবালে বা ভাসালে এই একই নিয়ম খাটবে।

আর্কিমিডিসের এ আবিষ্কার ইংরেজীতে Archimedes' Principle নামে খ্যাত। এ-দ্বারা ভাসা, ডোবা, আপেক্ষিক গুরুত্ব অর্থাৎ কোন্ জিনিষ জলের তুলনায় কতগুণ ভারী—ইত্যাদি বিজ্ঞানের অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান বার করা হয়েছে।



রূপকথা





শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এক দয়েল।

রাত পোহাতে না পোহাতে দয়েল শিস্ দেয়। মাথায় কালি ঢালা, গায়ে কালি ঢালা, বুকে মাখা দ'য়ের রঙ্, পাখে আঁকা দ'য়ের রঙ্।

নিঝুম জোচ্ছনা আর নিঝুম আঁধার তার গায়ে।

গাছের পাতা দোলে, থামে, পূব-সোনালি আপ্‌নি ঘামে, শির্ শির্ শির্ শির্ ক'রে' ঘাসের কলি, গাছের কলি ফোটে ; ভোর-বিহান চমকে' চায়।

রাজার মালী জাগে।

মালী দেখে, মালঞ্চে ফুল ধরে না।

মালী ফুলবনে যায়। পাতারা ভর সয় না। মালীর ডালা আর বয় না। মালঞ্চের পথে ভোম্‌রার সুর। মালঞ্চে মৌমাছির নূপুর। রঙের শেষে, ঝুলন্ বায়ে, শুয়ে, রোদ, হাসে।

দয়েল উড়ে যায়।

রোদ পিঠে মালী মালা গাঁথে। রাজছত্রে ফুল যোগায়।

পুষ্পবতী

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

দুই

রাজার রাজকন্যা পুষ্পবতী।

সোনার সূঁচ রূপোর সূতো, হাতে, থাকেন রাজকন্যা।

কপালের চন্দনে, টান্ পড়ে।

রাজকন্যা ভাবেন, 'তাই ত, মালীর কেন এত বেলা ?'

ভাবেন রাজকন্যা।

ফুল আসে।

আসে ফুল। ফুলের পাপ্‌ড়ি শুকিয়ে থাকে।

রাজকন্যার মালা গাঁথা হয় না।

আজও হয় না।

কালও হয় না।

সভা ভেঙ্গে, রাজা একদিন এসে, চেয়ে দেখেন, রাণীর আঙনে মালা দোলে না, সোনার কলসের গলা উদল, দীঘির পথে মালার সা'র কৈ ?

রাজকন্যার দুয়ারে ঝালর পাত নড়ে ; মালার ফুল ঝরে না।

রাজা থমকে' দাঁড়ান।

দাসী বলে, "ফুল দেয় মালী, রোদ যখন কাকের ঠোঁটে।"

বাঁদী বলে, "মালী ফুল দেয়, যখন হাঁস শামুক ঘাঁটে।"

রাজকন্যার সখী বলে

"শারী শুক, করে চুপ,

তখন মালী আনে ফুল।"

রাজা ফিরে যান।

তিন

মালী আর কোটাল।

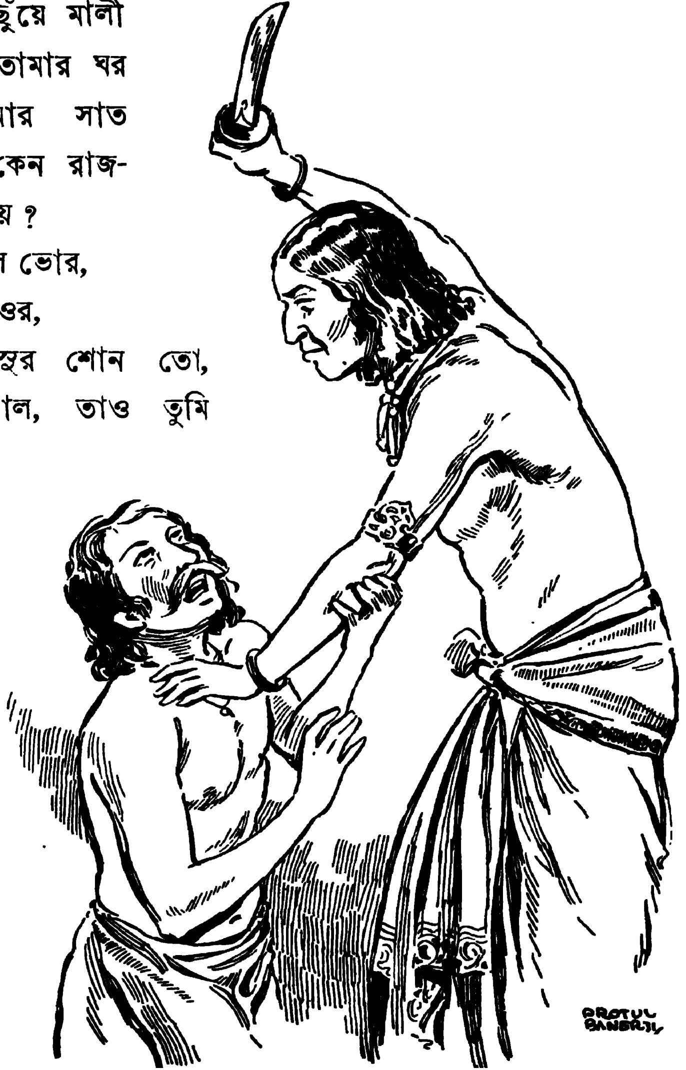
পুষ্পবতী

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

মন্দিরের কবাট ছুঁয়ে মালী বলে, "কোটাল, তোমার ঘর তিন পুরুষের, আমার সাত পুরুষের ঘর, তবে কেন রাজ-পুরীতে ফুলের বেলা হয় ?

পাখীর শিসে ভোর,
ফুলের নাই ওর,

কোটাল, সেই সুর শোন তো, তোমার যে তরোয়াল, তাও তুমি নামিয়ে রাখ্‌বে।"



মালীর গর্দ্দান চেপে ধরল কোটাল। উঁচ্‌তে তরোয়াল তার ঝিলিক্‌ দিয়ে উঠ্‌ল।

"শির যায় যা'ক্‌। এই দেবতার দুয়ারে তুমি আমাকে কাট্‌তে তো পারবে না। তার চেয়ে, কোটাল, ভাই, পরখ্‌ কর।"

জিভ কেটে কোটাল, উঁচনো

তরোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিলে। মালীর হাত ধরে' বল্‌লে, "মাপ করো ভাই, মালী।"

"আগে চল, পরখ্ কর।"

"চল।"

তরোয়াল, এগিয়ে কোটাল তুলে নেয়।

চার

ভোরে রাজা জাগেন,

"কে ?"

"ফুল এল না।"

পাখা ঝাড়ে ময়ূরে।

রাণীর আগুনে হাঁটেন।

রাজকন্যার আগুনে হাঁটেন।

ফুল আসে না।

"সে মালী কি এখনো আছে ?"

রাজা জিজ্ঞাসেন।

দাসী, বাঁদী, চর, অনুচর এগিয়ে যায়।

ফুল না। কেউ ফিরে আসে না।

দীঘির কবাট খুলে গেল। দীঘির জলে সোনার রোদ ; মালঞ্চের পথে রোদের ছোপ্। হাঁস সাঁতার কাটে, লোক জন ফিরে আসে। আর কোটাল আর মালী।

উপ্‌ছে' পড়ে মালীর ডালার ফুল।

শুক্‌নো পাপ্‌ড়ি।



শিশুসাথী

রাজার পায়ের কাছে রেখে দিয়ে তরোয়াল, কোটাল বলে, "মহারাজ,

পাখীর শিসে ভোর,

ফুলের নাই ওর,

যে শুন্‌বে সে গান, তারি বেলা হবে। মালীর কি দোষ? ফুলের কি দোষ?"

"কোটাল !!"—

কোটাল বল্‌লে,—"মহারাজ, আমারি বা কি দোষ? সে গান শুন্‌লে, ভয়ে বলি নির্ভয়ে বলি, রাজমুকুট যে মহারাজ, মাটিতে, তারো নাম্‌তে হবে।"

নোয়ানো মাথা কোটালের, রাজার খড়্গে দু'খানা হতে হতেও, হ'ল না।

তবু।

খড়্গ তুলিয়ে রেখে, হাতে, রাজা, চেয়ে রইলেন।

চেয়ে থেকে, থেকে, থেকে বল্‌লেন, "আচ্ছা; শুন্‌ব। সে পাখী পিঞ্জরে রেখে পোষ।"

রাজা সভায় চলে গেলেন।

পাঁচ

পুরী ভেঙ্গে পড়ে। জন, মানুষ, শিকারী, পাখীয়াল, সিপাই, সান্ত্রী, সব কথা শুনে, যায় সবাই পাখী ধর্‌তে,··· —এমন যে, পাখী !

নিশি রাত্রি থেকে সাঁর বুনট জাল ধার বুনট জাল, নানা জাল পেতে বসে আছে, পাহারা জেগে।

শুকতারা নেভে নি, তার আগেই, দেখে, পাখী এসেছে জালে।

গাইছে না।

না ফুট্‌তে ফুল, না বইতে বাতাস, জালে পড়্‌ল টান; পাখী, জড়িয়ে গেল।

গেল।

পূব-সোনালিতে ফুলের মালঞ্চ, কলরবের গঞ্জনায় ছেয়ে রইল!

হল কি?…

…কিন্তু!

কালো জালে পাখীর কালো রঙ্‌ পালক পাখ্‌ খসে' থাক্‌ল; দ'য়ের রঙ্‌ দয়েল উড়ে গেল রোদে ধব্‌ধবে' আকাশ দিয়ে, জাল পালিয়ে!

মুখ খুলে বসে' রইল সব!

রাজপুরীতে ফুল গেল না মোটে।

এক দিন।

দু'দিন।

তিন দিন।

পাঁচ দিনেও না।

ছয়

রাজকন্যার স্বয়ম্বর।

সাত শ' রাজ্যের চৌদ্দশ' রাজপুত্র এসে আছেন রাজপুরীর টল্‌টল্‌ জল দীঘির পর দীঘির ধার জুড়ে কানাৎ ফেলে। তরোয়ালের ঝন্‌ ঝন্‌, বাণের শন্‌ শন্‌, পক্ষিরাজের পাখ্‌সাট্‌ দীঘির জাঙ্গালের ওপারে তর্‌তর্‌ করে।

কিন্তু স্বয়ম্বর হয় না।

ফুল নাই।

রাজা ভাবিত। রাণী ভাবিত। রাজপুত্রেরাও ভাবিত।

"ফুল নাই কেন?"

মন্ত্রী বলেন, "কি জানি মহারাজ!" পাত্র, মিত্র, তন্ত্রী, যন্ত্রী বলেন—"কি জানি, মহারাজ!"

মালী বলে,—"কি জানি মহারাজ!"

রাজা বলেন, "ফুল না থাকে, ফুলের কলি থাকে তো, তাতেই স্বয়ম্বর হবে।"

রাজপুত্রেরাও বলেন,—

"হোক।"

রাজকন্যা সোনার সূঁচ রূপোর সূতো নিয়ে বসে থাকেন, স্বয়ম্বরের মালা গাঁথবেন।

শুনে তিনি বলে পাঠান,

"না।"

লোক যায় ফিরে আসে। জন যায় ফিরে আসে। সিপাই যায় ফিরে আসে।

তা, মালঞ্চে, কলিও পাওয়া যায় না।

সকলে ভাবিত।

রাজা, থমকে' থাক্‌লেন।

রাজা বলেন, "ফুল না পাওয়া যায়, কলি না পাওয়া যায়, মণিমাণিক্যের মালাতে স্বয়ম্বর হবে। রাজভাণ্ডার খোল।

শুনে' রাজকন্যা বলে,

"না।"

রাণী দু'হাত ধরে' বলেন, "মা, এত দেশের রাজপুত্র এসে বসে আছেন, দিন যায়, ক্ষণ যায়, সে কি মা, চল।"

রাজকন্যার হাতের আঙুল নুয়ে পড়্‌ল। সূঁচ সূতো হেলে পড়্‌ল।

মায়ের পায়ে রাজকন্যা প্রণাম রাখ্‌লেন।

চোকের কালো তার গলে' আসে।

রাজকন্যা মুছ্‌লেন।

পুষ্পবতী
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

সোনার সূঁচ রূপোর সূতো তুলে রাখ্‌লেন।
বল্‌লেন, "চল।"

সাত

গম্‌গম্‌ স্বয়ম্বর সভা। ভয়ে কাক চিল উড়ে না।
পল বাজে, দণ্ড বাজে, প্রহর বাজে।
শেষে সব চুপ।
চৌদ্দশ' রাজপুত্রের চোক এক হয় পথের দিকে,
রাজকন্যা আসেন।

রাজকন্যা আসেন, সখীর সা'রে, দাসীর ঘিরে,—যোগী, জ্যোতিষী, ভাট, ব্রাহ্মণ, কুলহিত, পুরোহিত, যন্ত্রী, তন্ত্রী, সান্ত্রী, সিপাই চলে চার কাতারে, সিঁদুর আবীরের পথে, কনকথালা হাতে, জল্‌-মুকুটে আসেন রাজকন্যা, পিছিয়ে এক পা, এগিয়ে তিন পা।

পায়ের পথে খৈ ছিটে।
শ্বেত চাঁদোয়ার চার সা'র, নীল চাঁদোয়ার চার সা'র।
তার এক ফাঁকে, সখীর হাতের দর্পণে ছায়া পড়্‌ল।
চোকের পলক ফেলে, রাজকন্যা মাথা তুলে চান।
দেখেন, বকের ঝাঁক।
দুধের মালা গেঁথে উড়ে যায়
আকাশ দিয়ে।
প'খ পাখী গাঁথে মালা, আর, গাঁথ্‌বে না মানুষে?
মাণিক মণি পাথর, সেই পাথরের মালায়, স্বয়ম্বর হয়?
শ্বাস্‌ পড়্‌ল।

পা তুল্‌তে, ভুল্‌লেন।

বেণী দোলে।

পেছনো পা ফেল্‌তে, পিছে রইল। আর পা এগলো না।

মণির মালার থালা দাসীর হাতে নামিয়ে দিয়ে, রাজকন্যা এসেছিলেন যে পথে, সেই পথে, আস্তে, ফিরে গেলেন।

আট

হুলস্থূল পড়ে গেল রাজ্যে।

কার' কিসের স্বয়ম্বর ?

রাজকন্যা কবাট দিলেন আপন ঘরে। বল্‌লেন, "মা, ফুলের যদি না হয়, তো স্বয়ম্বরের মালা আমি দিব না।"

রাণী কি কর্‌বেন ? রাজা কি কর্‌বেন ? রাজপুত্রেরা কি কর্‌বেন ?

"আন, ফুল আন। মালঞ্চের হোক, সায়রের হোক, বনের হোক।"

কোথাও তো মেলে না।

রাজা বল্‌লেন, "তাই ত। বৃষ্টি নাই।"

মন্ত্রী বল্‌লেন, "মহারাজ, যজ্ঞ করুন।"

জ্যোতিষী, যোগী, তন্ত্রী, যন্ত্রী, অমনি একত্র হন।

তখনি যজ্ঞ করেন।

সাতদিন সাত রাত্রি যজ্ঞ হয়।

পরদিন, মালী ছুটে আসে ফুল নিয়ে।

তেমনি বেলায়।

সেই শুক্‌ন ফুল।

"কোথায় পায় ?"

শিশুসাথী

পুষ্পবতী

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

"পাখী এল !"

"পাখী !"

রাণীর পুরে খবর গেল।

যজ্ঞের ধোঁয়ায় রাজ্য অস্থির, রাজপুত্রেরা হাঁপিয়ে অস্থির, সকলেই এলেন,

"পাখী !!—"

বল্‌লে মালী, "হাঁ মহারাজ।"

রাণীর পুরীর খবর এল, ছোঁবেন না রাজকন্যা শুক্‌ন ফুল।

সদ্য ফুল চাই।

গোল উঠ্‌ল, "পাখী ধর।"

রাজা মন্ত্রী, সকলে বল্‌লেন, "খুব সাবধানে ধর।"

দীঘির ধার ছেড়ে রাজপুত্রেরাও এলেন এগিয়ে।

নয়

মালঞ্চের ঘাস মালঞ্চের পাতা মাটিতে মিশে, লোক জনের পায়ে। কুঁড়ি কেশর চাঁদের মুখ চাইবে কি, চোক বোজে গাছের ডালে।

নিশি রাত থম্ হয়ে থাক্‌ল।

পাখী, তবু এল।

পূব-সোনালীর আব্‌ছা দিয়ে !

"কিসের আবার জাল ?—"

"—পালাবে !" "—পালাবে !"

"মারো তীর !"

মালী কেঁদে উঠ্‌ল—"আঃ—হাঃ !!!"

কোটাল তরোয়াল ফেলে বলে উঠ্‌ল—"—আঃ ! হাঃ !!"

কিন্তু তীর বিঁধ্‌ল।

"হাড়টুকু ওর মালঞ্চে থাক্‌লেও, নিত্য ফুট্‌বে ফুল!"

"তাজা ফুল!"

হাঁক ডাক চার ধারে।

রাজপুত্ত্রদের তীরের পর তীর গিয়ে বিঁধ্‌ল, শাণ তীর, চোখা তীর, বাখা বাখা বাণ।

কোথায় আর যাবে?

উলট খেয়ে পড়্‌ল পাখী।

ভোর বাতাসে, উড়ে গেল। ধলো দয়েল। ছড়ানো ভারানো পাখে, কালো পাখ্‌ সব শরের মুখে সঁপে, গেল—পূব-সোনালির অথৈ আভের সোনায় ···সোনায় ···সোনায় মিশে!

কেউ আর দেখ্‌তে পেল না!

তার কালো পাখের মুখ দিয়ে কালো কাজল রক্তের বান, শর তীরের মুখে জোয়ার ডাকিয়ে ছড়িয়ে পড়্‌ল রাজার রাজ্যে।

পড়্‌ল, আর যে যেখানে ছিল, জেগেই বা কি আর ঘুমেই বা কি, রাজ্য ভরে' সব হয়ে গেল চক্ষের নিমিষে কালো কালিময়—কালিন্দী কালো কালুটি—কালো অঙ্গার!

হায়! রোদের পানে আর কেউ তুলে, চোক, চাইতেও পেল না!

দশ

পেল না।

কেউ।

কেবল, রাজকন্যা পুষ্পাবতী চান!

পুষ্পবতী

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

চান, দেখেন, সারা অঙ্গ তাঁর অঙ্গার, শুধু, মালার সূতো পরাতে যে হাতে ছিলেন বসে সূঁচ সূতো নিয়ে ফুলের জন্যে, আর যে মুখের দু' চোক নে' ছিলেন চেয়ে রাত পোহানর ফুলের পথটি, সেই তাঁর হাতের দুটি পাতা, আর সেই মুখখানি তাঁর জাগ্ছে একা।

সখীরা কালো, দাসীরা কালো, শুকশারী কালো, রাণীর দুয়ারে প্রহরী কালো, আগুনে দাঁড়ানো হরিণী কালো, দীঘির হাঁস কালো।

দেখ্লেন।

দেখ্লেন।

দেখ্লেন রাজকন্যা; চেয়ে রইলেন।

চাঁপা কলি হাত আর শ্বেতপদ্ম মুখের ছায়া কোলে সাপ্টে, মেজের দর্পণ, শিউরে, শিউরে, নিসীম হিম হয়ে যেতে থাক্‌ল।

এগারো

আঁধার হয়ে গেল রাজার রাজ্য।

অছিন্ আঁধার।

মাথা হেঁট করে কতক রাজপুত্র কোন রকমে চলে গেলেন।

কতক রাজপুত্র রইলেন, যেমন এসে রাজপুরীর দুয়ার ধরে' দাঁড়িয়ে ছিলেন, তেম্নি।

দিন হল কিনা, রাত হল কিনা, কে জানে? বয় কিনা হাওয়া, কে জানে?

যায় পল, প্রহর, মাস, বছর।

রাজ্যের গাছপালা, ঘর সহর, মাঠ মাটি, থল জল, পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী, বন পাথার সব কালো অঙ্গার হতে লাগ্‌ল।

হাজার হাজার, লাখ লাখ, অযুত নিযুতে গেল বছর। আর আলো এল না।

এল না আলো, কালি নিকষ অঙ্গার আর ঘুচ্‌ল না ; গহন কালোর রাজ্য শক্ত পাথর হয়ে গেল

বারো

নিশুতি কালো পাথর। আঁধারের পুরী জুড়ে' মিশ্‌ মিশ্‌। আঁধার গিস্‌ গিস্‌। সেই নিশি আঁধার পুরীতে, শুধু, চেয়ে আছে রাজকন্যার শ্বেতপদ্ম মুখ, টল টল চোক, চাঁপার কলি আঙুল, আর ফুল পরা'বে···সোনার সূঁচ আর রূপোর সূতো—

কত যুগ,···কত পক্ষ, কত মাস, কত বচ্ছর!

জন না, মানুষ না, কেউ যায় না সেই আঁধার পাষাণ দেশে। কেবল, জোর পূর্ণিমার জোস্থনায় যখন পৃথিবী ভেসে যায়, সেই সময় একজন দু জন মানুষ আসে, খুট্‌ খুট্‌ খুট্‌ খুট্‌ করে পাথর কাটে আশ্‌ পাশে, খোঁজে কোথায় আছে সেই সোনার সূঁচ, রূপার সূতো।

ঝুর্‌ ঝুর্‌ ঝুর্‌ ঝুর্‌ করে কত পাথর ঝরে যায়, দুড় দাড় দাম্‌ দুম্‌ করে কত পাথর পড়ে যায়, কিন্তু কেউ জানে না, কোথায় আছে সেই সূঁচ, কোথায় সে সূতো, কেউ খোঁজ পায় না।

কাট্‌তে কাট্‌তে কাট্‌তে কাট্‌তে, কেটে কেটে কেটে কেটে তারা চলে। তারা কেটে নেয় রাজকন্যার মুখ, চোক, হাত, নখ, আঙুল, টুক্‌রো টুক্‌রো টুক্‌রো টুক্‌রো করে। জানে না তো তারা, তারা তা দিয়ে, হাজার হাজার রাজপুত্র রাজকন্যার হার গড়ে, নিয়ে গিয়ে!

চেয়ে থাকেন তবু।

শিশুসাথী থেকে

পুষ্পবতী

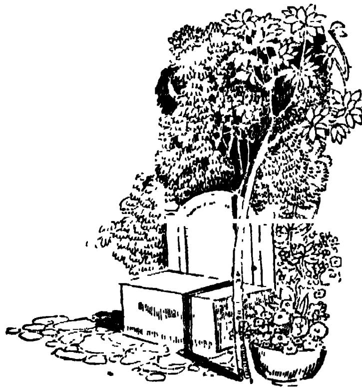
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

পুষ্পবতী রাজকন্যা।

তাঁর নখ আবার জাগে ; তাঁর আঙুলের কলি আবার গজায়। চোক মুখের পাপ্‌ড়ি আবার খোলে।

টল টল চোক আরো টল টল করে।

অঙ্গার আঁধার পুরীতে আছেন রাজকন্যা অঝোর চোকে চেয়ে কখন্ গাঁথ্‌বেন সত্যিকারের মালা ? আস্‌বে কখন্ সদ্য ফুল, তাঁর সত্যিকারের ফুল ?





শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

দুজনেই রাজার ছেলে। রাজপুত্রের মতই তাদের রূপ। শরীরে যেমন বল, অন্তরে তেমনি সাহস। রাজপ্রাসাদের স্বর্ণ সিংহাসনেই তাদের মানায়—কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় তারা নির্ব্বাসিত। এখন বিজন বনের পর্ণকুটীরে তাদের বাস। সে কুটীরের পিছনে বিরাট পর্ব্বত, সামনে অন্তহীন সমুদ্র।

বড়র নাম হিনোদে। দেখলেই বোঝা যায়—বীরপুরুষ বটে। বীরত্ব ভাল—কিন্তু অহঙ্কার ত ভাল নয়। হিনোদে ছিল একটু অহঙ্কারী। শুধু তাই নয়, তার প্রকৃতিটাই ছিল একটু হিংসুটে রকমের।

আইরিহি ছোট। সেও ভীরু নয়, কিন্তু মনটি তার কোমল। সে দাদাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। দাদা রাগ করলে সে কখনও উল্টে রাগ করত না। সে জানত রাগ দিয়ে রাগ জয় করা যায় না।

জাপানী রূপকথা

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

পূবের দিগন্ত মিশেছে সাগরের নীল জলে আকাশও নীল, জলও নীল কিন্তু প্রভাতের আলোয় তাদের মিলনভূমি হ'য়ে উঠে রক্তবর্ণ। দিগন্তের এই লাল আলো ঠিকরে গিয়ে পড়ে তাদের পাতার ঘরে। পাতার ফাঁক দিয়ে গিয়ে পড়ে তাদের চোখে মুখে, পড়ে তাদের সর্ব্বাঙ্গে। আর পড়ে ঐ কালো পাহাড়ের চূড়ায়। পাখীরা ধরে গান। অমনি ভেঙ্গে যায় তাদের ঘুম। পাখীরা নীড় ছাড়ে তারাও কুটীর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

দুজনের দুই পেশা। হিনোদে ধরে মাছ—জালে নয় বঁড়শিতে। কত রকমের মাছ যে তার হাতে পড়ে তা আর বলব কি! সমুদ্রে ত মাছের অভাব নেই। করাত মাছ, হাঙ্গর মাছ, বোয়াল মাছ—তা ছাড়া আরও কত মাছ। সব মাছের নাম বলবে কে! জানেই বা কয়জন? কোন মাছটার ওজন একমণ, কোনটার দু মণ, কোনটা বা তার চেয়েও বেশী।

আইরিহির সম্বল তীর ধনুক। বাঘ ভালুক তাকে ভয় করে। পাগলা হাতী তাকে দেখলে দেয় পিট্‌টান। তার হাতে নিষ্কৃতি নেই কারও। অমন যে সিংহ—ভালুক হাতী সকলেরই যে রাজা—আইরিহির সামনে পড়লে তাকেও আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হয় না। এমনি তার সাহস, এমনি তার শক্তি।

পূবের সূর্য্য যখন উঁচু পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়েন, তখন আইরিহি ফিরে পাতার ঘরে। কাঁধে তার হরিণ কি শশক। বাঘ ভালুক যা মরে তা বনের মধ্যেই পড়ে থাকে—এনে কি হবে? সে গুলো ত আর খাওয়া যায় না। ওদিক থেকে হিনোদেও ফিরে মাছ নিয়ে। সব মাছ নয়, যে সব মাছ খেতে ভাল সে গুলোই আনে; বাকী সব পড়ে থাকে, সমুদ্রের ধারে বালির উপরেই।

একদিন এক খেয়াল হ'ল আইরিহির। সে বল্‌লে, দাদা, বনে জঙ্গলে ঘুরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় লাফালাফি ক'রে আর ভাল লাগে না। তার চেয়ে এক

কাজ করা যাক্। তুমি একদিন তীর ধনুক নিয়ে বনে যাও, আর আমি যাই তোমার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে। মধ্যে মধ্যে হাত বদলালে কাজ আর এত একঘেয়ে লাগে না—না কি বল?

হিনোদে বল্‌লে;—ঠিক বলেছিস আইরিহি। তা বেশ আমার কোন আপত্তি নেই। আমার কাছে বঁড়শিও যা তীর ধনুকও তাই। বঁড়শিতে যেমন মাছ পড়ে তীর ধনুকেও তেমনি শিকার পড়বে। তুই কি না ছেলে মানুষ, মাছ তোর হাতে পড়লে হয়।

আইরিহি বললে :—পড়ুক আর নাই পড়ুক দাদা, হাত বদলে একবার দেখাই যাক। তুমি নাও তীর-ধনুক, আর আমায় দাও তোমার ছিপ-বঁড়শি।

সন্ধ্যে হ'ল। নীড়ের পাখী ফিরল নীড়ে। গুহার জীব আশ্রয় নিলে গুহায়। আকাশে নামল ছায়া। অরণ্য হ'ল নীরব। কেবল সমুদ্রের কল্লোল ছাড়া আর কোন শব্দ কোথাও নেই। কিন্তু দু'ভায়ের কেউ ফেরে নি কুটীরে। আজ কারও কোন শিকার জোটে নি।

একটি দুটি ক'রে আকাশের এ কোণে ও কোণে দেখা দিলে তারা। দেবদারু গাছের আড়ালে উঁকি দিলে চাঁদ। দেখতে দেখতে তারার মালায় ছেয়ে গেল নীল গগন। শ্যামা মেয়ের সর্ব্বাঙ্গ কে যেন দিলে ফুলের সাজে সাজিয়ে। সাগরের বুকে পড়ল তার ছায়া। তার ঢেউয়ের দোলায় কে যেন তাকে দোল দিতে লাগল আদর ক'রে।

আগে ফিরল আইরিহি। মুখটি শুকনো, চোখ দুটি সজল। মাছ পড়েনি একটিও। কিন্তু দুঃখ তার জন্যে নয়। তার দাদার বঁড়শি মাছে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। দাদা যখন বঁড়শি চাইবে—কি বলবে সে? যা হয়, হবে ব'লে, ঘরে ঢুকল আইরিহি। কিন্তু কই? হিনোদে কোথায়! সে কি এখনও ফেরেনি

তবে! আইরিহির মনে বড় ভয় হ'ল। জঙ্গলে যে সব ভয়ঙ্কর জন্তু! আর হিনোদে ত কখনও বনে শিকার করতে যায় নি! তবে কি তাকে!—ভাবতে হ'ল না—ঘরে ঢুকল হিনোদে। তারও হাত শূন্য। মুখে বেদনার চেয়ে বিরক্তির ভাবটাই বেশি। ঢুকেই সে বললে :—নে নে তোর অস্ত্র। যেমন ধনুক, যেমনি বাণ। যতগুলো তাক করলাম একটাও লাগল না। দরকার নাই বাঘ ভালুক শিকারে। আমার মাছ ধরাই ভাল। তুই ক'টা মাছ ধরলি! নিশ্চয়ই অনেক-গুলো পেয়েছিস। কি রকম বঁড়শিখানা দেখতে হবে ত! একবার ছুঁলেই গাঁথা না হ'য়ে যায় না।

আইরিহির মুখখানি আরও শুকিয়ে গেল। ব'ল্লে ;—দাদা, বড় দোষ হয়েছে ক্ষমা কর। তোমার বঁড়শিটি মাছে কেটে নিয়ে গেছে। আর মাছ? মাছ একটিও ধরতে পারি নি। সে যে তোমার ছিপের দোষ, তা নয়—মাছ ধরতে জানি না বলেই।

শুনে ত' হিনোদে রেগে আগুন। ভাইকে মারতে যায় আর কি! ব'ল্লে : —কিচ্ছু শুনতে চাইনা আমি। বঁড়শি আমার চাই-ই। যেখান থেকে পার আমার বঁড়শি এনে দাও।

আইরিহি ব'ল্লে ;—মাছে যে কাঁটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, কেমন করে তা ফিরে পাব? আমি ত আর—

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে হিনোদে এক ধমক দিলে। জানিয়ে দিলে —তার বঁড়শি চাই।

আইরিহি আর কি করে? তার তীরের ফলা ভেঙ্গে সে তখনই একটার জায়গায় একশ'টা বঁড়শি তৈরি ক'রে হিনোদের কাছে এনে দিলে।

খুসী হওয়া ত দূরের কথা, হিনোদে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলে আইরিহির গায়ের উপর। দুচারটে কাঁটা তার হাতে পায়ে বিঁধল। একটা লাগল ঠিক

গালের উপর, আর একটু হ'লেই চোখটা তার যেত। আইরিহির গায়ে গড়িয়ে পড়ল রক্তের ধারা।

আইরিহি চোখের জল মুছে আবার কাঁটা তৈরি করতে লাগল। এবার করলে একশ'র জায়গায় হাজারটা। ভাবলে হাজারটা বঁড়শি পেলে দাদার রাগ আর থাকবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু সে ভুল বুঝেছিল। হিনোদে তার নিজের বঁড়শি ছাড়া আর কোন বঁড়শিই নেবে না। সে একটাই হোক, আর হাজারই হোক্।

আইরিহি কাঁদতে কাঁদতে গেল সমুদ্রের তীরে। ব'সে ভাবতে লাগল—কেমন ক'রে পাবে হারানো বঁড়শিটি।

ব'সে থাকতে থাকতে তন্দ্রা এল তার চোখে। পরিশ্রান্ত দেহ কখন যে বালুবেলায় লুটিয়ে পড়ল তা সে নিজেই বুঝতে পারল না। কোথাও কেউ নেই—আকাশের তারাগুলি অনিমেষ নয়নে তার দিকে চেয়ে রইল। চাঁদ হেলে পড়ল পশ্চিমে। পাণ্ডুর হ'য়ে এল তার রং।

হঠাৎ কার হাতের ছোঁয়া লেগে ঘুম ভেঙ্গে গেল আইরিহির। সে ভাবলে তার দাদা বুঝি। কিন্তু চেয়ে দেখে, না—দাদাত নয়। সৌম্যমূর্ত্তি এক বৃদ্ধ। প্রশান্ত তাঁর মুখ—সাদা দাড়ি, সাদা চুল। চোখ দুটি উজ্জ্বল। স্নেহের সুরে বৃদ্ধ ব'ললেন ;—কে তুমি বৎস ? কি তোমার দুঃখ ?

আইরিহি সব কথা খুলে শেষে ব'ল্লে ;—আমার অপরাধ নেবেন না, কিন্তু আপনাকে ত কখনও দেখিনি।

বৃদ্ধ ব'ললেন ;—আমি জলদেবতা। এই সমুদ্রেই আমার বাস। তোমার দুঃখ দেখে এসেছি।

আইরিহি বৃদ্ধকে প্রণাম ক'রে তাঁর দয়ার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানালে।

বৃদ্ধ তখন সমুদ্রের দিকে হাত বাড়িয়ে যেন কাকে ইঙ্গিত করলেন। অমনি

জাপানী রূপকথা
শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

সাগরের জল থেকে উঠল একটি নৌকো! সোনার হাল, সোনার দাঁড়, সোনার পাল। সবই সোনার। কিন্তু দাঁড়ে নেই দাঁড়ি, হালে নেই মাঝি। নৌকো আপনি এল ভেসে, লাগল তীরে।

বৃদ্ধ ব'ললেন ;—উঠ এই নৌকোয়। চোখ বুজে ব'সে থাক পাটাতনে। উঠলেই নৌকো চলবে। যতক্ষণ না থামে চোখ খুলোনা যেন। তা হ'লে ভয় পাবে। এই সাগরের যে রাজা, নৌকো লাগবে তার দেশে। তাঁর দুই কন্যা —দুইজনই খুব সুন্দরী। কিন্তু ছোট রাজকন্যার মনটি বড় নরম, ফুলের মত। কারও দুঃখের কথা শুনলেই তার চোখ দুটি জলে ভ'রে উঠে। তার সাহায্যে তোমার হারানো বঁড়শি পাবে। কিন্তু সাবধান, বড় রাজকন্যা ভারী হিংসুটে, তার কাছে এসব কথা ব'লো না কিছুই। সে যদি শোনে তাহ'লে অনেক বাধা দেবে। এমন সময় কি একটা পাখি শিস্ দিতে দিতে ঠিক আইরিহির মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। আইরিহি মাথা তুললে—দেখলে আকাশ ফরসা হ'য়ে এসেছে, সকাল হয় হয়। তখনই সে জলদেবতাকে প্রণাম ক'রবার জন্যে মুখ ফেরালে। কিন্তু কই? আশে পাশে জনপ্রাণী নেই। শূন্য সৈকত। সাদা বালির অনন্ত শয্যা। একদিকে সীমাহীন তরঙ্গময় সমুদ্র, অন্যদিকে ধূসর দুর্গম পর্ব্বত। মধ্যে বালু বেলা। কোথায় তার শেষ, কোথায়-বা তার আরম্ভ—কে জানে?

কিন্তু ভাবনার সময় নেই। নৌকো তখনও দাঁড়িয়ে আছে, তারই অপেক্ষায়। উঠে পড়ল সে সোনার নৌকোয়। চোখ বুজে বসল পাটাতনে বায়ু-বেগে নৌকো চলতে লাগল, ঢেউ ভেঙ্গে আর জল কেটে।

কতক্ষণ যে এমনি ক'রে কাটল—সে জ্ঞান তার নেই। নৌকো যখন থামল, একটা ধাক্কা লেগে তার চমক ভাঙ্গল। চেয়ে দেখে একটি সুন্দর দ্বীপ। আইরিহি নেমে পড়ল নৌকো থেকে, কিন্তু যাবে কোথায়? লোকজন কেউ কোথাও নেই যে



জিজ্ঞেস করে। তাই সে আপন মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে এল একটি গাছের তলায়। এমন গাছ সে কখনও দেখেনি। রূপার গাছ, তাতে জড়িয়ে আছে সোনার লতা। মুক্তার ফলে গাছের ডাল পড়েছে নুয়ে। সেই গাছের তলায় একটি কুয়ো। কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ তার জল। তেষ্টায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, জল দেখে তার তেষ্টা আরও বাড়ল। কিন্তু জল খাবার ত উপায় নেই। জল তুলবে কি দিয়ে?

সে ভাবলে যে, এ কুয়োর জল যখন এমন সুন্দর তখন লোকে নিশ্চয় এ জল খায়। অপেক্ষা করলে নিশ্চয় কেউ না কেউ জল তুলতে আসবে। ততক্ষণ এক কাজ করা যাক। এই গাছটার উপরে উঠে একটু বসি। এই ব'লে সে উঠে ব'সে রইল গাছের উপর।

যায় যায়—অনেকক্ষণ যায়। তেষ্টায় গলা কাঠ হ'য়ে গেল। কিন্তু কই, কেউত আসে না! তবে কি এদেশে কেউ নেই?

এমনি ভাবছে, এমন সময় কি একটা শব্দ বাতাসে ভেসে এল। মুখ তুলে দেখল, কয়েকটি মেয়ে কথা বলতে বলতে এই দিকেই আসছে। তাদের সকলের হাতেই একটি করে সোনার কলসী। রঙিন বেশ ভূষায় তাদের দেহ সজ্জিত। আইরিহি ঠিক বুঝতে পারলে না—এরা কে। তবে এরা যে জল নিতে আসছে এই কুয়োর দিকেই—তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না।

দেখতে দেখতে তারা এসে পৌঁছল কুয়োর ধারে। তখন তাদের কথাবার্ত্তা আইরিহির কানে এল। বুঝল এরা রাজকন্যা নয়। তাঁদের সহচরী।

একজন ব'লছে;—ভাই, বড় সখীর জন্যে ভাবি না। সে যেমন হিংসুটে তার বরও তেমনি হ'লেই চলবে। দেশে খারাপ লোকের ত অভাব নেই। তার বরের জন্যে মহারাজের ভাবতে হবে না।

আর একজন ব'ল্লে;—তা যা ব'লেছিস, সই। কিন্তু ছোটসখীর কথা একবার

ভেবেছিস্ কি ? হাসি হাসি মুখখানি। আমাদের সকলকে ঠিক বোনের মত দেখে। কখনও একটু জোরে কথা বলে না। আহা তবু বেচারি দিদির মন পেলে না। তার জন্যেই ভাবনা। এমন রত্ন কার হাতে পড়বে!

তৃতীয় সহচরী ব'ললে—মহারাজ যাই বলুন না কেন, যার তার হাতে ছোট সখীকে আমরা কিছুতেই দিতে দেব না। বানরে কি মুক্তার মালার মর্ম্ম বুঝে ?

কথা বলতে বলতে অনেকক্ষণ কাটল। সে খেয়াল তাদের ছিল না। হঠাৎ একজন ব'লে উঠল ;—গল্প করতে করতে কতক্ষণ কাটল সে দিকে কারও নজর আছে কি ? নে নে চল। জল তুলে প্রাসাদে ফিরতে হবে ত ? ছোট সখী একলা আছে—সেটা কি তোরা ভুলে গেলি ?

সবাই ব'ল্লে ; —তাই ত। গল্পে গল্পে কতক্ষণ কেটে গেছে। চল্ চল্ জল তুলে বাড়ী ফিরি। এই ব'লে তারা সোনার কলসে রূপার দড়ি বাঁধলে। বেঁধে ডুবালে কুয়োর জলে। কিন্তু যেই কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে জলের দিকে মাথা ঝুঁকিয়েছে, অমনি সবাই একসঙ্গে চমকে উঠল। চমকে উঠার কারণ আর কিছু নয়। কুয়োর স্বচ্ছ জলে সবাই দেখলে রাজপুত্র আইরিহির ছায়া। প্রথম ভয় কেটে যেতে একটু সামলে নিয়ে তারা তাকালে উপর দিকে। ভাবলে কে এ আগন্তুক ? কোন দেশে এর বাস ?

আইরিহি তাদের অবস্থা বুঝতে পেরে বললে ;—আমি এক রাজপুত্র। সাগরতীরে আমার বাস। তোমাদের ছোট রাজকুমারীর দেখা পেতে চাই। জলদেবতা স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সে সব কথা পরে হবে। আমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত। আমাকে একটু জল দাও।

সখীরা অমনি সোনার বাটিতে করে রাজপুত্রের হাতে জল দিলে। আইরিহি জল খেয়ে বাটিটি ফিরিয়ে দিয়ে ব'ল্লে ;—তোমাদের উপকার আমি কখনও ভুলব না। তোমরা আজ আমার প্রাণ দিয়েছ।

তারা ব'ল্লে ;—রাজকুমার প্রাসাদে চলুন। সেখানেই আমাদের সখীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে। আপনার মত অতিথি পেলে মহারাজ খুসী হবেন।

আইরিহি বল্লে ;—না, তোমরা প্রাসাদে ফিরে যাও। সময় হ'লে যাব। এখনও আমার যাবার সময় হয় নি।

বাটিটা যখন আইরিহি ফিরে দেয় সখীরা সেটা ভাল করে দেখে নেয় নি। পথে যেতে যেতে একজন ব'ল্লে ;—ওরে বাটিতে ওটা কি বল দেখি? সকলে ব'ল্লে ;—কি দেখি?

বাটিতে ছিল একটা মাণিক—সাত রাজার ধন যার দাম—সেই মাণিক। সখীরা ভাবলে ;—জল খাবার সময় হয়ত কোন রকমে রাজপুত্রের গলা থেকে মাণিকটি পড়েছে খসে। আমরা সেটা নিয়ে চলে এলাম। তিনি না জানি কি ভাববেন! তারা ঠিক করলে মাণিকটা তারা রাজপুত্রকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু একি? মাণিক যে তোলা যায় না। বাটির গায়ে এমন ভাবে আটকে গেছে যে, সবাই মিলে চেষ্টা ক'রেও সেটা খুলতে পারলে না।

তখন রাজপুত্রের কাছে আর না ফিরে, এল ছোট রাজকন্যার কাছে। ছোট রাজকন্যা সব শুনে ব'ল্লে ;—দেখি ত কেমন মাণিক! কিন্তু ব'লেই কেমন যেন তাঁর লজ্জা করতে লাগল। মুখ চোখ তাঁর লাল হ'য়ে উঠল। সখীরা অলক্ষ্যে তাই দেখে একটুখানি মুখ টিপে হাসল। যাই হোক তবু রাজকন্যা নিলেন সেই বাটি। মাণিকটিতে তাঁর হাত লাগতেই সেটি গেল খুলে। তিনি সহজেই সেটি তুলে ফেললেন। সখীরা সবাই মিলে প্রাণপণ চেষ্টায় যেটা খুলতে পারে নি, তিনি অনায়াসেই সেটা তুলে ফেললেন দেখে সকলে বিস্মিত হ'য়ে গেল। ভাবলে —এর অর্থ কি?

এক সহচরী ব'ল্লে ;—কি সখি, তবে মহারাজকে খবর দি?

জাপানী রূপকথা

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

ছোট রাজকন্যা তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে রাগের সুরে ব'ল্লেন ;—কি খবরটা শুনি ?

—যে মহারাজের একটা ভাবনা আজ দূর হ'ল ।

—কোন্ ভাবনাটা আবার দূর হ'ল ?



—কোন্ ভাবনা আর ? কিছুই যেন বুঝেন না উনি ! তেমনি বোকা মেয়ে কি না ।—ব'লেই চপলা সখীটি হেসে উঠল । আর সবাই যোগ দিল সেই সঙ্গে ।

মহারাজ সমুদ্রনাথ সেই সবে রাজসভার কাজ সেরে বিশ্রামের জন্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন । সংবাদ পেয়েই মহারাণীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন ছোট রাজকুমারীর ঘরে । তিনি হ'লেন সমুদ্রনাথ । সাত সমুদ্র তের নদী—সব তাঁর চোখে চোখে । দেশ দেশান্তরের খবর তাঁর নখদর্পণে । তিনি মাণিক দেখেই বুঝলেন,—এ মাণিক কার । অদৃশ্য অক্ষরে লেখা ছিল তাতে নির্ব্বাসিত রাজপুত্রের

নাম। মহারাজের মুখ থেকে বেরিয়ে এল; আঃ বাঁচলাম যার খোঁজ করছি এতদিন ধরে, আজ সে এসেছে নিজেই। ভগবান তবে মুখ তুলে চাইলেন বোধ হয়।

তিনি স্বয়ং বেরিয়ে পড়লেন রাজকুমারকে অভ্যর্থনা করে আনতে। সঙ্গে সঙ্গে চলল সভাসদ পারিষদ। পিছনে পিছনে ভীড় করে চলতে লাগল অন্যান্য রাজপরিজনেরা।

রাজা এলেন সেই কুয়োর পাড়ে। তাঁর বেশভূষা দেখেই আইরিহি বুঝেছিল সাতসাগরের রাজা ইনিই। জলদেবতা এঁর কন্যার কথাই তাহলে তাকে বলেছিলেন। আইরিহি নামল গাছ থেকে। সভাসদরা জানিয়ে দিলে, স্বয়ং সাতসাগরের রাজা এসেছেন তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে। আইরিহি প্রণাম করলে রাজাকে। রাজা তাকে হাত ধরে তুললেন। তারপর তাকে পরম সমাদরে নিয়ে এলেন নিজের প্রাসাদে।

রাজ-অতিথি আইরিহি আছেন রাজপ্রাসাদে। আদর যত্নে মাসখানিক তাঁর কাটল। সাগরদ্বীপে কাণাঘুষা শোনা গেল আইরিহির সঙ্গে ছোট রাজকন্যার বিয়ে।

একদিন সত্যি সত্যি বিয়ে হ'য়ে গেল। সে কি ধুমধাম! সে কি জাঁকজমক। সাত সমুদ্র তের নদীর যত অধিবাসী সবাই ত' এক রাজার শাসনে। সবাই পেলে নিমন্ত্রণ। সবাই নিয়ে এল আপন আপন সাধ্যমত উপহার রাজকন্যার বিয়ের উপলক্ষ্যে। এল তিমি—ত্রিশ হাজার মণ তেল নিয়ে। এই তেলে জ্বলবে আলো। এল কুমীর—অসংখ্য রত্ন নিয়ে। রত্নাকর বলে সমুদ্রকে। তার তলায় রত্নের অভাব ত নেই। কুমীর ডুব দিয়ে এনেছে—মণি-মাণিক্য রাশি রাশি। ছোট রাজকন্যার অঙ্গে জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল সেই সব রত্নাভরণ। এল হাঙ্গর—শৈবালের শাড়ি নিয়ে। কি সুন্দর সেই

কাপড়ের বুনানি, কি অপরূপ তার কারুকার্য্য! জরির কাজ করা রেশমি শাড়িও তার কাছে হার মানে। সখীরা রাজকন্যাকে পরিয়ে দিলে সেই কাপড়।

বিয়ের পর বর-ক'নে বেরুলেন দ্বীপ পরিক্রম করতে জলহস্তীর পিঠে চ'ড়ে। সামন্ত শঙ্খরাজ নিয়েছেন বাদ্যের ভার। তার হুকুমে বেজে উঠল জলতরঙ্গের সুমধুর ধ্বনি।

প্রবাল সমুদ্র-রাজের রাজমিস্ত্রী। তিনি নিয়েছেন বাসর নির্ম্মাণের ভার। কি অপরূপ ভাস্কর্য্য সে বাসরঘরের। সে ঘরে জ্বলছে হীরার বাতি। মাণিকের পালঙ্কের উপর ঝুলছে চাঁদের আলোর মত শুভ্রবর্ণ মুক্তার চাঁদোয়া। মৎস্য কন্যা ও নাগনন্দিনীরা চামর হাতে দাঁড়িয়ে আছেন বরক'নের প্রতীক্ষায়। মুক্তাঝরির হ্রদ থেকে এসেছেন রাণী কমলমণি পুষ্পসম্ভার নিয়ে অসংখ্য রকমের। ফুলের গন্ধে বাসরঘর আমোদিত।

দ্বীপ পরিভ্রমণ ক'রে এসে বরকনে প্রবেশ করলেন সেই বাসরঘরে। শঙ্খরাজের হুকুমে বাদ্যকরেরা নূতন রাগিনীতে ধরলে গান। বেজে উঠল নূতন তালে কাড়া নাকাড়া।

বছর তিনেক গেল কেটে সুখে স্বচ্ছন্দে। দাদার কথা আইরিহি একরকম ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন সে স্বপ্নে দেখলে হিনোদেকে। এক নিমেষে সব কথা তার মনে পড়ল। ধড়মড় করে সে উঠে পড়লে বিছানা থেকে। রাজকন্যারও ঘুম ভেঙ্গে গেল। ব'ল্লে,—কি হ'ল? আইরিহি ব'ল্লে,—না, কিছু না। তার মুখ ভারি, স্বর করুণ। রাজকুমারী ব'ল্লে;—নিশ্চয় তোমার মনে কিছু দুঃখ আছে। আমার কাছে গোপন ক'র না। বল হয়ত বা আমি কিছু করতে পারি।

তখন আইরিহি ব'ল্লে,—নিতান্তই যদি শুনতে চাও ত' শোন। ব'লে সে

ছোটদের পাঠশালা

গোড়াথেকে শেষ পর্য্যন্ত সব কথাই খুলে ব'ল্লে। রাজকন্যা শুনে ব'ল্লে,—এই কথা? তা এতদিন বল নি কেন? এই আমি চল্লুম বাবার কাছে—কালই ফিরে পাবে তোমার দাদার বঁড়শি।

সম্রাট সমুদ্ররাজ মেয়ের মুখে সব কথা শুনে পরদিন সকালেই সভা ডাকলেন। সে সভায় তলপ পড়ল মৎস্যখণ্ডের অধিবাসীদের। তারা সবাই এল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। কে জানে মহারাজের কি হুকুম হয়?

মৎস্য দেশের প্রজামণ্ডলী উপস্থিত হ'লে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন;—তিন বৎসর আগে আমার জামাই ধরছিলেন মাছ—এই সাগরের তীরে ব'সে। তোমাদের মধ্যে কেউ তাঁর বঁড়শি নিয়ে গেছ—কাল রাত্রে এই সংবাদ এল আমার কাছে। কার কাছে সেই বঁড়শি আছে জানতে চাই। সভা নিস্তব্ধ। সবাই কেবল মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু একটি কথাও কেউ বললে না। হঠাৎ বুড়ো বোয়ালের নাতি লাফ দিয়ে উঠে ব'ললে,—মহারাজ, আমার দাদামশায় বড্ড বুড়ো হ'য়েছেন ব'লে আসতে পারেন নি। তাঁর বদলে আমাকেই পাঠিয়েছেন—সভায় হাজিরা দেওয়ার জন্যে। আজ তিন বছর হ'ল তাঁর গলায় কি একটা যেন আটকে আছে: কিছু খেতে গেলেই লাগে। তবে সেটা ঠিক বঁড়শি কি না—জানি না। মহারাজ যদি হুকুম করেন একবার রাজবৈদ্যকে নিয়ে যাই—তিনি যদি অস্ত্রোপচার ক'রে দেখেন, তা হ'লেই বোঝা যাবে গলায় কি লেগে আছে। হুকুম পেয়েই রাজবৈদ্য গেলেন বুড়ো বোয়ালের বাড়ী। খুব সাবধানে তিনি বোয়ালের গলায় করাত চালিয়ে দিলেন। দেখা গেল সত্যিই তার গলার এক কোণে বিঁধে রয়েছে একটা লোহার কাঁটা। কবিরাজ ফিরলেন বঁড়শিটি নিয়ে রাজপ্রাসাদে।

আজ সকাল থেকেই আয়োজন চলেছে—রাজকুমার ফিরে যাবেন দাদার

কাছে। সাগরের তীরে এসে লেগেছে সাতখানি নৌকো। যেটিতে বরক'নে যাবে সেটি চমৎকার সাজান—দেখলে চোখ জুড়ায়।

সকাল থেকে রাণী-মা শয্যা নিয়েছেন—আদরের মেয়ে চিরদিনের মত ছেড়ে চ'লল—এই ভেবে মহারাজের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। বড় রাজকুমারী—যে ছোটবোনকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না, সেও আজ বালিশের উপর উপুড় হ'য়ে কেঁদে আকুল।

ছোট রাজকন্যা তার কাছে এসে বসলেন। ধীরে ধীরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। ব'ল্লেন, মাপ কর দিদি তোমায় কত কটু কথা ব'লেছি, কত কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু সে সব কথা ভুলে যেও। ছোট বোনটি ব'লে সব দোষ ক্ষমা কোরো। বড় রাজকন্যা আর পারলেন না। বোনকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ব'ল্লেন—বোন্, তুইত কখনও কোন দোষ করিস নি ভাই। আমিই ত' তোকে চিরদিন যন্ত্রণা দিয়েছি। স্বামীর বাড়ীতে গিয়ে তুই সুখী হ'—এই আশীর্ব্বাদ করি।

সাগরতীরে ভারি ভীড়। মহারাজ মহারাণী এসেছেন মেয়ে জামাইকে বিদায় দিতে। এসেছে পাত্রমিত্র কোটাল—এসেছে সেপাই সান্ত্রী—এসেছে লোক লস্কর—এসেছে পাইক বরকন্দাজ, আর এসেছে রাজকন্যার সহচরীরা সজল চোখে বিরস মুখে। আর সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে পাষাণ প্রতিমার মত কে ওই মেয়েটি? ও আর কেউ নয়—বড় রাজকন্যা। চোখের জলে আজ তার মনের ময়লা সব ধুয়ে গেছে। আহা কি করুণ তার মুখখানি!

বিদায়ের পালা সাঙ্গ হ'ল। নৌকো ছাড়ার আগে মহারাজ জামাইয়ের হাতে দিলেন দুটি নীলকণ্ঠ মণি। ব'লে দিলেন;—এর একটিতে আনে জোয়ার —অন্যটিতে ভাঁটা। দরকার হ'লে এদের কাজে লাগিও। জোয়ার মণি হাতে নিয়ে যদি বল 'জোয়ার', অমনি শুকনো মাটিতে বন্যা বইবে। আর ভাঁটা মণিটি

হাতে ধরে যদি বল 'ভাঁটা', অমনি অথৈ জলও শুকিয়ে যাবে—দেখতে পাবে শুকনো মাটি। আইরিহি রত্ন দুটি যত্ন করে বেঁধে রাখলে।

আইরিহি ফিরল পাতার কুটীরে। এসেই দাদাকে দিলে তার বঁড়শিটি—আর দিলে তার যৌতুকের অর্দ্ধেক। কিন্তু হিনোদের ঈর্ষ্যা হ'ল আইরিহির ঐশ্বর্য্য দেখে। সে খুসী হ'ল না মোটেই।

আইরিহি এসে নূতন করে আর একটি কুটীর তৈরি করলে নিজের জন্যে। সেইখানেই সে বাস করতে লাগল।

আইরিহি চাষ করে নীচের মাটিতে পাহাড়ের তলায়। হিনোদে করে উপরে, পাহাড়ের গায়ে। বছরের শেষে আইরিহির গোলা শস্যে পূর্ণ হয়, কিন্তু হিনোদের দুঃখ ঘোচে না, তার গোলা শূন্য থেকে যায়। তখন হিনোদে বলে, নীচের জমি তোমার নয়, আমার। তুমি যাও উপরের জমি চাষ করগে। আইরিহি তাতেই রাজি হয়।

কিন্তু ফল হয় একই। আইরিহির চেষ্টায় পাথরেও সোনা ফলে। হিনোদের ভাল জমিতেও শস্য ফলে না!

হিনোদে নিস্ফল আক্রোশে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরে। একদিন সে মনে মনে ভাবলে যে আইরিহি নিশ্চয় কোন মন্ত্র শিখে এসেছে। সেই মন্ত্র দিয়ে নিজের জমিতে শস্য ফলায়, আর তার জমির উর্ব্বরতা দেয় কমিয়ে। তাকে মেরে ফেললে হিনোদের আর কোন দুঃখ থাকবে না। এই ভেবে সে করলে কি, না—একটা তরোয়াল নিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল আইরিহির কুটীরের পাশে। উদ্দেশ্য—আইরিহি যেই বেরোবে ঘর থেকে, অমনি বসাবে তার ঘাড়ের উপর এক কোপ। ব্যস্ তখন আর কি?

দাদার ব্যবহারে আইরিহির মনে সর্ব্বদাই একটা ভাবনা ছিল। সে যতই তার ভাল করতে যায়, হিনোদে ততই তার অনিষ্ট করে। তাই সে নীলকণ্ঠ

মণি দুটি সব সময় হাতে হাতে রাখত—ডান হাতে জোয়ার মণি আর বাঁ হাতে ভাঁটা মণি। সেদিনও সে মণি দুটি হাতে করে বেরিয়েছে কুটীর থেকে। জানে না যে হিনোদে দাঁড়িয়ে আছে দরজা গোড়ায়। তাকে দেখেই হিনোদে উঠালে অস্ত্র। কিন্তু হাত আর নামাতে হ'ল না। আইরিহি ডান হাত তুলে ডাক দিলে—জোয়ার। কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ তুলে গর্জ্জন করতে করতে সমুদ্র এল ছুটে। স্রোতে ভেসে গেল হিনোদে। কিন্তু সে জল আইরিহির গায়েও লাগল না। আইরিহি দেখতে পেল, হিনোদে স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে ডুবতে ডুবতে। তখন তার নিজের মনেই দয়া হ'ল। সে বাঁ হাত তুলে ব'ল্লে,—'ভাঁটা'। আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে সব শুকনো। যেখানে যা ছিল সব ঠিক তেমনি আছে। কেবল হিনোদে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে দূর থেকে।

হিনোদে কাছে এসেই ভাইকে জড়িয়ে ধরে ব'ল্লে, আমায় মাপ কর্ আইরিহি। আমি হিংসা করে তোকে সারা-জীবন কষ্ট দিয়েছি। তুই একটি কথাও না ব'লে সব সহ্য করেছিস্। আজ আমার জ্ঞান হ'য়েছে। বুঝতে পেরেছি—বয়সে ছোট হ'লেও মনটা তোর কত বড়। কিন্তু আমি—

আইরিহি তার দাদার কথা শেষ করতে দিলে না। দাদাকে এরকম শাস্তি দিয়ে সে নিজেই অনুতপ্ত হ'য়েছিল। তার কথা শুনে আইরিহির মনে অনুতাপ আরও বাড়ল। সে ব'ল্লে,—দাদা, ছোট ভাই ব'লে আমার সব অপরাধ ক্ষমা কোরো। তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না। হিনোদে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ব'ল্লে,—আজ থেকে আবার আমাদের নূতন করে জীবন সুরু হ'ল। সুখে-দুঃখে আমরা ভাই ভাই। আনন্দে-বিষাদে আমরা ভাই। ভায়ের মত আপন জন আর কে আছে জগতে। সে ভাইকে দুঃখ দিয়েছি এতদিন। আজ ভুল ভাঙ্গল।

রূপকথা

আইরিহি ব'ল্লে,—চল দাদা, আজ আমার কুটীরে তোমার নিমন্ত্রণ।

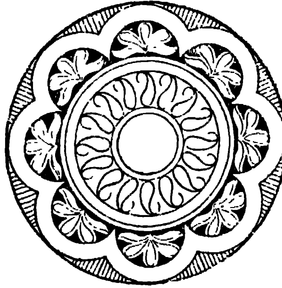
হিনোদে ব'ল্লে,—নিমন্ত্রণ কিরে? এবার থেকে এক কুটীরেই ত' বাস করব। তবে কুটীরটা তৈরী করে নিতে হবে, একটু বড় করে।

পিছন থেকে কে যেন ব'লে উঠল; সে ব্যবস্থা আমিই করে দেব বাবা। কিন্তু তার আগে ত সংসারী হ'তে হবে।

দুজনেই চমকে উঠল। চেয়ে দেখল দুজনেই। রাজার মত বেশ-ভূষা, রাজার মত সব সাজ-সজ্জা একজন বৃদ্ধ। আর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে—মুখটি লজ্জায় রাঙা।

আইরিহি দেখেই চিনতে পারল—বৃদ্ধ হ'চ্ছেন সমুদ্ররাজ—তার শ্বশুর। আর মেয়েটি—বড় রাজকুমারী।

তারপর কি হ'ল? সে কথা আর বলব না।





মায়া-কানন

আশাপূর্ণা দেবী

রাজার রাজ্যে রাক্ষসের উৎপাত্। প্রজারা দল বেঁধে এসে রাজার পায়ে পড়ল,—রক্ষা করুন মহারাজ!

অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্য সামন্ত হাতী ঘোড়া লোক-লস্কর নিয়ে রাজা যাত্রা করলেন—রাক্ষস বিনাশে।

যুদ্ধ করতে করতে,—রাক্ষসকে তাড়া করে' তার পিছু পিছু ছুটে—রাজা সৈন্য সামন্ত দলবল থেকে অ—নে—ক দূর এগিয়ে তফাৎ হয়ে পড়লেন। ঝোঁকের মাথায় রাক্ষসের পিছনে ছুটতে ছুটতে তিনি গভীর এক অজগর বনের মধ্যে এসে পথ হারিয়ে ফেললেন।

মায়া কানন

শ্রীরাধারাণী দেবী

চিত্রে গল্পিকা

সে বনে চন্দ্রের কিরণ ঢুকতেই পায় না, সূর্য্যের কিরণ অতিকষ্টে যৎসামান্য উঁকি দেয় মাত্র। চারিদিকেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ,—ঝোপ-ঝাড়—লতাগুল্ম, কাঁটাবন—জঙ্গল।

বড় বড় বুনোহাতী, সিংহ, বাঘ, নেক্ড়ে, ভাল্লুক, চিতাবরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আহারের সন্ধানে। রাজা বনের মধ্যে এসে দেখলেন, মায়াবী-রাক্ষস কোথায় মিলিয়ে গেল শূন্যে। খালি আকাশে আকাশে বাজতে লাগল তার ভীষণ অট্টহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ—হোঃ হোঃ হোঃ—

রাজা চম্‌কে উঠে কোমরের তরোয়ালে হাত দিলেন, নিজের পিঠে হাত দিয়ে দেখলেন, তূণভরা তীর ঠিক আছে কিনা! অন্ধকার রাত্রি ঘনিয়েছে—হিংস্র জানোয়ারদের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। রাজা করলেন কি, একটা উঁচু গাছে চড়ে—তারি ডালে শুয়ে রাত্‌কাটাবার ব্যবস্থা করলেন। রাত্রিবেলায় শুনতে পেলেন—এক ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমী সেই গাছেরই উঁচু মগ্‌ডালের উপরে তাদের বাসায় শুয়ে শুয়ে কথা কইছে।

ব্যাঙ্গমী বলছে,—আচ্ছা, রাজা যে এই অরণ্যের মধ্যে এসে পড়লেন, এইবার নিশ্চয়ই ওঁকে বৃক্ষরূপে বন্দী হয়ে থাকতে হবে তো? ব্যাঙ্গমা বলছে,—তা' নাও হতে পারে। দুনিয়ার প্রায় বেশীর ভাগ লোকই সাধারণ। তা'রা রাজা নয়। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিও হয় সাধারণ। কাজেই, তা'রা মায়াকাননে এসে পড়লে—সহজেই মায়ার ফাঁদে পড়ে বৃক্ষ বনে' যায়। কিন্তু রাজা, সাধারণ মানুষের উপরে। তিনি অসাধারণ। কাজেই, তাঁর বুদ্ধিও অসাধারণ হওয়া সম্ভব। সংসারে যে-মানুষের সুতীক্ষ্ণ—সুন্দর উপস্থিতবুদ্ধি আছে—সে অপরাজেয়।

সকাল হয়ে গেল। সে বনে তো সূর্য্যের প্রবেশ নেই। বেলা দুই প্রহরে যখন বনের বাইরে প্রখর রৌদ্রের উজ্জ্বল আলোয় চারিদিক প্রদীপ্ত,—তখন বনের

মায়া কানন
শ্রীরাধারাণী দেবী

মধ্যে অল্প অল্প অস্পষ্ট আলো—সন্ধ্যার ম্লান ক্ষীণ আলোর মত দেখা যেতে লাগল।

রাজা গাছ থেকে নেমে,—বনের বাইরে যাওয়ার পথ খুঁজছেন,—এমন সময়ে তাঁর কাণে ভেসে এল, সেই নিবিড় বনের ভিতরে, বহুদূর থেকে মেয়েলী গলার করুণ কান্না।

রাজা ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি সেই কান্না লক্ষ্য করে এগিয়ে চল্‌লেন। গভীরতর বনের ঠিক মাঝ-মধ্যিখানে গিয়ে দেখতে পেলেন,—এক পরমা সুন্দরী কন্যা—একটি মস্ত বড় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে—দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় খাড়া দাঁড়িয়ে করুণ স্বরে কাঁদছে। মেয়েটি অপূর্ব্ব রূপসী। সর্ব্বাঙ্গে তার ঝলমল করছে—হীরা, মোতি, মণি, পান্নার উজ্জ্বল অলঙ্কার। মেয়েটির সেই কাতর কান্নায় বনের পশুপাখীরও প্রাণ গলে,—মানুষের তো কথাই নেই।

রাজা তাড়াতাড়ি বন্দিনী-কন্যার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—

তুমি কে? তোমার এমন অবস্থা কে করেছে?

বন্দিনী বাঁশীর মতন মিষ্টিগলায় বললে—মহারাজ! আমি সাতদিন সাত-রাত্রি অনাহারে এখানে এই অবস্থায় আছি। আগে আমাকে আপনি দয়া করে উদ্ধার করুন, তারপর পরিচয় দেব আমি কে? কা'রা আমার এ'দশা করেছে?

রাজা শীঘ্র করে এগিয়ে গিয়ে কন্যার দড়ির বাঁধন খুলে দেবার জন্য যেই তাকে স্পর্শ করেছেন,—তৎক্ষণাৎ তিনি মাটীতে লুটিয়ে পড়লেন এবং দেখতে-দেখতে তাঁর দেহ, এক বিরাট শালবৃক্ষরূপে সেই জায়গায় খাড়া হ'য়ে উঠল।

চারিধারের অজস্র বড় বড় গাছ,—পাতায় পাতায় হায় হায়—শব্দ করতে লাগল। রাজা নিজেও বৃক্ষ রূপে পাতার মরমরানিতে কাতর হা-হুতাশ করে বলতে লাগলেন—ওহো—হো—ওহো-হো—হায়—ঈষ্—হায় ঈষ্—

সেই মায়াবিনী কন্যা একটি ছোট্ট পাখীর রূপ ধরে খিল্‌-খিল্‌—খিল্‌-খিল্‌ করে হাসতে হাসতে আকাশে উড়ে চলে গেল।

মায়া কানন
শ্রীরাধারাণী দেবী

শিশুসাথী

* * * *

রাজার রাজ্যে সকলেই বিষাদে মগ্ন।

রাজা নিরুদ্দেশ। সিংহাসন শূন্য। রাজ্যের না আছে শ্রী—না আছে শৃঙ্খলা! চোর-ডাকাতের উপদ্রব বেড়েছে। সাধুদের বেড়েছে দুঃখ আর অসাধুদের স্ফূর্ত্তি। দীন দরিদ্রেরা পাচ্ছেনা অন্নজল, ধনীরা পাচ্ছেনা শান্তিতে নির্ভাবনায় বাস করতে।

রাজমাতা পুত্রের জন্য কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছেন। মহারাণী স্বামীর জন্য ভেবে ভেবে শয্যাশায়িনী হয়েছেন।

রাজার দুই পুত্রকন্যা,—রাজকুমার ও রাজকুমারী, মায়ের কাছে ঠাকুমার কাছে গিয়ে বললেন,—বহুদিন হয়ে গেল, বাবার কোনও উদ্দেশ নাই। মা,—ঠাকুমা,—তোমরা অনুমতি দাও,—আমরা দুই ভাইবোনে বাবাকে খুঁজে নিয়ে আসব।

মা ঠাকুমা কেঁদে বললেন,—তোরা দু'জনেই চলে গেলে—আমরা কা'র মুখ চেয়ে টিকে থাকব এই শূন্যপুরীতে?

রাজকুমার বললেন,—দিদি, তুমি থাক। মা—ঠাকুমাকে আর প্রজাদের সান্ত্বনা দিয়ে রাখ। আমি বাবার উদ্দেশ আনতে চললুম। তাঁকে নিয়ে রাজ্যে ফিরব, প্রতিজ্ঞা করছি।

রাজপুত্তুর কোমরে তলোয়ার, হাতে সোণার বল্লম নিয়ে দুধ ধব্‌ধবে শ্বেত ঘোড়ায় চেপে রাজ্য থেকে বেরিয়ে গেলেন নিরুদ্দেশ বাপকে খুঁজে আনতে।

কতো গ্রাম—কতো নগর,—কত পাহাড় পর্ব্বত—নদ নদী—বনজঙ্গল পার হয়ে—কতো বিপদ আপদ এড়িয়ে—রোদ্দুর বৃষ্টি—ঝড় বজ্র মাথায় নিয়ে—ক্রমে গিয়ে পৌঁছুলেন সেই মায়াকাননেরই কাছাকাছি এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে। মাঠের

মায়া কানন

শ্রীরাধারাণী দেবী

মধ্যে রাত্রি হওয়ায় রাজপুত্র একটি তালগাছের নীচে ঘোড়া বেঁধে রেখে, নিজে সেই তালগাছের উপরে রাত কাটাবেন ঠিক করলেন।

চাঁদনী রাত্রি। নিশুতিরাতে রাজপুত্তুর দেখতে পেলেন, একটি সুন্দর ছোট পাখী উড়ে এসে তাঁর ঘোড়ার পিঠে বসল। তারপর পাখীটা, এক প্রকাণ্ড অজগর সাপ হয়ে গেল। সেই বিরাট অজগর, তাঁর ঘোড়াটিকে পাক্ দিয়ে জড়িয়ে প্রকাণ্ড হাঁ করে গিলে খেতে লাগলো। রাজপুত্তুর তালগাছের উপর থেকে অবাক্ হয়ে এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখতে লাগলেন। ঘোড়াটিকে নিশ্চিহ্ন করে অজগর সাপটি, আবার একটি ছোট্ট দোয়েল্ পাখী হয়ে মিষ্টিগলায় শিস দিতে দিতে বনের দিকে উড়ে চলে গেল।

রাজপুত্তুর হতভম্ব হয়ে গাছের উপরে বসে বসে—কী করবেন ভাবছেন, এমন সময়ে শুনতে পেলেন,—মাথার উপরে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী কথা-বলাবলি করছে। ব্যাঙ্গমী বলছে—আচ্ছা রাজা তো বন্দী হয়ে রইলেন মায়াকাননের মধ্যে। রাজপুত্তুরেরও শেষকালে বাপেরই মতন দশা না হয়!

ব্যাঙ্গমা বলছে—দেখ, মানুষে এক—দেখে শেখে; আর এক ঠেকে শেখে। রাজার ঠেকে শিক্ষা হয়েছে। রাজপুত্তুরের কিন্তু দেখেই শিক্ষা হওয়া উচিত।

ব্যাঙ্গমী বললে—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, রাজপুত্তুরও ঠক্‌বেন।

ব্যাঙ্গমা বললে—সব জিনিষের অগ্রপশ্চাৎ—সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা করে চললে, মানুষকে কোনও দিনই ঠকতে হয় না।

রাজপুত্তুর ভাবতে লাগলেন, আমার বাবা ঠেকে কী শিখেছেন? আর আমিই বা দেখে শিখেছি কী? তারপরে তাঁর মনে হল, সুন্দর ছোটপাখী এসে অজগরের রূপধরে তাঁর ঘোড়াটি গ্রাস করে—আবার ছোট পাখী হয়ে শিস দিতে দিতে বনের দিকে চলে গেল, এই থেকে তাঁর নিজের শিক্ষা হওয়া উচিত যে, ঐ বনের মধ্যে এমন সব কিছু আছে, যা' মায়াময়। তাদের সম্বন্ধে বুঝে চলা উচিত।



রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে

পৃঃ ২৪৫

মায়া কানন

শ্রীরাধারাণী দেবী

রাজপুত্র সেই বনে যাত্রা করলেন। গহনবনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে যখন পথ খুঁজছেন,—শুনতে পেলেন,—মেয়েলী গলার সেই করুণ কান্না!—রাজপুত্র ত্রস্তেব্যস্তে কান্না লক্ষ্য করে ছুটে চললেন। চারিদিকের বৃক্ষগুলি শাখায় শাখায় পাতার মর্ম্মরে আর্ত্তনাদ তুললো—রোসো—রোসো—আহা রোসো—রাজপুত্র কোনও দিকে কাণ না দিয়ে সেখানে ছুটে পৌছুলেন। গিয়ে দেখেন, গাছের গুঁড়িতে পিছমোড়া বাঁধা একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে। রাজপুত্র মেয়েটিকে মুক্ত করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন, এমন সময়ে তাঁর মাথায় কার যেন চোখের জল ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল। চমকে উঠে রাজকুমার পিছন ফিরে মাথা উঁচু করে উপরে তাকিয়ে দেখেন,—কেউ না। একটি বিশাল শালবৃক্ষের শাখা থেকে শিশিরের বিন্দুগুলি, ঠিক অশ্রুজলের মতই তাঁর মাথায় ঝরে পড়ল। রাজপুত্র আবার যেই অগ্রসর হবেন, কাণে এল, কে যেন গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে! চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন, কেউ না। শাল গাছের শাখায় বাতাস লেগে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার মত শব্দ হচ্ছে। আবার এগিয়ে যাচ্ছেন—এমন সময়ে কাণে এল, কে যেন পিছন থেকে 'হায়—হায়'—করে উঠলো। আবার চেয়ে দেখেন, সেই উন্নত শালগাছটিরই শাখাগুলি বাতাসে আকুলি বিকুলি করতে করতে হায়-হায়—ধ্বনি তুলছে।

রাজপুত্রের চট করে মনে পড়ল ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর উপদেশ! তিনি আগে মেয়েটির বন্ধন মুক্ত করতে না এগিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কে? এখানে কি করে এলে? কে এমন দশা করেছে তোমার?

বন্দিনী বললেন—সাতদিন সাতরাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় এমনি ভাবে বাঁধা আছি। আগে আমায় মুক্ত কর, তারপর সব বলছি।

রাজকুমার বললেন—না আগে বল। তবে খুলে দেব।

বন্দিনী বললে—আমি এদেশের রাজকন্যা। সাতদিন আগে খেলতে খেলতে

মায়া কানন

শ্রীরাধারাণী দেবী

পথ ভুলে আমি এই বনে ঢুকে পড়েছিলাম। একজন দস্যু ও আর একজন রাক্ষস, দু'জনে মিলে আমাকে এই গাছে বেঁধে রেখে চলে গেছে। তারপর অত্যন্ত সকরুণ গলায় বললে—তৃষ্ণায় আমার গলা জিভ্ শুকিয়ে গেছে—আর কথা কইতে পারছিনা—আমায় বাঁচাও—

রাজপুত্র মেয়েটির কাতর অবস্থা দেখে মনে করলেন,—মেয়েটি যে-ই হোক, আগে ওর বন্ধন খুলে দেওয়া কর্ত্তব্য। তারপর যেই গিয়ে তার হাতের বাঁধন ছুঁয়েছেন,—অমনি মাটীতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর দেহ একটি ছোট শিশুগাছ-রূপে মাটীর উপরে খাড়া হয়ে উঠলো। বন্দিনী মেয়েটি—ছোট হলদেরঙের পাখী হয়ে ছি-ছি—ছি-ছি—ছি—শব্দ করতে করতে উড়ে চলে গেল। সমস্ত বনের গাছপালা স্থির নিস্পন্দ হয়ে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল। খালি সেই বিরাট শালগাছটি—যেন প্রবল ঝড়ে উথাল পাথাল করে লুটোপুটা খেয়ে—হাহাকার কর্ত্তে লাগল।

* * *

রাজার রাজ্য শোকের অন্ধকারে মলিন। রাজাকে খুঁজতে মন্ত্রী গিয়েছেন—তারপর সেনাপতি গিয়েছেন—সৈন্য সামন্তেরা একে একে সকলে গিয়েছে—প্রজাদলও অর্দ্ধেক গিয়েছে—সর্ব্ব শেষে বালক রাজপুত্র পর্য্যন্ত স্বয়ং গেছেন। কেউ আর ফিরে আসেনি। সকলেই নিরুদ্দেশ।

এইবার রাজকুমারী বললেন—আমি যাব।

রাজ্যশুদ্ধ সকলে বারণ করলে। মহারাণী ও রাজমাতা কেঁদে বুক ভাসালেন। রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞা অটল। —হাতী নিলেন না, ঘোড়া নিলেন না, ঢাল তলোয়ার কিছুই নয়। রাজপুত্রের পোষাক—পাগড়ী পরে মা-কালীর হাতের সিঁদুর আঁকা খড়্গ খানি নিয়ে—এক নিশুতিরাত্রে রাজ্য ছেড়ে যাত্রা করলেন একা।

মায়া কানন

শ্রীরাধারাণী দেবী

ছবি ঃ গলিক

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—পথ চলে—রাজকন্যা ক্রমে গিয়ে পৌঁছলেন মায়াকাননে। যথাসময়ে তাঁরও কাণে এল সেই মিষ্টি মেয়েলী গলার করুণ কান্না!

রাজকন্যা চমকে উঠলেন। তারপর ভাবলেন, এই ভয়ঙ্কর গহন-অরণ্যে এরকম করুণস্বরে কাঁদে কে? নিশ্চয় কোনও মায়াবীর মায়া! রাজকন্যা সাবধানে মাকালীর প্রসাদী খাঁড়াখানি মুঠায় চেপে এগিয়ে চললেন—সেইদিক্-পানে। গাছে গাছে পাতায় পাতায় রব উঠতে লাগলো—না—না—না—রাজকন্যা কাণ পেতে সেই নিষেধ বাণী শুনে নিলেন। তারপর যোড় হাতে বললেন—বৃক্ষদেবতাগণ! আমি যেন ভ্রমে না পড়ি আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন। তারপর সেখানে পৌঁছে দেখেন,—নিখুঁত রূপসী অপূর্ব্বলাবণ্যময়ী কন্যা—গাছের গুঁড়িতে কঠিন ভাবে বাঁধা রয়েছে। রাজকন্যা একটু তফাৎ থেকে তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন। মেয়েটি কাতরকণ্ঠে অনুনয়বিনয় করতে লাগলো—ওগো কে এসেছ,—বাঁচাও আমাকে বাঁচাও,—উদ্ধার কর।

রাজপুত্র-বেশী রাজকন্যা বললেন—তুমি কে, পরিচয় দাও। মেয়েটি বললে—আমি এদেশের রাজকন্যা। দস্যু এবং রাক্ষসের হাতে পড়ে এই দুর্গতি ঘটেছে! আগে আমায় মুক্ত কর, তারপর সব বলছি। রাজকন্যা ভুরু কুঁচকে বললেন—রাজার মেয়ে তুমি? দস্যু ও রাক্ষসের হাতে পড়েছিলে? কি করে পড়লে শুনি?

বন্দিনী কাতরস্বরে বললে—খেলতে খেলতে অন্যমনস্কে একা চলে এসেছিলাম এই বনের দিকে। দস্যু ও রাক্ষস বন থেকে বেরিয়ে আমাকে ধরে এনে, বেঁধে রেখে গেছে এইখানে। সাতদিন সাতরাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় এক ভাবেই ঠায় রয়েছি। তৃষ্ণায় জিভ্ গলা বুক শুখিয়ে উঠেছে আর কথা কইতে পারছিনা—এই বলে ঘাড় লটকে একেবারেই নেতিয়ে পড়ল।

রাজকন্যা আবার ভুরু কুঁচকে বললেন.—কিন্তু এক মুহূর্ত্ত আগে তুমি এমন

মায়া কানন

শ্রীরাধারাণী দেবী

করুণ-কণ্ঠে বিনিয়ে বিনিয়ে চিৎকার করছিলে যে, আমি দেড় ক্রোশ দূর থেকে সাড়া পাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে, এতই গলা শুকিয়ে গেল যে, কথা কইতে পারবে না?—কিন্তু আমার সব কথার উপযুক্ত উত্তর না দিলে, তোমায় মুক্ত করতে পারব না।

বন্দিনী এইবার ভয়ে ভয়ে বললে—কি বলতে চাও বল, জবাব দেব।

রাজকন্যা বললেন—তুমি যে বলছ, সাতরাত্রি ঘুমোওনি, সাতদিন খেতে পাওনি,—কিন্তু তোমার চেহারার লাবণ্যে আর গলার চিৎকারে তো তা' মোটেই মালুম হচ্ছে না। এর জবাব দাও।

বন্দিনী জবাব দিতে পারলে না।

তারপর রাজকন্যা বললেন,—আচ্ছা, তোমায় যদি দস্যু ও রাক্ষস এই দশা করে থাকে,—তা'হলে দস্যু তোমার দামী সোণা হীরা জহরৎগুলি লুট্ করে নিলেনা কেন, আর রাক্ষসই বা কিজন্য তোমার এমন নধর দেহের কচি মাংসের লোভ ছেড়ে—অকারণে গাছে বেঁধে রেখে—নিরুদ্দেশ হয়ে গেল?—উপযুক্ত জবাব দাও।

বন্দিনী এবারও কিছু উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেলে না।

আবার রাজকন্যা বললেন,—তুমি যদি এরাজ্যের রাজকুমারীই হও, সঙ্গিনী-শূন্য একা কি করে এই গভীর বনের দিকে এলে তুমি? আর এই সাতদিনেও কি রাজা তাঁর লোকজন সৈন্য সামন্ত দ্বারা তোমার খোঁজ করেন নি এই বনের মধ্যে? একি সম্ভব? বন্দিনী এবারও মাথা হেঁট করে নিরুত্তর রইলো।

রাজকন্যা বললেন—বুঝেচি। আসলে তুমি রাজকন্যাই নও। নিশ্চয় কোনও মায়াবী বা মায়াবিনী। এমনি করে করুণ কান্না কেঁদে মানুষকে ভুলিয়ে এনে, তার সর্ব্বনাশ করো। যাই হোক্, আমার বাপ, ভাই, মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈন্যদল, প্রজাদলের সন্ধান যদি দিতে পার, তোমার মুক্তি দেব। নইলে

এই মা-কালীর খাঁড়া দিয়ে তোমাকে কেঁটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলব।

বন্দিনী কাঁদতে কাঁদতে বললে—না না, কেটোনা, কেটোনা। আমাকে আগে খুলে দাও, তারপর আমি তোমার বাপ ভাইয়ের সন্ধান বলে দেব প্রতিজ্ঞা করছি।



রাজকন্যা বুঝলেন,—এর কাছ থেকে সহজে কথা আদায় হবে না। তিনি তখন 'জয়-মা কালী'—বলে খাঁড়া উঁচু করে কোপ্ উঁচিয়ে তুললেন—সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকারে বন্দিনী মেয়ে এক প্রকাণ্ড রাক্ষস মূর্ত্তি ধরলে। কিন্তু দড়ি দিয়ে তখনও সে গাছের গুঁড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। রাজকন্যা চেয়ে দেখলেন, এ সেই রাক্ষস, যে তাঁর পিতার রাজ্যে গিয়ে উৎপাত করেছিল এবং যার পিছনে ধাওয়া করে রাজা আর রাজ্যে ফেরেন নি।

রাজকন্যা বল্লেন,—আমি তোমায় চিনেচি। এখনও বলো আমার বাবা ও ভাই কোথায়? নইলে স্বয়ং মা-কালীর সিদ্ধ খাঁড়ায় তোমার রাক্ষসজন্ম শেষ করে দেবই।

মায়া কানন

শ্রীরাধারাণী দেবী

রাক্ষস বললে—সামনের ঐ প্রকাণ্ড শালগাছ, ঐ তোমার বাবা। ঐ যে কচি শিশুগাছ, ঐ তোমার ভাই। ঐ যে শাদা তুলোয় ভরা প্রকাণ্ড শিমুলগাছ, ঐ তোমাদের মন্ত্রী মশায়। ঐ যে প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ, ঐ তোমাদের সেনাপতি—আর এরই মধ্যে যে নানারকম গাছ রয়েছে, এরা তোমাদের সৈন্যসামন্ত ও প্রজাদল।—এখন আমায় দয়া করে ছেড়ে দাও।

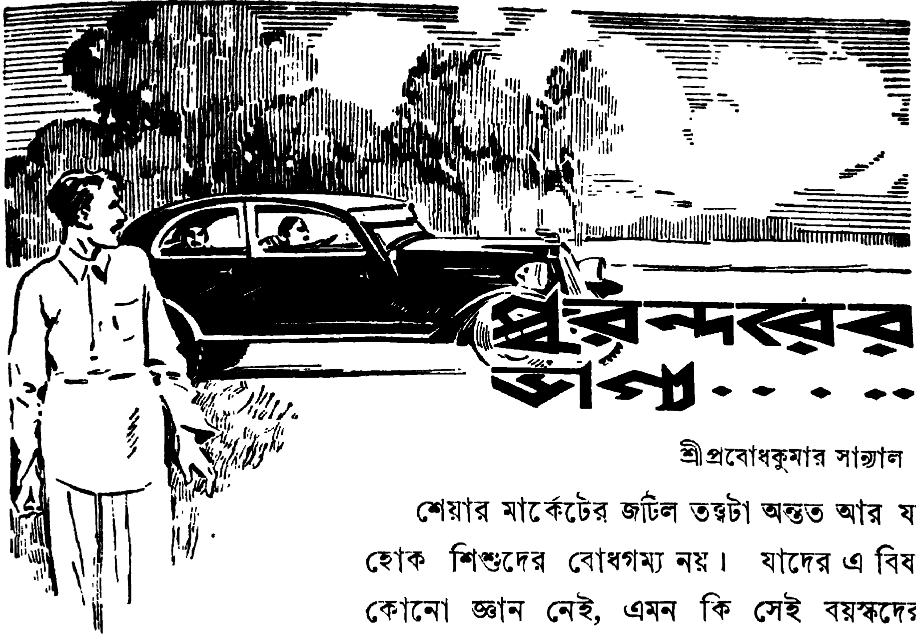
রাজকন্যা বললে—ওদের মুক্তির উপায় বলে দাও—নইলে···

রাক্ষস বললে—প্রত্যেক গাছে একশো আট বার করে হরপার্ব্বতীর নাম জপ করে দিলে ওরা নিজরূপ পাবে। কিন্তু তুমি তো রাজপুত্র। কোনও রাজকন্যা এই জপ করে দিলে তবে হবে। তখন রাজকন্যা পাগড়ী খুলে চুলের রাশি এলিয়ে, সবার আগে শালগাছে ও শিশুগাছে একশো আট বার করে শিবতুর্গা নাম জপ্‌ করলেন। রাজা ও রাজপুত্র বেঁচে উঠেই তাড়াতাড়ি রাজকন্যার হাত থেকে মা-কালীর খাঁড়া নিয়ে সেই তুষ্ট রাক্ষসকে ছুঁড়ে মারলেন। ছুঁলেন না। রাক্ষস তু'খণ্ড হয়ে মাটীতে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মরে গেল।

তখন, রাজকন্যা সেই প্রকাণ্ড বনের সমস্ত গাছগুলিকে মন্ত্রজপের দ্বারা মানুষ চেহারা ফিরিয়ে দিলেন। কত দেশের কত মানুষ যে এখানে এই রাক্ষসের মায়ায় বৃক্ষ হয়েছিল, তার লেখাজোখা নেই। মায়াকাননের সমস্ত গাছগুলি মানুষ হয়ে গেলে সেখানে এক ফাঁকা মাঠ ধূ ধূ করতে লাগল। রাজকন্যা সেই মাঠে হরপার্ব্বতীর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সমস্ত সৈন্যসামন্ত প্রজাদল—মন্ত্রী, সেনাপতি ও বাপ ভাই সহ মহা আনন্দে রাজ্যে ফিরে এলেন।

রাজ্যের লোক আনন্দে ছুটে এল। অন্ধ রাজমাতা শোকাতুরা মহারাণী ছুটে এলেন। রাজ্যশুদ্ধ লোক রাজকন্যার জয়ধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়ে তুললো।


বিবিধ গল্প



পুরন্দরের ভাগ্য....

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

শেয়ার মার্কেটের জটিল তত্ত্বটা অন্তত আর যাই হোক শিশুদের বোধগম্য নয়। যাদের এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই, এমন কি সেই বয়স্কদেরও আমি শিশু বল্‌ব। শেয়ার মার্কেটে আমিও অনভিজ্ঞ শিশু।

কলিকাতার মাঝখানে এক শশব্যস্ত ব্যবসাপল্লীর আশপাশে নিজের কাজে আমাকে ঘোরাফেরা করতে হোতো। রয়েল এক্‌স্‌চেঞ্জের প্রকাণ্ড প্রাসাদের নীচে কত জাতের লোক,—প্রধানত মাড়োয়ারী, তারপর ভাটিয়া, তারপর মুসলমান, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, শিখ, বাঙালী,—সে এক আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন। এইখানেই আমাদের পুরন্দর চৌধুরীর জীবনের উত্থান পতনের নাটক অভিনীত হয়।

পুরন্দর চৌধুরী একজন প্রকাণ্ড ধনী। বনেদী বড়লোক নয়, নিজের ভাগ্য তার নিজেরই সৃষ্টি। দরিদ্র পিতামাতার সন্তান সে। কিন্তু বুদ্ধিবলে ও পরিশ্রমে পুরন্দর অগাধ অর্থের মালিক হ'তে পেরেছে। তার বড় বাড়ী, দামী মোটর, ব্যাঙ্কে আমানতি টাকা, কোম্পানীর কাগজ। অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পুরন্দরকে চাঁদার টাকা দিতে হয়; দরিদ্র ছাত্ররা তার খরচে

পড়াশুনো করে। একথা আমি জানি পুরন্দরের সমস্ত সৌভাগ্যের মূলে আছে কলিকাতার এই ব্যবসাপল্লী; এখানে পাট কোথাও নেই, কিন্তু পাটের একটা-বাজার আছে। এই পাটের বাজারের অদ্ভুত হিসাব পত্রের ভিতর দিয়ে পুরন্দরের মতো মানুষ কোন্ ফাঁকে যে ভাগ্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, আমি সে রহস্যের কোনো সন্ধানই পাইনে।

শোনা যায় লক্ষ লক্ষ টাকার পাট মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই পাড়ায় কেনা বেচা হয়। কে কিন্‌চে, কেবা বেচলো, কে মহাজন; কেবা খরিদ্দার, কে জানে। একটি পাঁটকাঠি নেই, একগাছি পাটের সূতোও নেই,—অথচ ক্রয় বিক্রয়ের মহা ধূমধাম। এই পাটের দালালি আর শেয়ারের বাজারের গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরে পুরন্দর ভাগ্য ফেরালে। পৃথিবীর বাজার দরের সঙ্গে মিলিয়ে এখানেও দর ওঠানামা করে। সারাদিন ধ'রে কেবল একটা অক্লান্ত জুয়াখেলা চলে। এই জুয়াখেলায় পুরন্দরের নাকি আর জুড়ি নেই।

পুরন্দরের নিজের সংসার নেই। পিতামাতা অনেক দিন পরলোকগত, সে একমাত্র সন্তান। বিবাহ সে করেনি, করবেও না। দূর সম্পর্কের আত্মীয় এবং অনাত্মীয়রা এসে পুরন্দরের ঐশ্বর্য্যের ভাগবাটোয়ারা করে। তারা সবাই কে কোথায় ছিল কে জানে, কিন্তু মধুর লোভে মৌমাছির দল এসে ভিড় করেছে।

আমি পুরন্দরকে অনেকদিন থেকে চিনি। যদিচ পাটের জুয়াখেলায় সে ওস্তাদ, তার অর্থলিপ্সা সকলের কাছেই বিদিত, তবু তার মুখে চোখে কোথাও চাতুরীর ছায়া নেই, বুদ্ধির ধারালো চেহারা যেন তার নয়, তার মুখখানা শিশুর মতো সরল। এত বড় সৌভাগ্যে তার যেন নিজের কোনো হাত নেই, টাকা-পয়সা যেন মন্ত্রবলে তার কাছে ছুটে আসে, যেন সম্পূর্ণ দৈব ঘটনা। আমি তার প্রশান্ত চেহারা দেখলে অবাক হয়ে যাই।

পুরন্দরের ভাগ্য

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, পুরন্দরদা, আপনি আজকাল ব্যবসাপল্লীর দিকে যান না কেন?

পুরন্দর বললে, মাঝে মাঝে যাই'ত? ওহে যেতে যেন ভয় করে।

কেন?

আকাশের দিকে পুরন্দর তাকালে। তারপর বললে, গেলেই ত টাকা আসবে, টাকা নিয়ে কী করব, ওর বোঝা বইবে কে?

বললাম, সে কি কথা পুরন্দরদা, টাকার বোঝা বইতে পাওয়া ত সৌভাগ্যের কথা! ওযে লক্ষ্মী!

পুরন্দর নিশ্বাস ফেলে বললে, ভালো লাগে না।

বড়লোক ব'লে পুরন্দরের কোনো অভিমান নেই। সাদাসিধে তার জামা-কাপড়, নিরহঙ্কার তার চালচলন,—ভোগে আড়ম্বর নেই, আসক্তি নেই। স্বভাবটি তার বড় কোমল। আমার মতো গরীব লোকের সঙ্গে তার ছিল গভীর বন্ধুত্ব। আমার সঙ্গে সে মেলামেশা ক'রে ব'লে আমিই লজ্জিত হতাম, কিন্তু তার কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। আমাকে কিছু দান ক'রে সে আমাকে অপমান করবার চেষ্টা করেনি, সে জন্য আমি তাকে সম্মান করতাম। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমার কখনো কুণ্ঠা হোতো না। পাটের জুয়াখেলায় সে যে বিপুল পরিমাণ ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করেছে এজন্য সে যেন কোথায় একটা গভীর লজ্জা অনুভব করতো। লক্ষ লক্ষ টাকার যে মালিক তারো লজ্জা! খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে যার নাম ছাপা হয়, রাজা-মহারাজা গোপনে জমিদারি বাঁধা রেখে যার কাছে টাকা ধার করে, সে বলে ঐশ্বর্য্য তার ভালো লাগে না। দরিদ্র ছাত্রের দল, কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ-মা, ভদ্র বেকার,—এরা যার টাকায় বিপদমুক্ত হয়, সে বলে টাকা তার ভালো লাগে না। দেশে বন্যা এলো, অমনি পুরন্দরের টাকা; দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, পুরন্দরের টাকা। যেন পুরন্দরের টাকার কোনো দাম নেই, পরিমাণ

নেই। জনসাধারণ বড় দরিদ্র, তাই যারা ঐশ্বর্য্যশালী তাদের সর্ব্বস্বান্ত করবার কেমন একটা দুর্দ্দম চেষ্টা মানুষের আছে।

একদিন আবার শেয়ার মার্কেটের ধারে পুরন্দরকে দেখা গেল। আমি তার প্রকাণ্ড দামী মোটরখানাকে চিনতাম। একদিন দেখি কয়েকজন লক্ষপতি মাড়োয়ারি তার মোটরখানাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুরন্দর চৌধুরী এপাড়ায় এলে একটা সাড়া প'ড়ে যায়। সে নাকি পাটের জুয়াড়ীদের গুরু।

মাঝে অনেকদিন পুরন্দরকে দেখিনি। আমি তখন একটা চাকরির চেষ্টায় এখানে ওখানে ঘুরি ফিরি। একদিন খিদিরপুর থেকে ময়দানের ভিতর দিয়ে ফিরছি। হঠাৎ পিছন থেকে একখানা মোটর এসে দাঁড়ালো। চেয়ে দেখি গাড়ীর মধ্যে পুরন্দর। বললাম, এদিকে কোথায় পুরন্দরদা?

পুরন্দর বললে, নতুন নেশা ধরেছে, রেস্ খেলছি আজকাল।

সে কি, আবার জুয়াখেলা।

পুরন্দর বললে, পরশু দিন দেড় লক্ষ টাকা জিতেছি। বাজি ধরলেই টাকা পাই, আশ্চর্য্য! আজ পর্য্যন্ত কখনো লোসকান দিইনি।

বললাম, আপনার ওপর বিধাতার আশীর্ব্বাদ আছে।

তা হবে। যেদিকেই টাকা ছুড়ে দিই, একশো গুণ হয়ে ফিরে আসে। এইবার টাকা জলে ফেলবো।

হেসে বললাম, কি রকম!

পুরন্দর বললে, শীঘ্রই একখানা জাহাজ কিনছি। ওহে ঘোড়দৌড় খেলাটা অদ্ভুত, অদ্ভুত এই জুয়াখেলা, এত উত্তেজনা! কে বলে রেস্ খেলে লোকে সর্ব্বস্বান্ত হয়? তারা নির্ব্বোধ। তারা বে-হিসেবি। এসো, গাড়ীতে তোমাকে পৌঁছে দিই।

বললাম, না, আপনি যান্।

অগত্যা পুরন্দর চ'লে গেল। নির্জ্জন মাঠের রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে আমি তারই কথা ভাবছিলাম। সে যেন কপালে জয়টিকা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। পরিশ্রম নেই, সাধনা নেই, বুদ্ধির কৌশলে রাজোচিত সৌভাগ্যকে সে নিজের দরজায় বেঁধে রাখলে। ধন্য পুরন্দর।

দেশে আমার চাকরি হোলো না, বিদেশে গেলাম একটা ছোট চাকরি নিয়ে। পশ্চিমের সহর পশ্চিমের পথঘাট নতুন লাগল। দারিদ্র্য চলেছে আমার পিছনে পিছনে। সামান্য উপার্জ্জন করি, তাইতেই গ্রাসাচ্ছাদন চলে। দেশের কথা ভুলে গেছি, আত্মীয় পরিজন খোঁজ নেয় না, আমি যেন হারিয়ে গেছি।

এমনি করে তিন বছর কাট্‌ল। নির্ব্বাসিত জীবন আর ভালো লাগলো না। বাংলা দেশের এক গ্রামের ইস্কুলে মাষ্টারির জন্য একখানা দরখাস্ত পাঠালাম। দিন আস্টেক পরে উত্তর এলো। কর্ত্তৃপক্ষ চাকরি দেবার জন্য আমাকে আহ্বান করেছেন। আনন্দ ও উৎসাহে আমি বাংলা দেশের দিকে যাত্রা করলাম!

কলিকাতা থেকে দূরে যশোহর জেলার এক ষ্টেশনে নামলাম। ষ্টেশন থেকে হাঁটা পথ। মাইল দুই গিয়ে ছোট নদী। হিন্তালী গ্রামে যেতে হ'লে নৌকায় কয়েক ঘণ্টা লাগে। বেলা তখন দশটা। আমি নৌকায় চ'ড়ে বসলাম।

দুধারে শ্যামল মাঠ। মাঝে মাঝে নারিকেল, তাল, খেজুরের জঙ্গল। নদীর তীরে তীরে ছোট ছোট গ্রাম। অনেক দিন পরে বাংলার পল্লীর সজল-শ্যামল রূপ বড় সুন্দর লাগলো। ঘাটে ঘাটে কোথাও ছায়াবট, কোথাও আমবাগান, কোথাও গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের জটলা, কোথাও জেলেরা জাল ফেলছে, গাঁয়ের পথ দিয়ে তরকারির বোঝা মাথায় নিয়ে কোথাও চলছে ফড়েরা, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা

পুরন্দরের ভাগ্য

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

নদীর জলে কোথাও সাঁতার কাটছে, মেয়েরা মাজছে—বাসন, কেউ ভরছে ঘট, কোথাও পুরনো মন্দিরে বাজছে কাঁসর ঘণ্টা, কোথাও বসেছে হাট, কোথাও মেলা, কোথাও বহু-রূপীর আসর, কোথাও বা কলহ কোলাহল। নৌকার উপর ব'সে নদীর দুই দিক দেখতে দেখতে চলেছি। পল্লীগ্রামের সহজ সুন্দর জীবন ধারা অনাহত বয়ে চলেছে।

বেলা তিনটে নাগাৎ হিন্তালী গ্রামের ঘাটে এসে আমার নৌকা ভিড়লো। গ্রামখানাও নদীর মতো ছোট। লোকজনের সাড়াশব্দ সামান্য। আমাকে নামতে দেখে কয়েকটি গ্রামের লোক এসে দাঁড়ালো। মহকুমা কাছারি এখান থেকে দূরে নয়। মাঝ পথে একটা ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেইখানেই মাষ্টারী নিয়ে আমাকে এই গ্রামে জীবন যাপন করতে হবে।

কয়েকজন মাতব্বর এলেন। তাঁদের কথাবার্ত্তায় জানা গেল, আমার সংবাদ আগে থেকেই জানাজানি হয়ে গেছে। একজন এগিয়ে এসে বললেন, আপনার থাকার বন্দোবস্ত আমরা ক'রে রেখেছি, আসুন আমার সঙ্গে মাষ্টার মশাই। ওহে লক্ষ্মীকান্ত, ওঁর জিনিষ-পত্রগুলো বাসায় পৌঁছে দাও না হে।

লোকটির পিছু পিছু আমি চললাম। আমার পিছু পিছু আর সবাই আসতে লাগল। আমি শহরের মানুষ, আমার চালচলন তাদের কাছে নতুন। তাদের মধ্যে নানান্ কথার কানাকানি চলছে।

কিছুদূর পথ হেঁটে এসে একখানা চালা ঘরে উঠলাম। সামনে একটু ফুল-বাগান, ভিতর দিকে উঠান, নিকটে একটা কূয়ো। অন্যান্য বন্দোবস্ত ভালো। এই স্কুলেরই আর একজন শিক্ষক এখানে থাকেন। আমার জিনিষপত্রগুলো ওরাই গুছিয়ে দিয়ে একে একে সবাই একসময়ে চ'লে গেল।

স্নান ক'রে উঠলাম। জলযোগ সারা হোলো। চৌকিখানার উপর বিছানা পেতে ব'সে ভাবছি কাল থেকে স্কুলে নিয়মিত পড়াতে হবে, এমন সময় বাইরে

শিশুসাথী পত্রিকা

পুরন্দরের ভাগ্য

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

পায়ের শব্দ হোলো। আমি উৎকর্ণ হয়ে ফিরে তাকালাম। কিন্তু যাকে দেখলাম, সামনে বজ্রপাত হলেও আমি অত চমকাতাম না। চৌকি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললাম, একি পুরন্দরদা, আপনি এখানে? এ যে অবাক কাণ্ড!

সেই পুরনো সুন্দর স্বচ্ছ হাসি। নিরুদ্বেগ প্রসন্ন দৃষ্টিতে পুরন্দর তাকালো। বললে, মাষ্টারী করি যে এখানে।



মাষ্টারী? আপনি করবেন মাষ্টারী? কেন এলেন আপনি দরিদ্র শিক্ষকদের অপমান করতে?

পুরন্দর বললে, আমি তাদের চেয়েও দরিদ্র ভাই।

তার পরণে সাধারণ আধময়লা কাপড়, গায়ে একটা বেনিয়ান্, পায়ে পুরনো চটি। কেমন একটা সন্দেহ হোলো। বললাম, কিন্তু আপনি যে রাজা?

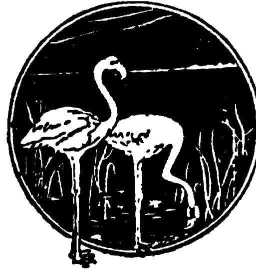
হাসিমুখে পুরন্দর বললে, নেই রে সে সব। জুয়াখেলার ভাগ্যটাই জানিস, দুর্ভাগ্যটা জানিসনে। ওরে, বন্যার প্লাবনকে বিশ্বাস করিসনে। এনে দেয় প্রচুর, কিন্তু পালিয়ে যায় নিঃসম্বল ক'রে। যাক্ এখানে কিন্তু বেশ আছি। কত টাকা দেয় জানিস?

তেমনি নিরভিমান, তেমনি নিরাসক্ত। শোক ও দুঃখের কোনো চিহ্নই তার চেহারায় নেই, বরং কেমন একটা প্রশান্ত উজ্জ্বল ভাব, মুখে চোখে তার অপূর্ব্ব পরিতৃপ্তি। সেদিনকার রাজা ও আজকের ভিখারীর মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই। হাসিমুখে সে বললে, দশ টাকা! দশ টাকা কম নয় একজন মানুষের পক্ষে। আমার কোনো অভাব নেই।

বললাম, কিন্তু এই দুঃখের জীবন—

কে বললে?—পুরন্দর বলতে লাগল, সহজ নিরুদ্বেগ জীবন! এই আমার পর্ণকুটীর, ওই ফুলের চারা, গ্রামের ছেলে মেয়ে, ছোট নদী, এই ত শান্তি, এই ত আনন্দ। দশ টাকায় চলবে না? এর চেয়ে বেশি আমার কী হবে? ওরে, ধনরত্নের মধ্যে শান্তি নেই।

আমার মুখে আর কথা ফুট্‌ল না, স্তম্ভিত হয়ে পুরন্দরের দিকে চেয়ে রইলাম।





ভূতের রোজার

[স ঘটনা]

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

সলোমন দীপপুঞ্জের একটা দ্বীপের নাম মালাইটা দ্বীপ; ভি, ম্যাদার নামক এক সদাগর সাহেব সেই দ্বীপে ব্যবসায় বাণিজ্য করতেন। অল্পদিন আগে তিনি লণ্ডনের কোন মাসিক কাগজে সেই দ্বীপের ভূতের রোজার যে কীর্ত্তির কথা লিখেছেন, তা শুন্‌লে সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু ম্যাদার সাহেব লিখেছেন, তাঁর একটা কথাও মিথ্যা নয়। ঐ অঞ্চলের যে সব নর-রাক্ষস মানুষ খায়—কোন কর্ম্মই তাদের অসাধ্য নয়।

ম্যাদার সাহেব কি লিখেছেন তা তাঁর নিজের কথাতেই বল্‌ছি—শোন।

"আমি যখন মালাইটা দ্বীপে ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলাম, সেই সময় আমার বন্ধু মিঃ বি—ছিলেন জেলার কর্ত্তা। সলোমন দ্বীপপুঞ্জে অনেকগুলি দ্বীপ আছে। মালাইটা দ্বীপটি তাদের সকলের পূর্ব্বে। দ্বীপটি প্রায় একশ' মাইল লম্বা, কিন্তু ত্রিশ মাইলের বেশী চওড়া নয়। সভ্যতার আলো এখনও এ দ্বীপে প্রবেশ করে নি। লোকগুলা নর-রাক্ষস।

পূর্ব্বকালে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের সকল দ্বীপেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বাস করতো, মানুষের মাংসই ছিল তাদের মুখরোচক খাদ্য; কিন্তু একালে কেবল মালাইটা দ্বীপের জঙ্গলেই এই রকম নর-রাক্ষস দেখতে পাওয়া যায়। এই দ্বীপের

মাঝখানে গভীর জঙ্গলে-ঢাকা পাহাড় আছে; রাক্ষসগুলা সেই পাহাড়ে-জঙ্গলে বাস করে। প্রায়ই তারা সেই জঙ্গলের বাইরে আসে না; কিন্তু মাছ, শামুক, ঝিণুক প্রভৃতি জিনিসে তাদের ভারী লোভ; অথচ পাহাড়ের জঙ্গলে ত' ঐ সকল জিনিস পাওয়া যায় না, তাই তারা মাসে একবার সমুদ্রতীরে আসে; জঙ্গল থেকে নানা রকম ফল, শাক সবজি সংগ্রহ ক'রে আনে, তা' দিয়ে মাঝিমাল্লা ও নাবিকদের সংগৃহীত মাছ, শামুক, ঝিণুক গুগুলী প্রভৃতি নিয়ে যায়।

কিছুকাল আগে থেকে ইংরাজরা এই দ্বীপে সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা ক'রে আস্‌চেন। মালাইটায় একজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী থাকেন, আউকি উপসাগরে তাঁর সদর আড্ডা। সেই স্থান থেকে তিনি দ্বীপের বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করেন, গ্রামবাসীদের বিবাদ নিষ্পত্তি করেন, যারা অন্যায় কাজ করে তাদের অপরাধের বিচার করেন। দ্বীপবাসী রাক্ষসগুলা জানে সাদা কর্ত্তার অবাধ্য হ'লে শাস্তি পেতে হবে; এই ভয়ে তারা তাঁর হুকুম মেনে চলে। আমার বন্ধু মিঃ বি—এই দ্বীপের কর্ত্তৃত্ব-ভার পাওয়ার পর তারা কোন দিন তাঁর বিরুদ্ধে হাত তুল্‌তে সাহস করে নি।

পাঁচ বৎসর তিনি এই দ্বীপ শাসন করলেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে শাসন-কার্য্যে তাঁকে কোনও অসুবিধা সহ্য করতে হয় নি; কোন দিন কোথাও শান্তি ভঙ্গ হয় নি। কিন্তু এই পাঁচ বৎসর পরে সরকার এই দ্বীপে একটা নূতন আইন জারী করলেন; হুকুম হ'লো, দ্বীপের প্রত্যেক অধিবাসীকে বার্ষিক ট্যাক্স দিতে হবে। ইংরেজের অধিকৃত অন্যান্য দ্বীপেও এই আইন জারী হ'লো; যাঁদের হাতে বিভিন্ন দ্বীপের শাসন-ভার দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা সকলেই—আমার বন্ধু বি—পর্য্যন্ত এই আইনে আপত্তি করলেন, কারণ তাঁরা জান্‌তেন ঐ সকল নর-রাক্ষসকে বার্ষিক ট্যাক্স দিতে বাধ্য করা তাঁদের অসাধ্য হবে, ট্যাক্স আদায় হবে না। ইংরাজরাজ তাদের মঙ্গলের জন্য সে দেশ শাসন করচেন, আর সে জন্য

যে টাকা খরচ হবে তা তাদের দেওয়া উচিত, একথা তারা স্বীকার করতেই রাজী হবে না, ট্যাক্স দেওয়া ত দূরের কথা!

কিন্তু সরকারের আদেশ পালন করতে হ'ল। দ্বীপের প্রত্যেক লোক নিতান্ত অনিচ্ছায় বার্ষিক ট্যাক্স হিসাবে পাঁচ শিলিং দামের জিনিস সরকারের কর্ম্মচারীদের দিলে বটে, কিন্তু এই ট্যাক্স তারা কেন দিচ্ছে তা' বুঝ্‌তে পার্‌লে না। ট্যাক্সটা জুলুম্-জবরদস্তি ক'রে আদায় করা হচ্ছে—এই রকমই তাদের ধারণা হ'ল। যাহোক, মালাইটা দ্বীপে তিন চার বৎসর এই ভাবে ট্যাক্স আদায় হ'ল; তারপর নির্ম্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল। সে কি রকম মেঘ, আশা করি তা বুঝ্‌তে পেরেছ।

পাহাড়ের যে জঙ্গলের কথা বলেছি, সেই জঙ্গলের মধ্যে নর-রাক্ষসগুলার বাসের গ্রাম। একটা গ্রামে ঐ রকম একটা রাক্ষস বাস করতো, তার নাম কাউয়ারি কাউয়ানো; সে ছিল ভূতের রোজা। কেবল রোজা নয় গ্রামবাসীদের মোড়লও ছিল এই রাক্ষসটা। তার ছেলে আম্বুলা সেই গাঁয়ের কাছাকাছি আর এক গাঁয়ের মোড়লের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। তাদের চোখে সেই বৌটি ছিল পরমাসুন্দরী। আম্বুলা তার বৌটিকে ভারী ভালবাসতো, কিন্তু বিয়ের আগে মেয়েটির বাপের গাঁয়ের একটা যুবক তাকে ভাল বেসেছিল। সেই কথা শুনে আম্বুলা রাগে ক্ষেপে উঠ্‌লো; তারপর তার 'নলা-নলা' বা মানুষ-মারবার লাঠি ঘাড়ে নিয়ে সেই যুবকের খোঁজে বেরিয়ে পড়্‌লো; তাদের গাঁয়ে গিয়ে যেমন তাকে দেখ্‌তে পেলে, আর বুঝ্‌তেই পার্‌চো, ঠেঙ্গিয়ে তার মাথাটি গুঁড়ো ক'রে বাড়ী ফিরে এলো।

যে যুবককে সে খুন ক'রে এলো, সেই যুবকের আত্মীয়েরা ইংরাজ শাসন কর্ত্তা বি-র কাছে নালিশ রুজু কর্‌লে। বি—কয়েকজন পুলিশ নিয়ে আসামী আম্বুলাকে গ্রেপ্তার করতে চল্‌লেন। তিনি আম্বুলাকে গ্রেপ্তার ক'রে কয়েক

ভূতের রোজার ফাঁসি

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

সাক্ষী সমেত সলোমন দ্বীপপুঞ্জের প্রধান নগর টুলাগীতে উপস্থিত হ'লেন। সেখানে আম্বুলার অপরাধের বিচার হ'লো; বি—সাক্ষীদের জবানবন্দী নিয়ে প্রমাণ পেলেন—আম্বুলা সত্যই নরহত্যা করেছে, তখন তিনি আম্বুলার প্রাণদণ্ড করলেন। তার সেখানে ফাঁসি হ'ল।

দ্বীপবাসীদের ধারণা ছিল, আম্বুলা সেই যুবককে হত্যা ক'রে ঠিক কাজই ক'রেছিল। দেশের প্রথা অনুসারে আম্বুলার সে রকম অধিকার ছিল। দেশের ইংরাজ শাসনকর্ত্তা তাদের চিরকালের সংস্কার, তাদের সামাজিক প্রথা অগ্রাহ্য ক'রে আম্বুলার প্রাণদণ্ড করায় তারা ক্ষেপে উঠ্‌লো। আম্বুলার বুড়ো বাপ—সেই ভূতের রোজা গাঁয়ের মোড়ল কি না, সে গাঁয়ের সকল লোককে এক যায়গায় জড়ো ক'রে তাদের বল্‌লে, সাহেব তার ছেলের প্রাণদণ্ড করেছে, সে সাহেবের মাথা নেবে। এ কাযে তাদের সাহায্য চাইলে।

একটা কথা বলা হয়নি। বি—যখন আম্বুলাকে গ্রেপ্তার করতে তাদের গাঁয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই সময় আম্বুলা ধরা না দিয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু সালী নামক একজন পাহারাওয়ালা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ ক'রে একখানা কুটীর থেকে তাকে ধ'রে এনেছিল। এজন্য সেই বুড়ো রোজার সকল রাগ গিয়ে পড়্‌লো সালীর উপর। তারপর একদিন বি—সালীকে খুঁজে পেলেন না। সালী নিরুদ্দেশ! বি—বুঝ্‌তে পারলেন, আম্বুলার বাপ সেই বুড়ো রোজাই সালীকে হত্যা করবার জন্য ধ'রে নিয়ে গিয়েছে।

বি—একদল পুলিশ সঙ্গে নিয়ে সালীকে খুঁজ্‌তে চল্লেন—সেই বুড়ো রোজা কাউয়ারি কাউয়ানোর গ্রামে। তিনি সদলে গভীর রাত্রে গ্রামে প্রবেশ ক'রে দেখ্‌লেন, গ্রামে প্রকাণ্ড মজলিস্ ব'সেছে। সালীকে একটা খুঁটোয় ঝুলিয়ে তার পায়ের নীচে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে; অগ্নিকুণ্ডে শুক্‌নো কাঠ ধূ-ধূ ক'রে জ্বলচে! সেই আগুনের উত্তাপে সালী ছট্‌ফট্ করচে; তার পরিত্রাণের কোন

উপায় নেই! গ্রামবাসীরা সেই অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছে, আর হাত-তালি দিয়ে মনের আনন্দে হা হা, হী হী শব্দে হাস্‌চে। বুড়ো রোজা অগ্নিকুণ্ডের অদূরে ব'সে প্রফুল্ল চিত্তে সালীর নির্য্যাতন দেখ্‌চে, আর সেই অগ্নিকুণ্ডের আগুনের তেজ একটু কম্‌লেই তাতে শুক্‌নো কাঠ দিয়ে পাখার বাতাস দিচ্ছে। সালী সেই আগুনের উপর পা ঝুলিয়ে ঝল্‌সাচ্ছে, আর যন্ত্রণায় কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করচে। বি—বলছিলেন, জীবনে আর কখনো এরূপ ভীষণ দৃশ্য দেখা ত দূরের কথা, তা তাঁর কল্পনা করবারও শক্তি ছিল না। একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় এই পৈশাচিক কাণ্ডের অনুষ্ঠান হয়েছিল।

বি—সদলে সেই স্থানে উপস্থিত হ'য়ে, এই ভীষণ দৃশ্য দেখে' ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুহূর্ত্ত পরেই তাঁর হুকুমে পুলিশের দল সেই উৎসব-মত্ত নর-রাক্ষসগুলিকে তাদের হাতের রাইফেলের কুঁদো দিয়ে পিটুতে আরম্ভ কর্‌লো। বুড়ো রোজাটা বিপদ বুঝ্‌তে পেরে এরকম কৌশলে কোথায় স'রে পড়্‌লো যে, তার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

বি—সেই রাত্রে সদলে সেই গ্রামেই বাস করলেন; পরদিন সকালেও রোজাটাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য গ্রামের সকল যায়গায় খোঁজ করলেন; কিন্তু তার টিকি দেখ্‌তে পেলেন না। রাত্রে অর্দ্ধদগ্ধ সালীকে উদ্ধার করা হয়েছিল। তিনি তাকে নিয়ে আউকির সদর আড্ডায় ফিরে এলেন। অনেক চেষ্টায় তার প্রাণরক্ষা হ'ল।

বুড়ো রোজাটা এবার বি—সাহেবকে হত্যা করবার জন্য ক্ষেপে উঠ্‌লো; সে অন্যান্য গ্রামের মোড়লদের ও নিজের গ্রামের সকল লোককে এক যায়গায় জড়ো ক'রে বল্‌লে, 'তোরা সরকারকে ট্যাক্স দিস্। ঐ বি—সাহেবটাই ত সরকার; সে ছাড়া আর কেউ সরকার নয়। যদি তোরা ঐ সাহেবটাকে

সাবাড় করিস্, তাহ'লে আর কখন তোদের ট্যাক্স দিতে হবে না। ওকে খুন করলেই তোরা বেঁচে যাবি। এবার ওকে খুন করাই চাই।'

খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়্লো; বি—সাহেবও তা' শুন্তে পেলেন। তিনি সাহসী লোক, এসকল কথা গ্রাহ্য কর্লেন না, অসভ্য বুনো প্রজাগুলাকে তিনি ভয় করবেন? ছিঃ।

ট্যাক্স আদায়ের সময় হ'ল। বি—সাহেব তাঁর 'আউকি' জাহাজে 'সিনিয়া-রাঙ্গোর' বন্দরে চল্লেন। সেখানে একখানা ঘর ছিল; সকল লোক সেই ঘরে এসে ট্যাক্স দিয়ে যেত, বি—সাহেব সেই ঘরে প্রবেশ করবেন, সেই সময় তাঁর সেই বিশ্বাসী পাহারাওয়ালা সালী তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে তাড়াতাড়ি জাহাজে চলে যেতে বল্লে; সাহেব সেখানে হাজির থেকে ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা করলেই লোকগুলা তাঁকে কেটে ফেল্বে—এ কথা তাঁকে জানিয়ে সতর্ক হ'তে বল্লে। কিন্তু বি—সাহেব তার কথা গ্রাহ্য করলেন না; তিনি তাদের ভয় করেন না এ কথা তাদের বুঝিয়ে দেবার জন্য তাঁর ও তাঁর সহকারীর পিস্তল দুটো জাহাজে পাঠিয়ে দিলেন; তারপর বিভিন্ন দলের মোড়লদের ডেকে বল্লেন, 'তোরা না কি আমাকে খুন করবার পরামর্শ করেছিস্? আমি সে খবর পেয়েছি; কিন্তু আমি তা' বিশ্বাস করি নি; এজন্য আমরা অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে রাখি নি, খালি হাতে তোদের কাছে এসেছি।'

বুড়ো রোজাটা সাম্নে এসে মোড়লদের ডেকে বল্লে, "হাঁ, সাহেব দুটোর সঙ্গে অস্তর নেই বটে, কিন্তু ষোলজন পুলিশ রাইফেল নিয়ে ঐ ধারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, তা দেখেছিস্? সাহেবের ভারী সাহস, হী-হী!"

সাহেব বুড়ো রোজার কথা শুনে তাঁর সেই ষোলজন পুলিশ রক্ষীকে তাদের রাইফেলগুলা দূরে সরিয়ে রাখ্তে বল্লেন। রক্ষীরা সাহেবের বিপদ বুঝ্তে পেরে তাঁর আদেশ পালন কর্তে রাজী হ'ল না; রক্ষীদের সর্দ্দার সাহেবকে

বল্লে, 'হুজুর, বনের মানুষগুলা এসেছে শড়কি, বর্শা নিয়ে, আর আমরা রাইফেল-গুলা দূরে রেখে আস্‌ব, এ বড়ই বোকামী হবে, ও বেটাদের মতলব ভাল নয়।'

সাহেব চক্ষু লাল ক'রে বল্‌লেন, 'জল্‌দি আমার হুকুম তামিল করো।'

তাই হ'ল; রাইফেলগুলো তারা দূরে রেখে এ'ল। তারা তাঁবেদার, উপরআলার হুকুম তামিল করতে তারা বাধ্য।

বুড়া রোজা দেখ্‌লে—এবার সে সহজেই কাজ শেষ করতে পারবে; তখন সে একখান কাগজ হাতে নিয়ে সাহেবের সাম্‌নে গিয়ে বল্‌লে, 'আমাদের একটা আরজ আছে, এইটা আগে গ্যাখ্‌ সাহেব!'

বি—সাহেব কাগজখানি হাতে নিয়ে, মুখ নামিয়ে দেখতে লাগ্‌লেন। সেই সময় বুড়ো রোজা একটা পুরোনো রাইফেলের ভাঙ্গা কুঁদো বের ক'রে তা' দিয়ে সাহেবের মাথায় এমন জোরে ঘা' মা'র্‌লে যে, সাহেবের মাথা ফেটে, দু'ফাঁক হ'ল। রোজার দলের লোকগুলো সেই মুহূর্ত্তে আহত সাহেব এবং তাঁর সহকারীকে আক্রমণ ক'রে দু'জনকেই হত্যা কর্‌লে; তারপর সাহেবের নিরস্ত্র পুলিশ রক্ষীদের ওপর লাফিয়ে প'ড়ে প্রত্যেককে খুঁচিয়ে মারলে; তাদের একজন ভিন্ন কেউ বেঁচে থাক্‌ল না। রক্ষীদলের কেবল একজন নদীতে লাফিয়ে প'ড়ে সাঁতার দিয়ে জাহাজে উঠ্‌লো। এই ভাবে পালিয়ে সে প্রাণ রক্ষা কর্‌লে বটে কিন্তু তারও পিঠ তিনটে বর্শার খোঁচায় ফুটো হ'য়েছিল। এই লোকটা সেই সালী—বুড়ো রোজা যাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা ক'রেছিল।

সালী জাহাজে উঠে জাহাজের সুখানীকে সকল কথা বল্‌লে। সুখানী ভয়ে নদী তীরে জাহাজ ভিড়োতে সাহস করলে না। বুড়ো রোজা লড়াই ফতে ক'রে, হল্লা কর্‌তে কর্‌তে ঘরে ফির্‌লো। তার দলের একজন বি—সাহেবের সহকারীর হাত কেটে নিয়ে চল্‌ল—খাবে ব'লে!

ইংরাজ সরকারের সদর আড্ডা টুলাগিতে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পৌঁছুলে,

ভূতের রোজার ফাঁসি

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

অষ্ট্রেলিয়ান নৌ-বহরের 'এডিলেভি' নামক রণতরী সিনিয়ারাঙ্গোর বন্দরে উপস্থিত হ'য়ে নদী তীরস্থ পাহাড়ের ওপর কয়েকটা বোমা বর্ষণ করলে; তার পর একদল নৌ-সৈন্য রণতরী থেকে নেমে গ্রামগুলোর ভিতর প্রবেশ করলে, এবং মোড়লদের আটজনকে গ্রেপ্তার ক'রে টুলাগিতে নিয়ে চল্‌লো; সেখানে তাদের বিচারের পর চারজন অপরাধীর ফাঁসি হ'লো।



এই সংবাদে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ খুসী হ'লেও টুলাগির কর্ত্তারা সন্তুষ্ট হ'তে পার্‌লেন না; সেখানে যে সকল ইংরাজ ছিলেন, তাঁরাও অপরাধীদের সেই শাস্তি যথেষ্ট ব'লে মনে কর্‌লেন না। কারণ পালের গোদা আসল অপরাধী সেই বুড়ো রোজাটা তখন পর্য্যন্ত ধরা পড়ে নি; তার অপরাধের বিচারও হয় নি। এই জন্য তাদের বিরুদ্ধে আর এক দল ফৌজ পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। সালী সেই দ্বীপের অন্যদিক দিয়ে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌লো। সালী তার সাহস ও বিশ্বস্ততার জন্য সার্জেণ্টের পদে নিযুক্ত হয়েছিল। একটা গুপ্ত পথে সৈন্যেরা গ্রামে প্রবেশ ক'রে গ্রাম্য সর্দ্দার সেই বুড়ো রোজাকে গ্রেপ্তার করলে, তার কয়েকজন সঙ্গীও ধরা পড়্‌ল।

সৈন্যেরা অন্যান্য বিদ্রোহীদের শিক্ষাদানের জন্য, এবং সরকারের প্রতিনিধিদের প্রতি অত্যাচার করলে কি রকম শাস্তি পেতে হয় তা' বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সেই দ্বীপের ছয়খান গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করলে; তারপর তারা সেই বুড়ো রোজা ও তার বদমায়েস সঙ্গীগুলাকে নিয়ে টুলাগিতে ফিরে এসে তাদের সকলকেই ফাঁসে লট্‌কিয়ে দিল।"





গঙ্গারামের কুকুরছানা

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

গঙ্গারাম সাণ্ডেল। বয়স সাত বৎসর। একদিন সকালে বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গারাম মিত্তিরদের বাগানের ধারে আসিয়া হাজির। বাগানে খুব মোটা মোটা বেড়া। বেড়ার কাছেই একটা পেয়ারা গাছ। বাঃ, ডাঁশা ডাঁশা পেয়ারা যেন ধরিয়াছে। একবার বেড়াটা টপকাইতে পারিলে—আহা, তোফা! গঙ্গারাম বেড়ার গায়ে খানিকটা উঠিয়াও পড়িয়াছে, এমন সময় ঐ যেন মালীটা! নাঃ, হইল না। গঙ্গারাম নামিয়া পড়িয়া ভালমানুষটির মত একপাশে দাঁড়াইল।

টুং টুং টুং—গলায় দড়িবাঁধা একটা কালো-সাদা কুকুরছানা এদিক ওদিক ঘাস শুঁকিতে শুঁকিতে গঙ্গারামের কাছে আসিয়া হাজির। তাহার গলায় ছোট ছোট দুইটি ঘুঙুর। গলার দড়ি খানিকটা ঝুলিয়া আছে। সেই দড়ি মাঝে মাঝে পায়ের তলায় চাপা পড়িয়া ছানাটা হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে।

গঙ্গারামের সামনে দাঁড়াইয়া ছানাটা তাহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইল। গঙ্গারামও তাহাকে দেখিল। ছানাটা একটু ল্যাজ নাড়িয়া

গঙ্গারামের দিকে আগাইয়া আসিল। গঙ্গারাম হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিল। ছানাটা আর একটু জোরে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে কাছে আসিল। গঙ্গারাম দুই একবার তাহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া দিল। ইহাতে ছানাটা যেন গলিয়া গেল। গঙ্গারামের পায়ের উপর আনন্দে ঝাঁপাইয়া পড়িল। গঙ্গারাম হঠাৎ ছানাটার মাথায় জোরে এক চাপড় মারিল। চাপড় খাইয়া কুকুরটা যেন হতভম্ব হইয়া গেল। এত ল্যাজনাড়ার এই ফল? বেচারা গঙ্গারামের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার দুইপায়ের মধ্যে লুটাইয়া পড়িল। গঙ্গারাম তাহাকে—দুষ্টু, হতভাগা বলিয়া খানিকটা



গালাগালি দিল। ছানাটা তখন পিঠের উপর শুইয়া উপর দিকে পা তুলিয়া কেঁউ কেঁউ করিয়া অনেক কথা জানাইল। তার পর দুই-পা ও মুখ একসঙ্গে জড়ো করিয়া যেন গঙ্গারামকে কি প্রার্থনা জানাইল। গঙ্গারাম ছানাটাকে

গঙ্গারামের কুকুরছানা
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

এইভাবে দেখিয়া খুব হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল। ছানাটাও মজা পাইয়া বার বার পায়ে—মুখে এক করিতে লাগিল।

কতক্ষণ আর এ খেলা ভাল লাগে? গঙ্গারাম ছানাটাকে ছাড়িয়া বাড়ীর দিকে চলিল। কুকুরছানা ছাড়িবার পাত্র নয়। সে গঙ্গারামের পিছু ধরিল। গঙ্গারাম রাস্তায় একবার এটা দেখে, একবার সেটা দেখে। কখনও দাঁড়ায়, কখনও জোরে হাঁটে। পিছন ফিরিয়া দেখে, ছানাটা ঠিক সঙ্গে আছে। তখন সে একটা ভাঙ্গা কঞ্চি লইয়া ছানাটার পিঠে দু'চার ঘা বসাইয়া দিল। ছানাটা কেঁউ কেঁউ করিয়া একটু কাঁদিল। তারপর আবার গঙ্গারামের পিছনে পিছনে চলিল।

গঙ্গারাম পথের মধ্যে তিন চারবার ছানাটাকে এই শাস্তি দিল। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, ঠিক পিছু ধরিয়া চলিল।

গঙ্গারাম যখন তাহার বাড়ীর দরজায় পা দিল, ছানাটা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, বাড়ীতে ঢুকিবে কিনা। গঙ্গারাম ভিতরে ঢুকিয়া দালানের সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল। বসিয়া দেখে, তাহার পায়ের কাছে ছানাটাও বসিয়া।

—"বা রে, পাজি, সঙ্গে এসেছিস বুঝি! দাঁড়া তবে।"—বলিয়া গঙ্গারাম ছানাটার গলার দড়ি ধরিয়া টানিতে টানিতে দালানে লইয়া গেল। সেখান হইতে উপরে লইয়া চলিল। ছানাটা বড় বড় সিঁড়িতে অনেক কষ্টে উঠিতে-ছিল। কিন্তু কে তাহার কষ্ট দেখে? গঙ্গারাম তাহাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। ছানাটা হাঁপাইতে লাগিল।

উপরে উঠিয়া গঙ্গারাম একটা ঘরে বসিয়া পড়িল। বাড়ীর লোক সেখানে তখন কেহই ছিল না। একটু পরেই তাহার মা, দিদি, ও ভাইরা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুকুরছানা দেখিয়া সকলেরই রাগ। গঙ্গারামের মা বলিলেন—"এই রাস্তার কুকুরটাকে কোথা থেকে নিয়ে এলি? তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে।"

তাহার দিদি বলিল—"গঙ্গা, তুই কেমন ছেলে রে? রাস্তা থেকে এটা কুড়িয়ে আনলি? কেন? বাবাকে বল্‌লে তো হ'ত, একটা কিনে দিতেন।"

ছোটবোন বলিল—"এ ম্যা, কি বিচ্ছিরি!"

গঙ্গারাম এবার চটিয়া গেল। সকলের কথা সহ্য করা যায়,—কিন্তু ছোট বোন টুনির কথাও কি সহ্য করিতে হইবে? সে চটিয়া-মটিয়া টুনিকে বলিল—"বেশ করেছি, তোর কি? আমার খুসী, আমি আন্‌ব।"

এমন সময় গঙ্গারামের বাবা হরিবাবু সেখানে আসিলেন। তিনি খুব রাগী লোক ছিলেন। তিনি কুকুর দেখিয়াই আগুন। বলিলেন—"কে এটা আনলে রে?"

টুনি বলিল—"দাদা এনেছে, আবার কে?"

হরিবাবু চিৎকার করিয়া বলিলেন—"গঙ্গে, দূর ক'রে দিয়ে আয় কুকুরটাকে এখুনি বল্‌ছি। যা।"

গঙ্গারাম ভয়ে ভয়ে কুকুরছানাটাকে লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

* * *

পরদিন সকাল বেলা দেখা গেল, বৈঠকখানা ঘরের এক কোণে আলমারির খুরোর সঙ্গে কুকুরটা বাঁধা রহিয়াছে। হরিবাবু বৈঠকখানা ঘরে কুকুর দেখিয়া আবার রাগারাগি করিলেন। গঙ্গারামকে ডাকিয়া কুকুর দূর করিয়া দিতে বলিলেন। গঙ্গারাম কুকুর লইয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল।

বেলা হইয়া গিয়াছে। গঙ্গারামের দেখা নাই, নাওয়া নাই, খাওয়া নাই। বাড়ীর লোকে খোঁজাখুঁজি করিতে করিতে দেখিল, বাড়ীর কাছে এক মাঠে একটা গাছের তলায় গঙ্গারাম ঘুমাইতেছে, আর তাহার পাশে কুকুরছানাটা শুইয়া আছে। অনেক ডাকাডাকি করিতে তবে গঙ্গারাম কুকুর লইয়া বাড়ী

আসিল। তাহার মা কত বুঝাইয়া বলিলেন—"গঙ্গু, ছেড়েদে কুকুরটাকে; তোর বাবার রাগ জানিস্ তো?"

গঙ্গারাম কোনো কথা বলিল না। সে কুকুরকে গোয়ালঘরের এক কোণে বাঁধিয়া রাখিল। সে যখনই কোথাও যায়, কুকুরছানা তাহার সঙ্গে থাকে।



বাড়ীতে ঘর-দোরে ঢুকিলে কেহ তাহাকে লাথি মারে, কেহ বা বেত মারে; আর হরিবাবু তাহাকে একদিন জুতাশুদ্ধ লাথি মারিয়া রক হইতে এমন ফেলিয়া দিলেন যে, তাহার একটা পা প্রায় খোঁড়া হইয়া গেল। গঙ্গারাম কাঁদিতে কাঁদিতে ছানাটাকে কোলে করিয়া লইয়া গেল। কোথা হইতে একটু আইডিন ও তুলা জোগাড় করিয়া সে ছানাটার পায়ে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল।

সেইদিন হইতে ছানাটা গঙ্গারামের সব সময়ের সাথী হইয়া উঠিল। এমন কি, শুইবার সময়েও সে ছানাটাকে লুকাইয়া বিছানার কাছে রাখিত। সকাল-বেলা গঙ্গারামের ঘুম ভাঙ্গিবার আগে ছানাটাকে দেখিতে পাইলে কেহ ঝাঁটা, কেহ বা ছড়ি বা কয়লা দিয়া তাহাকে মারিত। আর ছানাটা এ-ঘর সে-ঘর

টেবিলের তলা, আলমারীর নীচে ছুটিয়া লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিত। কিন্তু যেদিন গঙ্গারামের বাবা কুকুর পোষার জন্য গঙ্গারামকে মার দিতেন, সেদিন ছানাটার বড় দুর্দ্দশা হইত। সে একবার টেবিলের তলায় পলাইত, আবার গঙ্গারামের কান্না দেখিয়া তাহার কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিত।

এই রকম বিপদে গঙ্গারামের মাথা বিগড়াইয়া যাইত। সে মার খাইয়া রাগিয়া গিয়া ঘটি, বাটি, ছাতা যাহা পাইত তাহা দিয়াই কুকুরছানাটাকে মারিত। ছানাটা কোনোরকমে আলমারীর পাশে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইত। আবার গঙ্গারাম উঠিয়া পড়িলে সে তাহার পিছু লইত। এই রকমে খাবার ও বেড়াইবার সময়ে যেমন, তেমনি গঙ্গারামের বিপদের সময়েও কুকুরছানাটা তাহার নিত্যসঙ্গী হইয়া উঠিল।

* * *

সুখে দুঃখে কুকুরছানাটা বড় হইতে লাগিল। তাহার গলার আওয়াজও ভারী হইতে লাগিল। ডাকেও বেশ। কে তাহাকে বেশী মারে, কাহার সাম্নে যাওয়া উচিত নয়, বা যাইলে মারিবে, এবং কেহ মারিতে আসিলে কোন্‌খানে কেমন ভাবে লুকাইবে,—এসব কাজে ছানাটা পোক্ত ও চালাক হইয়া উঠিল। তাহার ছোট্ট দেহ আর ছোট্ট মনের মধ্যে অনেকখানি ভালবাসা জমিয়া উঠিল। সে ভালবাসা গঙ্গারামের জন্য। গঙ্গারাম যখন স্কুলে যাইত ছানাটা তখন দরজার কাছে মুখ চূণ করিয়া বসিয়া পড়িত। আর গঙ্গারাম ফিরিয়া আসিলে তাহার পায়ে উঠিয়া, ল্যাজ নাড়িয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে অনন্দে আটখানা হইয়া যাইত। গঙ্গারাম তাহাকে দুই-একটা চাঁটি মারিলে সে আনন্দে আরও লাফাইতে থাকিত।

গঙ্গারাম যখন মাঝে মাঝে অন্য পাড়ায় কোনো বন্ধুর বাড়ী যাইত, তখন ছানাটা কখনও পিছনে, কখনও তাহার সামনে সামনে চলিত। সাম্নে

দিয়া যখন যাইত, তখন তাহার কত গর্ব্ব! প্রভুকে সে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। পথের বাঁকে বাঁকে সে পিছন ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিত, গঙ্গারাম কোন্ দিকে আসে।

একদিন বড় দুঃখের দিন আসিল। গঙ্গারামের বাবা হরিবাবু কি কারণে যেন রাগিয়া আগুন হইয়া গিয়াছেন। তিনি ছেলেমেয়েদের খুব মারধোর করিতেছেন, এবং ঘটি, বাটি, থালা, গেলাস সব ছুঁড়িয়া ভাঙ্গিতেছেন। এমন সময় গঙ্গারাম খেলার মাঠ হইতে কুকুর লইয়া উপরের ঘরে একেবারে না বুঝিয়া বাপের সাম্‌নে আসিয়া পড়িল। সাম্‌নে আসিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিতেই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এ রকম বিপদে সে যাহা প্রায়ই করিত এবারও তাহাই করিল। তাড়াতাড়ি একটা বড় টেবিলের নীচে সে লুকাইয়া পড়িল। কুকুরছানাটা তখন সিঁড়ির ধারে ছিল। গঙ্গারামকে লুকাইতে দেখিয়া সে ভাবিল যে, গঙ্গা বুঝি তাহার সঙ্গে খেলা করিবার জন্য অমন করিল। সে তাড়াতাড়ি তিন চারটি লাফ দিয়া টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

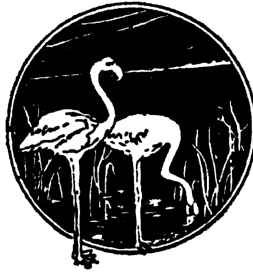
হরিবাবু কুকুরটাকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া বল্লিলেন—"এই যে হতচ্ছাড়া কুকুর—দাঁড়াও আজ দেখাচ্ছি।"—বলিয়াই তিনি একটা চীনা মাটির বাসন লইয়া কুকুরটার মাথার উপর ছুঁড়িয়া মারিলেন।

কেঁউ কেঁউ—বিকট শব্দ করিতে করিতে একবার গঙ্গারামের কাছে ও একবার ঘরের মেঝেয় লুটোপুটি খাইতে লাগিল। গঙ্গারাম হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে টেবিলের তলা হইতে বাহিরে আসিল।

হরিবাবুর রাগ তখনও বিষম। তিনি কুকুরটাকে এক লাথি মারিয়া ঘরের এ কোণ হইতে ও কোণে ছুঁড়িয়া দিলেন। ছানাটা কাতর আর্ত্তনাদ করে, আর পিঠের উপর শুইয়া পা তুলিয়া কত মিনতি জানায়। তাহার পিঠের হাড় তখন বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গঙ্গারাম দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে তুলিয়া লইল, এবং ঘর হইতে পালাইবার চেষ্টা করিল।

হরিবাবু সঙ্গে সঙ্গে ছানাটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহার একটা পা ধরিয়া জানালা দিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেন। গঙ্গারাম বিষম চীৎকার করিতে করিতে নীচে ছুটিয়া গেল।

রাত্রি তখন প্রায় ৯টা। রাগারাগি-হাঙ্গামার জন্য কেহই তখনও গঙ্গারামের খোঁজ করে নাই। পরে সকলের হুঁস হইলে গঙ্গারামের খোঁজ পড়িল। আলো লইয়া একটা চাকর দেখিতে পাইল, নীচে একটা ইটের গাদার পাশে গঙ্গা বসিয়া আছে, আর তাহার পাশে মরা কুকুরছানাটা রহিয়াছে। *



* ইংরেজি গল্পের ছায়া লইয়া লিখিত



বামাচরণের গুপ্ত-ধন প্রাপ্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বামাচরণের জন্মের সময় নকীপুরের যদু চক্কোত্তি বলেছিলেন এ ছেলে একদিন রাজা হবে। যদু চক্কোত্তি এ অঞ্চলের মধ্যে একজন বড় জ্যোতিষী, তাঁর কথার দাম আছে। কিন্তু বামাচরণের জন্মদিনটীর পরে বহু বছর কেটে গিয়েচে, রাজা হওয়া তো দূরের কথা, রাজসভার একজন ভাল গোছের প্রহরী হবার লক্ষণও তো বামাচরণের মধ্যে দেখা যাচ্চে না।

অল্পবয়সে বামাচরণ তার মামার বাড়ী থেকে স্কুলে পড়তো। ফোর্থক্লাসে উঠবার সময় ফেল করে সে লেখাপড়া দিলে ছেড়ে। বল্লে ছোট ছোট ছেলেরা উঠবে নীচে থেকে আমার ক্লাসে—তাদের সঙ্গে পড়তে লজ্জা করে।

সুতরাং বামাচরণের লেখাপড়া হোল না। মামারা বল্লে—লেখাপড়া যদি না কর বাপু, তবে এখানে বসে বসে অন্নধ্বংস করে আর কি করবে, বাড়ী চলে যাও।

বাড়ী এসে যখন সে বসলো, তখন তার বয়েস চৌদ্দ, পনেরো বছর। অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, সেখান থেকে চাকুরীর চেষ্টা করা চলে না। এই সময় তার

বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক ভগ্নিপতি তাদের বাড়ীতে এলো কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে। তিনি পশ্চিমে কোথায় রেলে চাকুরী করেন, বামাচরণকে উপদেশ দিয়ে গেলেন—টেলিগ্রাফ শিখতে। তাহোলে রেলে চাকুরী হবার সম্ভাবনা আছে।

কলকাতা থেকে তিনি বামাচরণকে একটা টেঁকিকলও আনিয়ে দিয়ে গেলেন আর টেলিগ্রাফ শিখবার একখানা বই। বামাচরণ সর্ব্বদা গম্ভীর চালে থাকতো, সমবয়সী ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে মিশলে তার মান যাবে। আর একটা মজা ছিল তার, সে তাদের নানারকম বৈষয়িক উপদেশ দিত।

যেমন হয়তো ছেলের দল ওদের বাড়ীর সামনে কথ্‌বেলের গাছে উঠে, মহা হৈ চৈ করচে, ও এসে গম্ভীর মুখে বল্লে—এই সব, নাম্‌ গাছ থেকে, নাম্‌।

হয়তো সবাই হুড়মুড় করে নেমে পড়লো গাছ থেকে।

বামাচরণ বল্লে—কথ্‌বেল তো খাচ্ছিস্‌, এদিকে ঘরে যে অনেকের চাল নেই, সে গোঁজ রাখিস্‌?

শুধু কথ্‌বেলে কি আর পেট ভরবে? যা যাতে দুপয়সা রোজগার হয় তার চেষ্টা করগে যা।

বামাচরণের বিজ্ঞধরণের কথাবার্ত্তায় বেশ কাজ হোল। পাড়াগাঁ জায়গায়, সকলেরই অবস্থা অল্পবিস্তর খারাপ, প্রত্যেক ছেলেই জানে যে তার বাপ-মার অবস্থা ভাল নয়। অতএব বামাচরণের কথায় অনেকেরই মনের মধ্যে কোথায় ঘা লাগলো—তারা মাথা নীচু করে যে যার বাড়ী চলে গেল।

এই সময়েই ওর ভগ্নিপতি এসে ওকে টেঁকিকল দিয়ে গেলেন।

গ্রামের ছেলেরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতো, বামাচরণ দিন রাত গম্ভীর মুখে ওদের বাড়ীর পশ্চিমের ঘরে বসে টেঁকিকলটাতে টরে টকা অভ্যেস্‌ করচে।

বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, দোল নেই, রাস নেই, শনিবার—রবিবার নেই।

কি সে অধ্যবসায়! দ্রোণাচার্য্যের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখতে অর্জ্জুনও বোধ হয় এত অধ্যবসায়, এত মনোযোগ দেখান নি—তিনি মল্লভূমিতে কাঠের বিবিধ পাখী বিদ্ধ করে যতই নাম করুন গিয়ে। বৎসর খানেক টেলিগ্রাফ শেখবার পর বামাচরণ রেলে চাকুরীর চেষ্টা করলে—কিন্তু অদৃষ্ট দোষে কোথাও কিছু হোল না। গাঁয়ের ছেলেদের সে বলতো—জানিস্? ই আই রেলের টি আই সাহেব আমার দরখাস্তের জবাব দিয়েচে! তার নিজের হাতের সই আছে।

ছেলেদের মধ্যে দু একজন সম্ভ্রমের সঙ্গে জিজ্ঞেস্ করতো—কি লিখেচে বামাচরণ দা?

—লিখেচে এখন চাকুরী হবে না, পোস্ট খালি নেই। খালি হোলে জানাবে। দাঁড়া—

তারপর সে পশ্চিমের কোঠায় তার ঘর থেকে একখানা লম্বা খাম নিয়ে এসে তার মধ্যে থেকে ছোট্ট একটা ইংরাজি-লেখা কাগজ বার করে সকলের সামনে বাতাসে দুবার উঁচু করে উড়িয়ে বলতো—এই ছাখ্।

কিন্তু এত করেও কিছু হোল না, মাসের পর মাস যায়, টি আই সাহেবের সে চিঠি আর এসে পৌঁছুলো না।

হঠাৎ মেঘ-ভাঙা আকাশে একদিন চাঁদ উঠল। বামাচরণের পিতা ছিলেন সেকালের ফৌজদারী কাছারীর নাজির। যখন তিনি মেহেরপুরে, সে সময় বম্‌পাশ্ সাহেব মেহেরপুরের জয়েণ্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট। সাহেব নাজির মশায়কে খুবই খাতির করতো, ভালও বাসতো।

বামাচরণের বাবা বৃদ্ধ বয়সে পেনসনভোগী অবস্থায় নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসে সমবেত বৃদ্ধমণ্ডলীর কাছে চাকুরী জীবনের গল্প করতে করতে বলতেন, বম্‌পাশ্

সাহেবকে তো আমিই কাজ শিখিয়েচি। ছোক্‌রা সিভিলিয়ান, নতুন বিলেত থেকে এসেচে তখন—ট্রেজারির আফিসের হিসেব রাখতে রাখতে জান বেরিয়ে যেতো। আমায় বলতো—শোনো নাজির, এ আমার পোষাবে না, গাঁজা আফিমের হিসেব রাখতে আর ওজন করতে করতে প্রাণ বেরুলো। কত কষ্টে বুঝিয়ে সাহেবকে শান্ত করতুম।

সে গ্রামে গবর্ণমেণ্টের চাকুরী বামাচরণের বাবা ছাড়া আর কেউ করেনি—সবাই হাঁ করে থাকতো। পেন্‌সনও ভোগ করচেন তিনি আজ ২২।২৩ বছর কি তারও বেশী।

বামাচরণের বয়স যখন ১৮।১৯ বছর, তখন বামাচরণের বাবা গ্রামে বসে 'হিতবাদী' কাগজে দেখলেন, বম্‌পাশ্‌ সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর হয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এসেচে।

তিনি গেলেন কলকাতায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। বম্‌পাশ সাহেবও আর ছোকরা নেই, পঞ্চাশের ওপর বয়েস হয়েচে। পুরোনো নাজিরকে চিনতে পারলে, জিগ্যেস্‌ করলে—আমি তোমার কি উপকার করতে পারি, নাজির?

এক কথায় বামাচরণের চাক্‌রীর ঠিক হয়ে গেল। খুলনায় সার্ভে ক্যাম্প পড়েচে, জমি জরীপ হচ্চে। বামাচরণ সেখানে চাকুরী পেল, ত্রিশটাকা মাইনে, এরপর আরও বাড়বে। বাড়ী এসে বামাচরণের বাবা একগাল হেসে সকলকে কথাটা জানালেন। বামাচরণের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়া হোল।

গাঁয়ের প্রতিবেশীরা যখন প্রসাদ খাচ্চে ভেতরের ঘরের বারান্দায় বসে, তখন বামাচরণের বাবা সবিস্তারে তাদের সামনে তাঁর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করার বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেন।

—সাহেব বল্লে, নাজির—তোমার ছেলে যদি এণ্ট্রান্স পাশ করতো, তবে আমি ওকে সাবডেপুটী করে দিয়ে যেতাম আজ।

শিশুসাহিত্যিকে

বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বামাচরণ চাকুরী করতে গেল, সঙ্গে তার বৃদ্ধ পিতা গেলেন। কারণ বামাচরণের মা বল্লেন—ছেলেকে অত দূরদেশে একলা তিনি পাঠাতে পারবেন না।

আবার সেই অদৃষ্ট এসে বাধা দিলে।

মাস দুইয়ের মধ্যে বামাচরণের বাবা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী এলেন। শোনা গেল বামাচরণ চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এসেচে। সেখানে নাকি বড় থাকার কষ্ট, নদীর জল লোনা, কাছেই সুন্দরবন, সন্ধ্যার 'পর বাঘের ভয়, জঙ্গল থেকে কাঠ ভেঙে এনে রান্না করতে হয়, সেখানে কি ওই কচি ছেলে থাকতে পারে?

বামাচরণের বাবা বল্লেন, কোনো ভয় নেই। আমি আবার যাচ্ছি সাহেবের কাছে, আর একটা ভাল জায়গায় চাকুরী যাতে হয়।

কিন্তু এবার সাহেব বেজায় চটে গিয়েচে দেখা গেল, না জানিয়ে চাকুরী ছেড়ে আসাতে। সাহেবের আরদালী বল্লে, সাহেবের এখন দেখা দেবার সময় হবে না।

বামাচরণের বাবা এতটা ভাবেন নি, তিনি হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু সেই যে তাঁর মন কেমন ভেঙে গেল, এরপর বেশীদিন বাঁচেন নি।

ক্রমে দিন চলে গেল। বামাচরণেরও বয়েস হয়ে উঠল। বাবা বেঁচে থাকতেই তার বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন, দু' একটী ছেলেপুলেও হোল।

গ্রামের যে সব ছোট ছোট ছেলেদের বামাচরণ গম্ভীর মুখে উপদেশ দিয়ে বেড়াতো, তাদের মধ্যে অনেকে এখন বিদেশে বেরিয়ে ভাল লেখাপড়া শিখেচে, দু' একজন ভাল চাকুরীও পেয়েচে। বাপের পেনসনের টাকায় সংসার একরকম চলতো, বাপের মৃত্যুর পরে বড় সংসার ঘাড়ে পড়াতে বামাচরণ চোখে আঁধার দেখলে। নিজেরও ছেলে মেয়ে দু' তিনটী, এক বিধবা ভগ্নি বাড়ীতে, তাঁরও

দু' তিনটী ছেলে মেয়ে, বৃদ্ধা মা। অনেকগুলি পুষ্যি খেতে, চলে কিসে এতগুলি প্রাণীর ?

*　　　*

এই সব কথাই সে ভাবছিল, আজ নদীর ধারে বড় ভাঙনের চট্‌কা গাছতলায় মাছ ধরতে বসে। বেলা পড়ে এসেচে, কচুরী পানার দামগুলো উজান মুখে চলেচে—বোধ হয় জোয়ার এল।

সামনের চট্‌কাগাছটায় রোদ রাঙ্গা হয়ে আসচে।

রোজ এইখানটীতে বামাচরণ মাছ ধরতে আসে। তাদের গ্রাম থেকে প্রায় দেড়মাইল দূরে নদীর বড় বাঁকের মুখে জায়গাটা চারিদিক নির্জ্জন।

এখন তার মনে হয় খুলনার চাকুরীটা ছেড়ে দিয়ে এসে সে বড় খারাপ কাজ করেচে। আজ তার আশি টাকা কি একশো টাকা মাইনে হোত। কারণ চাকুরী ছেড়েও এসেচে আজ চৌদ্দ পনেরো বছর হবে।

হঠাৎ নদীর উঁচু পাড়ের দিকে তার নজর পড়ল।

ওটা কি ?

পাড়টা সেখানে খুব উঁচু ও খাড়া—হাত ত্রিশ চল্লিশ উঁচু সে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে। পাড়ের খানিকটা ভেঙে পড়েচে বোধ হয় দু'একদিন হোল। সেই পাড়ের গায়ে একটা বড় কলসী পাড়-ভাঙার দরুণ বেরিয়ে পড়েচে—অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্চে। বাকী অর্দ্ধেকটা মাটীর মধ্যে পোঁতা।

বামাচরণের চট্ করে মনে পড়ে গেল, সে গ্রামের বুড়োদের মুখে শুনেচে এই বাঁকের মুখে আগে—বহুকাল আগে খুব সমৃদ্ধ গোয়ালাদের গ্রাম ছিল। অনেক লোকের বাস ছিল। কলসীটা জমির ওপর থেকে হাত চার পাঁচ নীচে পোঁতা অবস্থায় রয়েচে—সেকালে লোকে কলসী করে টাকা পুঁতে রেখে দিতো। এ নিশ্চয়ই টাকার কলসী।

বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বামাচরণ এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে আর কেউ কাছাকাছি আছে কিনা। স্থানটা নির্জ্জন, অন্যলোক এদিকে আসে না। কলসীটা আর কেউ দেখেনি নিশ্চয়ই।

তা ছাড়া মোটে কাল রাত্রে এই পাড় ভেঙেচে কে আর লক্ষ্য করেচে একটা কাণা-ভাঙা কলসী, কে-ই বা তার পর এসেচে এদিকে ?



অবিশ্যি নৌকো থেকে দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু জেলে-ডিঙি এতদূরে আসে না, গাঁ থেকে ওই কদমতলা পর্য্যন্ত তাদের দৌড়। এতদূরে কেউ কোমড়-জাল পাতে না।

বামাচরণ সেখানে আর দাঁড়াল না, ছিপ গুটিয়ে উঠে বাড়ীর দিকে রওনা হোল। তাকে এখানে কেউ না দেখে ফেলে

বাড়ীতে এসে সে ভাবতে বসলো। এখন সে কি করবে? আজ রাত্রেই

অবিশ্যি কলসীটা তুলে আনতেই হবে। কিন্তু একা সে কি করে পারবে? জমির ওপর থেকে খোঁড়া অসম্ভব। যদি সাবলের ঘায়ে কলসীটা নদীগর্ভে পড়ে যায়, তা হোলে স্রোতের মুখে হয়তো কোথায় ভেসে চলে যাবে, নয়তো ডুবে যাবে।

তা নয় নীচে থেকে মই লাগিয়ে উঠতে হবে কলসী পর্য্যন্ত, তারপর সন্তর্পণে খুঁড়ে কলসী বার করতে হবে। তাতে অন্ততঃ দুজন লোকের দরকার, মই নীচে থেকে একজন ধরে থাকা চাই। কলসী নামাবার সময়ও সাহায্য পাওয়া দরকার।

অনেক ভাবনা চিন্তার পরে বামাচরণ বড় ছেলে নিতাইকে সঙ্গে নেবার ঠিক করলে। নিতাই এই বারো বছরে পড়েচে, গ্রাম্য স্কুলে পড়ে, খেলাধূলায় খুব পটু, সাহসীও বটে। বামাচরণ ছেলেকে বল্লে—তোর মাকে বলিস্ নে, রাত্রে যাবি আমার সঙ্গে একটা জায়গায়।

পিতাপুত্রে মই, সাবল, একগাছা শক্ত দড়ি নিয়ে রাত দুপুরের পরে নদীর ধারে চট্‌কাগাছটার তলায় এসে দাঁড়ালো।

বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করচে বামাচরণের, কি জানি কি হয়!

বামাচরণের ছেলে কিছুই জানে না কি ব্যাপার, বাবার কথায় সে এসেচে। কেন এসেচে তার বাবা তাকে বলেনি। কিন্তু সে জিনিষটা খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছিল। নিশ্চয়ই জেলেরা কোথাও জলের ভেতর বাঁশের ঘুনিতে বড় মাছ জিইয়ে রেখেচে—সেই মাছ চুরি করতে তার বাবা তাকে সঙ্গে করে এনেচে। কিন্তু মই কি হবে?

জায়গাটা দেখেও সে অবাক হয়ে গেল। বাবাকে বল্লে—বাবা, এতদূরে তো জেলেরা কোমড় ফেলে না? এ তো চট্‌কাতলার বাঁক—

তার বাবা ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—জেলেদের সঙ্গে আমাদের কি দরকার? নে, মইটা এখানে বেশ করে লাগা—

বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতিকষ্টে বামাচরণ মই বেয়ে ওপরে উঠল। নিতাই খুব অবাক হয়ে গিয়েচে—পাড়ের ওপর মই দিয়ে উঠে কি হবে, কি আছে ওখানে ? সে একটু হতাশও যে না হয়েচে এমন নয়। বড় মাছ নয় তা হলে হয়তো বাবা কোনো ওষুধের শেকড় কি মুথো-ঘাসের শেকড় তুলতে এসেচে। অনেক সময় রাত্রেই ওষুধের গাছ তুলতে হয়, সে জানে।

তার ভয়ও হচ্ছিল, চারিদিকে অন্ধকার, নদীর জলের ছলাং ছলাং শব্দ হচ্চে ডাঙ্গায় ছোট ছোট ঢেউ লেগে। এখানে ভূতের উপদ্রবের কথা অনেকে বলে, শ্মশান এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়। নিতাইয়ের গাটা ছম্ ছম্ করে উঠলো।

তার বাবা ওপরে গিয়ে পাড়ের গা খুঁড়তে লাগলো। সে নীচে থেকে অন্ধকারে তেমন কিছু দেখতে পাচ্চে না বাবা কি খুঁড়চে। একবার সে বল্লে—কি বাবা, মুথোর শেকড় ? বামাচরণ চাপা গলায় বল্লে—আঃ, চুপ কর না। মই ধরে থাক্, তোর সে কথায় দরকার কি ?

নিতাই চুপ করে রইল। কিন্তু ওষুধ খুঁড়তেও কি এত সময় লাগে ? সে অন্ধকারের মধ্যে মইয়ের নীচে একা দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অশান্তি বোধ করছিল, বাবার ভয়ে কিছু বলতেও পাচ্ছে না।

অতিকষ্টে ভারী ও কালো একটা কলসী নিয়ে বামাচরণ মই থেকে নামলো। নিতাই অবাক হয়ে বল্লে—কি বাবা এতে ?

—চুপ কর না, কেবল চেঁচামেচি। তোর সব কথায় কি দরকার ? সাবল আর মইটা নিতে পারবি একলা ?

কেউ না দেখে, এজন্যে বামাচরণ বাঁশবনের পথ দিয়ে চললো। বেশী রাত্রে গ্রামে চৌকীদার পাহারা দিতে বার হয়, কি জানি যদি সে এ অবস্থায় হঠাৎ চৌকীদারের সামনেই পড়ে যায় ?

বামাচরণের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করচে। কলসীটা বেজায় ভারী। নিশ্চয়ই

কোনো ভারী জিনিসে ভর্ত্তি। কলসীর মুখটা একখানা পাথরের ছোট খুরী দিয়ে চাপা ছিল—বহুদিন মাটীর মধ্যে থাকার দরুণ সেটা এমন দারুণ এঁটে গিয়েচে যে অস্ত্র দিয়ে চাড় না দিলে খোলা যাবে না।

বাড়ী পৌঁছেই বামাচরণ বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলে। স্ত্রীকে বল্লে— একটা আলো নিয়ে এসে তো? ওর আর বিলম্ব সইচে না। এখুনি সে কলসীর মুখ খুলে দেখবে।



নিতাইয়ের মা একটা কাচ-ভাঙা সেকেলে হিঙ্ক্সের লণ্ঠন নিয়ে উঁচু করে ধরলে। বিস্ময়ের সুরে বল্লে—কলসীটাতে কি? একটা মড়ার কলসীর মত দেখতে—ও টা কে আনলে কোথা থেকে গো?

অধীর কৌতূহলে ও সাগ্রহে বামাচরণ সাবলের চাড় দিয়ে কলসীর মুখটা খুলতে গেল। কিন্তু কি ভীষণ মুখ এঁটে গিয়েচে বহু বৎসরের ভূগর্ভের চাপে। বহু চেষ্টা করে মুখ খুলতে না পেরে সে সাবলের এক ঘা দিয়ে কলসীটা ফাটিয়ে

ফেল্লে—সঙ্গে সঙ্গে কালো আলকাতরার মত কি একটা দুর্গন্ধ পদার্থ মেঝেময় ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

নিতাইয়ের মা অবাক্, স্বামী পাগল হয়ে গেল নাকি পয়সার দুর্ভাবনায় এতদিন পরে? রাতদুপুরে কিসের একটা কলসী কোথা থেকে উঠিয়ে এনে কি কাণ্ড বাধালে দেখো তো?

বামাচরণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এত কষ্ট তবে সব বৃথা। রূপোর গুঁড়োও এতটুকু নেই কলসীতে। কোথায় এককলসী টাকা বা মোহর—আর তার বদলে—এগুলো কি কালো কালো? অদৃষ্ট একেই বলে।

সারারাত্রি বামাচরণের ঘুম হোল না। সত্যই তার অদৃষ্ট ভাল না। এমন জায়গায় পোতা কলসী পেয়েও তার মধ্যে থেকে বেরোয় কালো আলকাৎরা! নইলে বম্‌পাশ্‌ সাহেবের দেওয়া এমন চাকুরী সে ছেড়ে দিয়ে আসে? পেয়ে হারানোই তার অদৃষ্ট।

পরদিন সকালে লোকজনকে আলকাৎরার মত জিনিষটা দেখাতে কেউ কিছু বলতে পারে না। অবশেষে মামুদপুরের বাজারের বুড়ো কবিরাজ মশায় দেখে বল্লে—এ পুরোণো ঘি। বহুকালের পুরোণো ঘি। কতটা আছে? এর দাম খুব। বিক্রী করবে? কলকাতায় বৌবাজারের সেনেদের দোকানে পেলেই নেবে।

বুড়ো কবিরাজকে সঙ্গে নিয়ে বামাচরণ কলকাতায় এল।

বৌবাজারে সেনেদের মস্ত কবিরাজী দোকান, সারা ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কারবার। ঘি দেখে তারা বল্লে—হঁ্যা জিনিসটা খুবই ভালো, অন্ততঃ দুশো বছরের পুরোণো। তোমাদের ঘরে ছিল?

বামাচরণ সংক্ষেপে কলসী-প্রাপ্তির কথা বর্ণনা করলে। তারপর দরদস্তুর চললো, ওরা সাত টাকার বেশী দর দিতে রাজী নয়, তারপর উঠল দশ টাকায়,

তার বেশী কিছুতেই নয়। বুড়ো কবিরাজকে সঙ্গে না আনলে কিন্তু বামাচরণ দু'টাকা সেরেই জিনিষ দিয়ে ফেলতো।

একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে ওদের কথাবার্ত্তা শুনছিলেন—তিনি উঠে এসে বুড়ো কবিরাজকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বল্লেন,—আমি খয়রাগড়ের রাজার ম্যানেজার। আমি আপনাদের কথাবার্ত্তা এতক্ষণ শুনছিলাম—রাজার মায়ের বয়েস হয়েচে, হাপকাশের অসুখ। এই পুরোনো ঘি কিনতেই আমি এদের দোকানে এসেছিলাম। এত বছরের পুরোনো ঘি কলকাতায় কোনো দোকানে নেই। আমি আপনাদের জিনিষ নেবো। একশো টাকা করে সেরের দাম দেবো আমি। ওজন করুন মাল।

এ কলসীতে মোট সাড়ে বারো সের ঘি ছিল। কিন্তু আদত কলসীটাতে বোধহয় আরও বেশী ছিল, কিন্তু সেটা ভেঙে কিছু ঘি নষ্ট হয়ে যায়। বাকীটা ওরা নতুন কলসীতে পুরে এনেছিল।

ঘি বিক্রী করে মোট পাওয়া গেল সাড়ে বারোশো টাকা।

যদু চক্কোত্তি জ্যোতিষী ছিল বড়, সে মিথ্যে বলে নি—এখনও তো বামাচরণের আস্তকাল পড়ে রয়েচে। রাজা হওয়ার আশ্চর্য্যটা কি ?





শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সাঁওতাল দেখেছ? সাঁওতালদের বস্তি?

কোনোদিন ছাখোনি, না? চল—আজ তোমাদের দেখাব। এসো আমার সঙ্গে।

ওই যে দূরে দেখছ প্রকাণ্ড ওই পাহাড়, আর ওই যে দেখছ সবুজ গাছের সারি, সারা দক্ষিণদিকটা জুড়ে সোজা চলে গিয়ে ওই আকাশটাকে ছুঁয়েছে, ওই জঙ্গলের ভেতর পাহাড়ের নীচে আছে সাঁওতালদের ছোট ছোট গ্রাম।

ছোট্ট একটি নদী পেরোতে হবে। নদীতে জল অবশ্য এখন নেই, এখন আছে শুধু শুকনো বালি। কিন্তু বর্ষাকালে একবার এসে দেখো—দুকূল ছাপিয়ে বানের জল ঠিক তীরের মত সোঁ সোঁ করে ছুটে চলেছে। বানের তোড় না কমলে পারাপার বন্ধ।

সাঁওতাল সর্দ্দার

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

জঙ্গলের ওই গাছগুলোর নাম জানো? শহরের মানুষ, কেমন করেই বা জানবে।

এই শাল, আর এই মহুয়া। এখানে এই শাল-মহুয়াই বেশি।

কিসের ওই মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছ বল দেখি?

শালফুলের গন্ধ। আর কয়েকটা দিন পরেই মহুয়ার ফুল ফুটবে। তখন যদি একবার এই বনের ভেতর ঢোকো ত' সহজে আর বেরোতে চাইবে না। শালফুলের গন্ধ বেশ মিষ্টি, কিন্তু মহুয়াফুলের গন্ধ বড় তীব্র। মগজের ভেতর ঢুকে মানুষকে যেন পাগল করে' দেয়।

দেখেছ কত রং-বেরঙের প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে?

ওই ত' কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি।

আর একটুখানি।

ওই শোনো মাদল বাজছে, বাঁশী বাজছে! গান আরম্ভ হয়েছে। যাক্, বেশ ভাল সময়েই এসেছ। ওদের নাচ দেখতে পাবে।

এই ত' এসে গেছি।

নেচে নেচে গান গেয়ে গেয়ে চলেছে ওরা ওই পাহাড়ের ধারে। সঙ্গে নিয়ে চলেছে বিস্তর ফুল আর পাতা।

চল ওদের সঙ্গে যাই,—দেখি ওরা কি করে।

পাহাড়ের নাচে পাথর দিয়ে বাঁধানো ওই বেদীর ওপর ফুল আর পাতাগুলি রেখে ওরা সবাই মিলে একসঙ্গে প্রণাম করছে। কেন বল দেখি?

ভারি মজার একটা গল্প আছে।

শোনো বলি।

ওই যে দেখছ বুড়ো গাংটু মাঝি মাথা হেঁট করে' চোখের জল মুচছে—ওই গাংটুই এদের এই গ্রামের সর্দ্দার। গাংটুর বাবা ছিল সর্দ্দার, বাবার বাবাও

সর্দ্দারী করেছে। গাংটুরা পুরুষানুক্রমে সর্দ্দারী করে' আসছে।

গাংটু বুড়ো হয়েছে, কিন্তু এখনও ওর চেহারা দেখেছ ?—কাঁধের ওপর পড়েছে পাকাচুলের বাব্‌রি, গলায় লাল কাঁটির মালা, ইয়া চওড়া বুকের ছাতি, আর হাত-পায়ের গড়ন দেখেছ ? ওই হাত দিয়ে কত বাঘ যে ও মেরেছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

যে সময়ের কথা বলছি তখন ও জোয়ান। বয়েস বোধকরি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। বাড়ীতে তার স্ত্রী, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েটি নিতান্ত ছোট, ছেলেটি বছর-দশেকের। সাঁওতাল-সর্দ্দারের ছেলে, দশ বছর বয়েসেই এমনি বেড়ে উঠেছে যে, দেখলে মনে হয় ষোলো-সতেরো বছরের ছোক্‌রা। নাম—বারু।

মাসে একদিন করে' প্রকাণ্ড হাট বসে আমাদের গ্রামে। এই হাটের দিনে অনেক দূরের জঙ্গল থেকে অনেক সাঁওতালকে আমাদের গ্রামে আসতে হয়। হাটে আসে তারা সওদা করতে। কেউ কেউ মোটা তাঁতের কাপড় কিনে নিয়ে যায়, কেউ-বা আসে কাঁটির মালা কিনতে, কেউ-বা শুধু তেল আর নুন কিনতে আসে। তারাও কিন্তু খালি-হাতে আসে না। তালপাতার ছাতি, বাঁশের ব্যাঁকারি দিয়ে তৈরি নানারকমের জিনিস, রেশমের গুটি,—এম্‌নি-সব কতরকমের কত জিনিস নিয়ে এসে হাটে তারা বিক্রি করে, আর সেই পয়সা দিয়ে ফেরবার সময় নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে নিয়ে যায়।

সে বছর বর্ষা নেমেছিল একটুখানি তাড়াতাড়ি। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ না হ'তেই ঝম্ ঝম্ করে' বাদল নামলো। ছোট্ট রূপাই নদী বর্ষায় একেবারে পাগল হয়ে উঠবে, গ্রামে সওদা করতে যাওয়া হঠাৎ কোন্‌দিন বন্ধ হয়ে যায় কে জানে, তাই এই সাঁওতালেরা প্রায় প্রত্যেক হাটেই ভিড় করতে লাগলো।

সাঁওতাল সর্দ্দার

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নদীর জল একটু একটু করে' বাড়ছে। সেদিন তাদের শেষ হাট-বার। সমস্ত গ্রাম একেবারে উজাড় করে' হাটে গেল। গ্রামে রইলো মাত্র ছোট ছোট মেয়েরা।

গাংটু তার ঘরের সুমুখে অনেকখানা জায়গা জুড়ে সে-বছর চিনে-বাদামের চাষ করেছিল। ছোট ছোট বাদামের গাছে তখন সবেমাত্র কচি কচি পাতা গজিয়েছে। দিনের বেলা যে-কেউ একজনকে সারাদিন ধরে' ক্ষেতে পাহারা দিতে হয়। পাহারা না দিলে যত রাজ্যের কাক আর পাখী এসে ঠোঁট দিয়ে গাছের তলার মাটি খুঁড়ে বাদামগুলি মুখে নিয়ে উড়ে পালায়।

ক্ষেতে পাহারা দেবার জন্যে গাংটু রেখে গেল তার ছেলে বারুকে। বললে, 'ছুটে কোথাও পালাস্ না বাবা, তীর-ধনুক নিয়ে এইখানে বসে থাক্।'

বারু হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে গিয়ে বসলো সেই ক্ষেতের পাশে। তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে সে তার হাতের লক্ষ্য ঠিক করতে লাগলো।

সূর্য্য তখন পাহাড়ের ঠিক মাথার ওপরে। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে একজন জোয়ান সাঁওতাল বারুর কাছে এসে বললে, 'এই! আমি এই—তোদের ঘরে কোথাও লুকিয়ে থাকি, আমাকে কেউ খুঁজতে এলে বলবি—জানি না। বলবি—কই, এ-দিকে কেউ আসেনি। বুঝলি?'

বারু প্রথমে একটুখানি অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লোকটার অবস্থা দেখে তার দয়া হ'লো। বললে, 'যাও ওই খড়ের গাদার ভেতর ঢোকো গিয়ে, কেউ দেখতে পাবে না।'

লোকটা তাড়াতাড়ি ঢুকলো গিয়ে খড়ের গাদায়। বারু বেশ করে' তার ওপর আরও কতকগুলো খড় বিছিয়ে দিলে। বাইরে থেকে হঠাৎ দেখলে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।

খানিক্ পরেই দেখা গেল, লাল লাল পাগড়ি-বাঁধা কয়েকজন পুলিশের লোক

লাঠি হাতে নিয়ে সেইদিকেই এগিয়ে আসছে। তারাও ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালো বারুর কাছে। এসেই জিজ্ঞাসা করলে, 'হাঁরে এই! এদিক দিয়ে কাউকে তুই যেতে দেখলি?'

বারু অম্লানবদনে ঘাড় নেড়ে বললে, 'না।'

কিন্তু সাঁওতাল জাত, মিথ্যা কথা বলার অভ্যেস্ তাদের নেই। বলবার ভঙ্গীটা তার কেমন-যেন অন্য রকমের হয়ে গেল। লোকগুলোর সন্দেহ হ'লো। বললে, 'বল্ না কোন্‌দিকে গেল!'



বারু বললে, 'জানি না।'

পুলিশের লোক ছিল চারজন। দু'জন দাঁড়িয়ে রইলো বারুর কাছে, আর দু'জন গিয়ে ঢুকলো তাদের ঘরে। ঘরের ভেতরটা একবার খুঁজে দেখেই তারা আবার বেরিয়ে এলো।

বারুকে তারা সহজে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। দূর থেকে তারা ঠিক দেখেছে লোকটা ছুটতে ছুটতে এইদিকেই এসেছে। এ-চোঁড়া নিশ্চয়ই জানে।

তাদের মধ্যে একজন বললে, 'ছেলেমানুষ, হয়ত' নাও দেখতে পারে। চল একবার ওই দিককার খড়ের গাদাগুলো দেখা যাক্। দেখে ফিরে' যাই, আর পারি না বাবা।'

'চল।'...বলে তারা সেইদিকে চলে গেল।

খানিক পরেই কি ভেবে তাদের মধ্যে আবার একজন ফিরে এলো। হাজার হোক্, ছেলেমানুষ ত'! বারুকে কাছে ডেকে সে বললে, 'শোন্!'

বারু কাছে এসে দাঁড়াতেই সে তার পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে' বারুর হাতে দিয়ে বললে, 'এই টাকা দুটো নে। বল্ এবার সে কোন্‌দিক দিয়ে গেল।'

দুটো টাকা! একসঙ্গে! বারু হেঁটমুখে টাকাদুটো বারকতক্ নাড়াচাড়া করে' দেখলে। খুশী হয়ে ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসলে। হেসে কি যেন ভাবলে। ভেবে বললে, 'জানি না।'

'না বাবা সত্যি জানিস্। বল্, আরও দুটো টাকা দিচ্ছি।'

এই বলে সে তার পিঠে মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

বারু তখন আঙ্গুল বাড়িয়ে চুপিচুপি সেই খড়ের গাদাটা দেখিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

বাস্! পুলিশের হাতে লোকটা ধরা পড়ে গেল।

হাতে হাতকড়া দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে লোকটাকে যখন তারা থানায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে, এমন সময় তাঁদের গ্রামের লোকজন সব হাট থেকে ফিরে' এলো। গাংটু এলো, তার স্ত্রী এলো, বারুর ছোট বোন্‌টি এলো।

ব্যাপারটা দেখবার জন্যে সবাই এসে জড়ো হ'লো গাংটুর ক্ষেতের কাছে। আসামীকে অনেকেই তারা চিনতে পারলে। লোকটা প্রথমে ছিল তাদেরই এই

গ্রামে। শয়তানের একশেষ! সাঁওতাল জাতের কলঙ্ক। এই গাংটুর বাবাই তাকে এ-গ্রাম থেকে তাড়িয়েছিল।

পুলিশের জমাদার-সাহেব বললে, 'কত জায়গায় কত চুরি ডাকাতি যে ও করেছে তার ঠিক নেই। পাঁচুইডি কলিয়ারীতে একটা মেয়েকে খুন করে' ও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আজও হয়ত পালাতো, কিন্তু এই ছেলেটি—'

বলেই সে বারুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ও কার ছেলে?'

গাংটু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, 'আমার।'

জমাদার-সাহেব হাসতে হাসতে বললে 'ওই খড়ের গাদায় ও-ই ওকে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর দুটি টাকা হাতে পেয়ে ভাগ্যিস্ দেখিয়ে দিলে, নইলে ব্যাটা আজ আমাদের হয়রাণ করে' মারতো।'

জমাদার-সাহেব পকেট থেকে তার ছোট্ট একটি খাতা বের করে' পেন্সিল দিয়ে গাংটুর আর তার ছেলের নাম লিখে নিলে। বললে, 'গভর্ণমেণ্ট থেকে বারুকে আরও কিছু পুরস্কার দেওয়া হবে।'

এই বলে' তারা চলে গেল।

সন্ধ্যে থেকেই আকাশে সেদিন চাঁদ উঠেছিল। পূর্ণিমার রাত।

বারুকে সঙ্গে নিয়ে গাংটু বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘন দুর্গম জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একসময় পাহাড়ের তলায় গিয়ে তারা থমকে দাঁড়ালো।

তারপর গাংটু বাড়ী ফিরে এলো—একা।

গাংটুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে, 'বারু কোথায়? তোমার সঙ্গে গেল না?'

গাংটুর চোখ দুটো লাল। হাত থেকে তীর-ধনুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই-

খানেই সে উন্মাদের মত নীরবে পায়চারি করতে লাগলো। মুখ ফুটে কিছুই সে বলতে পারলে না।

বারুর মা উন্মাদিনীর মত ছুটে গেল পাহাড়ের দিকে।

গাংটুকেও যেতে হ'লো তার পিছু-পিছু। যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা তার মোচড়্ দিয়ে দিয়ে উঠছে। কি যেন বলতে গিয়েও সে বলতে পারছে না।



বারুকে কোথাও দেখতে না পেয়ে বারুর মা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে' এসে গাংটুর পায়ের তলায় আছাড় খেয়ে পড়লো।—'এ তুমি কী করেছ নিষ্ঠুর! এ কী করলে তুমি সর্দ্দার?'

সর্দ্দারেরও দু'চোখ বেয়ে তখন অশ্রুর ধারা গড়িয়ে এসেছে। খানিক্ থেমে সে নিজেকে একটু-খানি সাম্‌লে নিয়ে বললে, 'আমাদের বংশের ওই প্রথম বিশ্বাসঘাতক। আমি তার শাস্তি দিয়েছি।

কাঁদতে কাঁদতে বারুর মা জিজ্ঞাসা করলে, 'কি শাস্তি দিয়েছ? মেরে ফেলেছ?'

গাংটু ঘাড় নেড়ে বললে, 'হাঁ।'

বারুর মা তার মৃতদেহটা দেখবার জন্যে ছট্ ফট্ করতে লাগলো।

গাংটু বললে, 'তার চিহ্ন রাখিনি কোথাও। খাদের বয়লারের আগুনে দিয়েছি ঢুকিয়ে। পুড়ে এতক্ষণ ছাই হয়ে গেছে।'

আজ সেই বিশ্বাসঘাতক বারুর জন্মতিথি। পাহাড়ের নীচে পাথরের ওই বেদীর কাছেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাই আজ তার সেই সমাধিস্থানটিকে ফুলে-পাতায় সাজাতে এসেছে।

এবার বুঝেছ ত ?

কিন্তু আসল ব্যাপারটা অন্যরকম ।

কিরকম তাও বলি শোনো !

নিজের একমাত্র পুত্রকে নিজের হাতে হত্যা করে' অবধি গাংটুর অবস্থা হ'লো ঠিক পাগলের মত। সাঁওতাল-সমাজের কঠোর নিয়ম তাকে পালন করতে হয়েছে, পিতা হয়ে বিশ্বাসঘাতক পুত্রকে নিজের হাতে হত্যা করেছে,—পাগল ত' সে হবেই।

কিন্তু বদ্ধ উন্মাদ তাকে ঠিক বলা চলে না। বদ্ধ উন্মাদ সে হয়নি। দিবা-রাত্রি মনে হয় যেন সে অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে, অসম্ভব রকম গম্ভীর, কারও সঙ্গে ভাল করে' দুটো কথা বলতে পারে না, সর্ব্বদাই এদিক-ওদিক তাকায়, মনে হয় কার যেন সে ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছে।

গ্রামের লোক তার দুঃখে সহানুভূতি জানায়।

বুড়োরা বলে, 'আহা !'

ছেলে-ছোক্‌রারা বলে, 'চমৎকার !'

সাঁওতাল-সমাজে এমনি শক্ত পুরুষ-ব্যাটাছেলের পৌরুষের দাম বড়

বেশি। ঘ্যান্‌ঘেনে প্যান্‌পেনে ভয়ে পিছিয়ে-আসা মানুষ তারা পছন্দ করে না।

প্রায় মাসখানেক পরে পুলিশের লোক বারুর জন্যে পুরস্কার নিয়ে এলো পঁচিশটি টাকা।

এসেই তারা বারুর খোঁজ করলে। কিন্তু পুলিশের কাছে বলবার উপায় নেই যে, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এখন তারা বাস করছে ইংরেজ-রাজত্বে, সামাজিক বিধানে এখন আর তারা লোক জানাজানি করে' শাস্তি কাউকে দিতে পারে না। এ-সব কাজ এখন তাদের গোপনেই করতে হয়।

তাদের বলে' দেওয়া হ'লো—বারু বাড়ী নেই।

টাকা-পঁচিশটি তারা দিয়ে গেল বারুর বাবার হাতে।

টাকাক'টি হাতে নিয়ে বারুর মা'র সে কী কান্না!

গাংটু তাকে কিছুতেই আর চুপ করাতে পারে না!

শেষে কি আর করবে, যে-কথা গাংটু কাউকে এতদিন বলেনি, যে-কথা ভেবেছিল জীবনে কারও কাছে বলবে না, বারুর মার কাছে তাই তাকে সেদিন বল্‌তে হলো। চুপিচুপি বললে, 'কাঁদিসনি বারুর মা কাঁদিস্‌নি। তবে শোন্‌, যা সত্যি কথা তাই শোন্‌ বলি। বারু আমাদের মরেনি, বেঁচে আছে।'

বারুর মা উঠে বসলো।

গাংটু চুপিচুপি বলতে লাগলো, 'নিজের ছেলেকে বাপ্‌ হয়ে নিজের হাতে খুন করতে পারলাম না বারুর মা। হাত আমার থর্‌ থর্‌ করে' কাঁপতে লাগলো। বারুও কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলো, 'আমাকে মেরো না বাবা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি পালাই।' বললাম, 'তবে তাই যা। কিন্তু এখানে আর কখনও ফিরে আসতে পাবি না। বহুৎ দূরে—যেখানে খুসী তোর চলে যা।' তারপর সেই যে বারু চলে গেল আর আমি তাকে দেখতে পেলাম না।'

সাঁওতাল সর্দার

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বারুর মা বললে, 'সত্যি বলছো সর্দার ?'

গাংটু বললে; 'সত্যি বলছি।'

বারুর মা বললে, 'তাহলে চল্ আমরাও এখান থেকে চলে যাই। বারু যেখানে গেছে সেইখানে গিয়ে আবার ঘর বাঁধিগে চল্।'

গাংটু বললে, 'তা হয় না বারুর মা। আমি যে সর্দার। বারু যেখানেই থাক্ বেঁচে আছে সুখে আছে।'

বারুর মা বললে, 'তুমি তাহলে থাকো এইখানে, সর্দারী কর। আমি চললাম।'

এই না বলে' সেইদিনই রাত্রে বারুর মা তার ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সন্তানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

সেই যে বেরুলো কোনোদিনই আর সে ফিরে এলো না।

তারপর অনেকদিন পরে বারুর সঙ্গে অবশ্য তার দেখা হয়েছিল। কেমন করে' কোথায় দেখা হ'লো, গাংটুই বা কেমন ক'রে' সে খবর পেলে, সে আবার আর-একটা-গল্প।





মানুষ-সিংহ "কাসোকা"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

ভূত-প্রেত সম্বন্ধে নানা রকমের কুসংস্কার এবং অন্ধ-বিশ্বাস, অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে এবং অনেক সময় শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কত রকমের কাহিনী কিংবদন্তী শুনিয়াছি—গভীর অন্ধকার রাত্রে, নির্জ্জন পথে, একাকী যাইতে যাইতে হঠাৎ শোনা গেল, ঐ সম্মুখে ঠিক পথের মধ্যখানে, গাছের গভীর ছায়ার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাল বিড়াল ম্যাও ম্যাও করিতে করিতে চলিয়াছে এবং জ্বল্-জ্বল্ চক্ষে কটমট করিয়া তাকাইতেছে —হঠাৎ সেটা একটা বিশাল বলদ হইয়া গেল এবং পরমুহূর্ত্তে পুনরায় বদলাইয়া গিয়া হইল একটা মহিষ! যাহার সম্মুখে এই ঘটনা হইতেছিল, সে নিঃসন্দেহে

মানুষ-সিংহ "কাসোকা"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

বুঝিতে পারিল—এ ব্যাপার ভৌতিক এবং তখনই 'রাম' নাম উচ্চারণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ-ধারী ভূতেরও আর অস্তিত্ব রহিল না—এই ধরণের কত রকমের গল্প শিশুকাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছি এবং এইরূপ কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস সকল দেশেই অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে বদ্ধমূল।

মধ্য-আফ্রিকায় বন্য লোকদের মধ্যে, বিশেষতঃ "বারোট্‌সী" জাতীয় লোকদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস—কাহারও কাহারও এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে যে, ইচ্ছা করিলেই তাহারা সিংহের রূপ ধরিতে পারে। এইরূপ ক্ষমতা-ওয়ালা কোন লোক গ্রামে গিয়া কাহারও নিকট গরু কিংবা ছাগল কিছু চাহিয়া যদি না পায়, তবে ইহা ধ্রুব সত্য যে, সিংহের রূপ ধরিয়া আসিয়া সে ঐ গ্রামে উৎপাত অত্যাচার করিবেই করিবে।

এইরূপ বিশ্বাসের হেতুস্বরূপ তাহারা বলে যে, অনেক সময় ট্রেকারেরা সিংহের পদ-চিহ্ন ধরিয়া যাইতে যাইতে অবশেষে দেখিতে পায়—সেই দাগ হঠাৎ মিলাইয়া গিয়া, মানুষের পায়ের দাগে রূপান্তরিত হইয়াছে। যে গ্রামে কোন মানুষ-সিংহ গরু চাহিয়া পায় না, সেই গ্রামে কোন জন্তু হত হইলেই নাকি এরূপ অদ্ভুত ঘটনা হইতে দেখা যায়—সিংহের পদ-চিহ্ন বদলাইয়া মানুষের পদ-চিহ্নে দাঁড়ায়।

মিষ্টার চ্যাড্‌উইক্—মধ্য-আফ্রিকার একজন বিখ্যাত শিকারী—ওয়াইড্ ওয়ার্লড্ ম্যাগেজিনে এইরূপ ঘটনা সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত গল্প লিখিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন ;—ভারি শয়তান এক বুড়ো উইচ্-ডকটর (যেমন আমাদের ভূতের ওঝা) তার নাম ছিল সাম্বারা—তার সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হইলে, আমি এই মানুষ-সিংহ ব্যাপারের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ঠিক আমার ধারণামত সে গম্ভীর ভাবে বলিল, যে, এই মানুষ-সিংহ ব্যাপারের মূলে বাস্তবিকই সত্য আছে। এই সকল লোকের দ্বারা সে নিজে কোনদিন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, সে বেশ গর্ব্বভরে উত্তর দিল—তাহাদের দলের লোকের

যাদুর বল বেশী, এরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহাদের নাই। এই উত্তর শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম—সে নিজেও একজন মানুষ-সিংহ দলের লোক।

আমি মনে মনে স্থির করিলাম, যেরূপেই হউক ইহার নিকট হইতে প্রকৃত ঘটনা জানিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে সেই গ্রামে কতকগুলি লোকের ভারি আশ্চর্য্য রকমে মৃত্যু হইয়াছিল এবং সেই মৃত্যুগুলি সম্বন্ধে সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট ভুল সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল এবং ইহা ভিন্ন আরও অনেকগুলি বে-আইনী ব্যাপারেও সাম্বারা যে সংশ্লিষ্ট ছিল—এই সমস্ত কথা আমি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। বৃদ্ধ অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিল এবং ক্রমে যখন দেখিলাম, বেশ থতমত খাইয়া গিয়াছে, তখন আমি প্রস্তাব করিলাম—"সাম্বারা! এই মানুষ-সিংহ ব্যাপারটার সব ঘটনাগুলি আমাকে পরিষ্কার ক'রে যদি বুঝিয়ে দাও, তবে, আমি সন্তুষ্ট হব এবং তোমার অন্য সব অপরাধের কথা ভুলে যাব।" তখন সাম্বারা—অত্যন্ত গোপনে এবং যেন আমি সে সব কথা প্রকাশ না করি—আমার নিকট সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। তখন দেখিলাম—ব্যাপারটি সহজ-বুদ্ধি এবং চতুরতার একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

আজ রাত্রে যে সিংহটা একটা গ্রামে জন্তু মারিল সেই সিংহ নিকটবর্ত্তী অন্য গ্রামে দুই এক রাত্রি পরেই আবার শিকার করিবে। এটা গ্রামের সকলে এবং বিশেষ ভাবে উইচ্-ডাক্তারেরা জানে। উইচ্-ডাক্তারেরা খাদ্য-পোষাক দিয়া একদল চেলা প্রতিপালন করে, কোন গ্রামে এইরূপ শিকারের সংবাদ পাইবামাত্র, তাহারা কোন চেলাকে সেইগ্রামে পাঠাইয়া দেয় এবং চেলা গ্রামের সকলের চাইতে হৃষ্ট-পুষ্ট গরুটি চায়।

চাহিয়া না পাইলে, বিশেষভাবে শিক্ষিত অন্য চেলাকে সেই গ্রামে পাঠান হয় এবং সে সিংহের দ্বিতীয় আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করে। সেই আক্রমণ হইলে উইচ্-ডাক্তারের চেলা ভোর হইবার সঙ্গেই অদৃশ্য হয় এবং সিংহের পায়ের দাগ

মানুষ-সিংহ "কাসোকা"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

সন্ধান করে। লোকচক্ষুর আড়ালে গিয়াই চেলা বিশেষভাবে তৈরি হরিণের চামড়ার একরকম চটি পায় দেয়, তাহার গোড়ালিটা থাকে পায়ের ডগার নীচে। এইরূপ চটি পায় হাঁটিয়া চতুর চেলা এমন দাগ ফেলে, যে, দেখিলে মনে হয় যেন দাগগুলি গ্রামের দিকে গিয়াছে। এই দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহের পায়ের দাগের পাশাপাশি সমানে সমানে চলিয়াছে।

সাধারণতঃ, গ্রাম হইতে কয়েক মাইল দূরেই, যখন দেখা যায় সিংহের দাগ অন্য দিকে ফিরিয়াছে, তখন গোয়েন্দা প্রায় ৫০ গজ পর্য্যন্ত বালির উপরে দাগগুলি মুছিয়া ফেলে (সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের দাগগুলিও মুছিয়া দেয়) —তখন সিংহের প্রথম চল্‌তির লাইন ধরিয়া চেলা খালি পায়ে মাইল দুই অগ্রসর হয়—তারপর তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেয়।

চেলার এই চালাকির ফল এই হয়, যে, গ্রামের শিকারীরা সিংহের পায়ের দাগ ধরিয়া কয়েক মাইল গিয়াই দেখিতে পায়—সেগুলি বদলাইয়া মানুষের পায়ের দাগ হইয়া গিয়াছে, এবং আশে পাশে, সিংহের পলায়নের আর কোন চিহ্ন না পাইয়া—তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরিয়া বলে, যে "জানোয়ারটা মানুষ হইয়া গিয়াছে"—এইরূপে লোকের প্রাচীন বিশ্বাসটাকে আরো বাড়াইয়া দেয়। ইহার পর, ভবিষ্যতে এই গ্রামে কেহ গরু ছাগল চাহিলে গ্রামবাসীরা আর 'না' বলিতে পারে না। এইরূপে অজ্ঞ গ্রামবাসীদের উপর চালাকি খেলিয়া, হতভাগা উইচ্‌-ডাক্তারেরা ধনবান্ হয়। উইচ্‌-ডাক্তারদের মধ্যে পরস্পরে এমনই একটা বাধ্য-বাধকতা আছে, যে তাহারা এই চালাকির ব্যাপারটি সর্ব্বদা গোপন রাখে।

মানুষ-সিংহের ব্যাপার জানিতে পারিলাম। ইহার পর, চতুর সর্দ্দার বৃদ্ধ মাকেন্‌গামের সঙ্গে একদিন দেখা হইলে, সে যখন বলিল, যে, সে মানুষ-সিংহ ব্যাপারটা বিশ্বাস করে, তখন আমার বড় ঘৃণা বোধ হইল। কিন্তু এই সূত্রে সে যে গল্পটি বলিল, তাহাতে সিংহ প্রকৃতির কতগুলি অসাধারণ নিদর্শন দেখিয়া

এবং পর পর কতগুলি ঘটনার অদ্ভুত মিলন দেখিয়া আমার ধারণা হইল, যে, এই কুসংস্কারের দরুণ মাকেন্‌গাম্‌কে ক্ষমা করা যায়।

একদিন সকালে মাকেন্‌গামের গ্রামে গিয়া দেখিলাম—যেন একটা অসাধারণ কিছু ঘটনা হইয়াছে। সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলাম—গত রাত্রে একটা সিংহ একটা গাই মারিয়াছে, এবং ভোর হওয়ামাত্র গ্রামের লোকেরা সিংহের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। ইহার ফল জানিবার জন্য আমি অপেক্ষা করিলাম। দুই প্রহরের পর শিকারীরা অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিল।

আমি সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মাকেন্‌গাম্‌, সিংহটাকে পাওনি বুঝি? এত সকালে ফিরে এলে যে?"

বুড়ো সর্দ্দার বলিল—"এক মাস ঘুরে বেড়ালেও ও জানোয়ারের দেখা পাব না। ওটা 'মানুষ-সিংহ,' সাহেব! দুদিন আগে সান্দারা গ্রামের কাবুকু আমার কাছে একটা গাই চেয়েছিল, বোকামি করে আমি তাকে গাইটা দেইনি। অন্য গ্রামে দুবার দুবার জন্তু চেয়ে সে পায়নি; তারপর প্রত্যেক বারই সিংহ সে গ্রামে জন্তু মেরেছে। অনেক দিন থেকেই আমি সন্দেহ করছিলাম কাবুকু 'মানুষ-সিংহ'; এখন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি। কারণ, দেখ সাহেব—সিংহের পায়ের দাগ ধ'রে ধ'রে আমরা ন্‌জকো নদীর ধার পর্য্যন্ত গিয়ে দেখি, সিংহের দাগ হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছে—তার জায়গায় কাবুকুর পায়ের দাগ।"

আমি বলিলাম—"তুমি গ্রামের একজন বুদ্ধিমান সর্দ্দার, সাহেবের স্কুলে পড়েছ—এসব বাজে কথা নিশ্চয় তুমি বিশ্বাস কর না।"

গম্ভীর ভাবে মাথাটি নাড়িয়া মাকেন্‌গাম্‌ বলিল—"বিশ্বাসত আগে কর্‌তামইনা সাহেব—হেসে উড়িয়ে দিতাম, কিন্তু ম্‌'ভুকে মেরে ফেল্‌বার পর থেকে বিশ্বাস না করে আর পার্‌লাম না।"

আমি চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম—"কে ম্‌'ভু—সেই সর্দ্দার ম্‌'ভুর কথা

বল্‌ছ ?" এই ম্‌ভুকে আমি জানিতাম ; সে রাজার গৃহপালিত জন্তুর সর্দ্দার রক্ষক ছিল। এই হাসি-খুসী, বলবান্ যুবকটির মৃত্যুর কথা আমি শুনিতেই পাই নাই।

"হাঁ, সাহেব—সেই রাজার গরুর সর্দ্দার, আগেরবার যাকে তুমি এখানে দেখেছিলে। চল ঐ গাছতলায় ছায়ায় বসে, তোমাকে তার মৃত্যুর কথা আর মানুস-সিংহ কেন বিশ্বাস করি—সব বল্‌ছি।" ইহার পর মাকেন্‌গাম্ আমাকে যে কাহিনীটি বলিল—আমি সেটি হুবহু লিখিলাম।

"শেষ বৃষ্টিটা হয়ে যাবার আগে একদিন বিকালে, মাস্কুলুম্বী জাতীয় একজন পর্য্যটক কাসোকা তার নাম—ম্‌ভুর গ্রামে এসে কিছু খাদ্য চেয়েছিল। বল্‌ল—সে অনেক দূর থেকে এসেছে, ওকাভাঙ্গো নদী পার হয়ে সে তার ছেলের কাছে যাবে তার ছেলে প্রায় মাসেকের পথ দূরে, মরুভূমির ও-পারে একটা খনিতে কাজ করে। লোকটার রোগা এবং ক্ষুধিত চেহারা, কিন্তু তার দৃষ্টি হিংস্র ও হুঁশিয়ার—ম্‌ভু বুঝ্‌তে পারল, লোকটা মিথ্যা কথা বল্‌ছে। কারণ, ঐ জলশূন্য দেশে সঙ্গে খাদ্য না নিয়ে সে একা কি করে যাবে ?

"ম্‌ভু তাকে জিজ্ঞাসা করলে, সে বল্‌ল, যে, বরোট্‌সী-গ্রামে খাদ্যের জন্ত চেয়ে নেবে, তার মাংস শুকিয়ে নিলে পথে খাদ্যের অভাব হবে না। ফিরবার পথে, তার ছেলের কাছ থেকে যে টাকা পাবে তা থেকে খাদ্যের দাম চুকিয়ে দিবে।

"ম্‌ভু বল্‌ল—'বরোট্‌সীদের সঙ্গে তোমাদের জাতের চিরকাল শত্রুতা—তারা তোমার কথায় গরু দেবে কেন ? যাক্, তোমাকে দিনকয়েকের খাদ্য দেওয়া যাবে এখন। কিন্তু আমি বলি, তুমি বাড়ী ফিরে যাও, কারণ, পশ্চিমের দিকে কোনখানে একা গেলে, হয় পথে বুনো লোকেরা তোমাকে মেরে ফেল্‌বে, আর না হয় জলাভাবে তৃষ্ণায় তোমার প্রাণ যাবে।' এই কথা বলার পর ম্‌ভু লোকটিকে কিছু খাদ্য এবং দুধ দিয়ে, তার বাড়ীতেই তাকে থাক্‌তে বল্‌ল।

মানুষ-সিংহ "কাসোকা"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

শিশুসাথী

"লোকটি যখন খাচ্ছিল তখন ম্‌ভু দেখ্‌ল যে, সে যেন ভারি অনিচ্ছার সঙ্গে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে চোখ বাঁকিয়ে বাইরের গরুগুলির দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে। আরও দেখল—লোকটার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা নাই। এ ব্যাপারটার উল্লেখ করামাত্র কাসোকা তাড়াতাড়ি বাঁ পাটা অন্য পায়ের নীচে গুটিয়ে নিল এবং একটু রেগে বল্‌ল—'ছেলেবেলা হঠাৎ একটা ফাঁদে পায়ের ডগা আট্‌কে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে বুড়ো আঙ্গুলটা কেটে ফেল্‌তে হয়েছিল।'

গরুগুলোকে যখন গোয়ালে দেবার জন্য আনা হ'লো, তখন, একটা সাদা-লাল হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড়ের দিকে কাসোকা অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে, ম্‌ভুকে বল্‌ল—ঐ ষাঁড়টা মেরে তাকে মাংস দিতে, সে সঙ্গে নিয়ে যাবে। বলা বাহুল্য সর্দ্দার ম্‌ভু তখনই অস্বীকার করল।

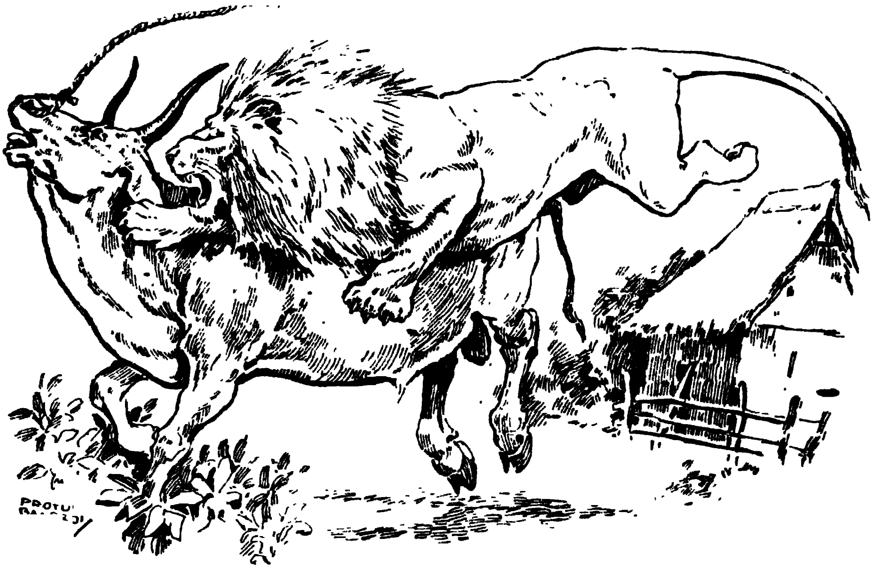
"তখন কাসোকা রেগে গজ্‌গজ্‌ কর্‌তে কর্‌তে বল্‌ল—'তোমাদের গরুর অন্ত নাই, তবু তোমরা ক্ষুধার্ত্তকে মাংস দিতে চাওনা—এর জন্য দেবতা একদিন তোমাকে সাজা দিবেন, তোমার গরু-বাছুর কেড়ে নিবেন। যাও, তোমার বাড়ীতে আমি ঘুমাব না। আমি ইমুসার গ্রামে চল্‌লাম—সেখানে হয়ত তোমাদের চেয়ে ভাল লোক পেতে পারি।'

"ম্‌ভু বল্‌ল—"তোমার ইচ্ছা হয় যাও কিন্তু ইমুসার গ্রাম বহুদূরে, সেখানে যেতে রাত হয়ে যাবে। একথা বলা সত্ত্বেও কাসোকা চলে গেল; কিন্তু পরে জান্‌তে পারা গেল, সে ইমুসার গ্রামে যায়নি।

"সেই রাত্রে একটা সিংহ এসে ম্‌ভুর গোয়ালে তাড়া দিয়ে সেই সাদা-লাল ষাঁড়টাকে মেরে ফেল্‌ল। সকলে মিলে সিংহটাকে তাড়িয়ে দিল, এবং ম্‌ভু বল্‌ল, যে, ভোর হলেই সিংহটার পায়ের দাগ ধ'রে গিয়ে সেটাকে মেরে ফেল্‌বে। এই কথা শুনে অন্যেরা তাকে যেতে বারণ করল।

"গাঁয়ের মোড়ল বৃদ্ধ ন্‌'ইরো-ই এই বিপদপূর্ণ কাজে যেতে বিশেষ ভাবে

বারণ করেছিল। সে বল্‌ল—'ম্‌ভু এই ষাঁড়টাকেই কাসোকা চেয়েছিল, আর অন্য লোকেরা রাত্রে ঘরের মধ্যে আগুনের পাশেই বসে থাক্‌তে চায়, কিন্তু কাসোকা রাত্রেই চলে যাবে বলেছিল। সুতরাং, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—কাসোকা 'মানুষ-সিংহ'—সেই ঐ ষাঁড়টাকে মেরেছে, সিংহে মারেনি। তুমি পায়ের দাগ



ধ'রে গেলেই বুঝ্‌তে পারবে, আমি সত্যি কথা বলেছি—সিংহটিংহ কিছুই দেখ্‌তে পাবে না।'

"ম্‌ভু রেগে বল্‌ল—'বাজে কথা! আমি কি খোকা, যে, এ কথা বিশ্বাস করব? তাছাড়া, কাসোকা যদি সত্যি মানুষ-সিংহ হয়—আমি তাকেই মারব। সিংহ কিংবা মানুষ-সিংহ—কোনটাকেও আমি ভয় করিনা। যেটাই হোক, আমার ষাঁড় মেরে কোনটারই অব্যাহতি নাই।'

মানুষ-সিংহ "কাসোকা"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

ছিন্নপত্রে গল্পিকে

"কাজেই ভোর হওয়ামাত্র ম্‌ভু সিংহের পায়ের দাগ ধ'রে চল্‌ল, তার ভয়ে অন্যেরাও সঙ্গে গেল। খানিক দূর গিয়েই সকলে দেখ্‌ল—সিংহের বাঁ পায়ের থাবার দাগে একটা আঙ্গুলের চিহ্ন নাই। তখনই সবাই থাম্‌ল এবং একজন বল্‌ল—'ম্‌ভু! ন্‌ইরো সত্যি কথাই বলেছিল। তুমি নিজেইত বলেছিলে, কাসোকারও বাঁ পায়ের একটা আঙ্গুল নাই। চল ফিরে যাই—এ সাধারণ সিংহের পিছনে আমরা যাচ্ছি না—এটা শয়তান!'

"ম্‌ভু নাক সিটকিয়ে হেসে উঠ্‌ল এবং বল্‌ল—'বেশ, তোমাদের কথা যদি সত্যিই হয়, তাহলে সিংহ হোক আর মানুষ হোক্—কাসোকাকে কি আমরা মার্‌তে পারিনা? আমি আরো এগিয়ে চল্‌লাম।'

"কাজেই, সবাই তখন আবার অগ্রসর হলো। লুইয়া নদীর ধারে ঝোপ পর্য্যন্ত গেলে পর সিংহের দাগ অদৃশ্য হলো, আর একটু দূরেই পাওয়া গেল কাসোকার পায়ের দাগ—নদীর দিকে চলেছে। আবার সকলে ম্‌ভুকে ফিরে যেতে বল্‌ল।

"ম্‌ভু ঠেঁটা কম নয়, বল্‌ল—'তোমাদের কথামত আমিও বিশ্বাস কর্‌ছি—কাসোকা মানুষ-সিংহই বটে। তা'হলে, ওর মানুষ দেহটা যদি মেরে ফেলি, তখন তার আত্মাটা শুধু সিংহ-দেহটার মধ্যেই থাক্‌বে—তখন সিংহ দেহটাকেও শেষ করে ফেল্‌ব।'

"দলের একজন বল্‌ল—'বুদ্ধিমানের কথাই বলেছ, ম্‌ভু—বাপদাদার আমলে হলে এটা বেশ সহজেই করা যেতে পার্‌ত, কিন্তু এখন কাসোকার মানুষ-দেহটাকে মার্‌লে হোয়াইট্ ম্যানের আইনের কাছে যে হিসাব দিতে হবে!'

"ম্‌ভু রেগে বল্‌ল—'যত সব বোকার দল—আরে, কাসোকাকে কি অস্ত্র দিয়ে মার্‌ব? ওর সামিল হ'য়ে গিয়ে বল্‌ব, তাকে মাংস দেইনি বলে আমাদের

মনে বড় দুঃখ হয়েছে; সে যে ষাঁড়টা চেয়েছিল সেটাকে সিংহই মেরে ফেলেছে—এখন তার যত ইচ্ছা মাংস পেতে পারে। আর, মাংস ত তাকে দেবই! কিন্তু জানোয়ারের খাদ্যে কি ক'রে বিষ মিশাতে হয়—সেটা আমরা ভুলে যাইনি। আজ রাত্রে কাসোকা ভরা-পেটে মারা যাবে! তখন তার দেহটা পুঁতে ফেল্‌ব! বিদেশী লোক—কি ক'রে সে মারা গেল, কেউ তার সন্ধানও নিতে যাবে না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলা যাবে—না খেতে পেয়ে অস্থি-চর্ম্ম সার হয়ে বহুদূর থেকে এসেছিল, শরীরে একটুও বল ছিল না—দেবতা 'ন্‌'ইয়াম্বি' তাকে নিয়েছেন।'

"উত্তর দিকে যে বড় রাস্তাটি গিয়েছে, সেই রাস্তায় গিয়ে সকলে যখন কাসোকার সামিল হ'লো, তখন বেলা প্রায় দুপুর হয়ে গিয়েছে। ম্‌'ভু যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল—সে কেন তার বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল, তখন কাসোকা বল্‌ল—'ম'ভু! অন্ধকার রাত যখন ঘনিয়ে এল, তখন বুঝ্‌তে পারলাম তুমি বুদ্ধিমানের কথাই বলেছিলে। আর ভাবলাম, আমার এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে ছেলের কাছে যাওয়া অসম্ভব, সুতরাং বাড়ী গিয়েই ছেলের জন্য অপেক্ষা করি। এই ভেবে সোজা পথে লুইয়া নদীর ধারে এসে পড়েছি। কাল এ সময়ে নন্দার গ্রামে যেতে পার্‌ব—সেখানে আমার এক ভাই থাকে।'

"ম্‌'ভু বুঝ্‌তে পারল কাসোকা মিথ্যা কথা বল্‌ছে কিন্তু ভারি চালাকি ক'রে বলেছে। তখন সে বল্‌ল—'কাসোকা, আমাদের গ্রামে যথেষ্ট মাংস আছে, চল, খেয়ে দেয়ে আজ রাত্রিটা বিশ্রাম করবে। কাল আরো মাংস নিয়ে—হয় নন্দার বাড়ীতে না হয় ছেলের কাছে—যেখানে খুসী যেয়ো।'

"খুসী হয়ে কাসোকা ওদের সঙ্গে এল এবং সন্ধ্যার সময় এসে গ্রামে পৌঁছাল। রাত্রে ভোজ-নাচ খুবই হলো, কাসোকার পান-পাত্রে ম্‌'ভু বিস্বাদ এবং গন্ধহীন বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। পরদিন সকালে দেখা গেল কাসোকা মরে পড়ে আছে।

মানুষ-সিংহ "কাসোকা"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

ম্‌ভু সকলকে ডেকে বল্‌ল—'ন্‌ইয়াম্বি কাসোকাকে নিয়েছেন। সে যদি সত্যি মানুষ-সিংহ হয়, তবে, এখন থেকে তার আত্মা সিংহদেহ ধরেই বাস করবে—তখন তাকে মারলে আইনের ভয় থাক্‌বে না। কিন্তু, মনে রেখো—কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বলা চাই—মানুষ-সিংহের কথা আমরা কিছু জানি না। আমরা, শুধু কাসোকাকেই জানি, সে ক্ষুধাতৃষ্ণায় অতিরিক্ত দুর্ব্বল হয়ে মারা গিয়েছে—যদিও আমরা তাকে পেট ভরে খাইয়েছিলাম।'

"নদীরধারে নিয়ে কাসোকাকে কবর দেওয়া হলো। দুই রাত্রি পর্য্যন্ত গ্রামের গরুবাছুর নিরাপদেই রইল। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা কত গান করল—ম্‌ভুর বুদ্ধি এবং সাহসের তারিফ ক'রে।

"তারপর তৃতীয় দিন শেষ রাত্রে, হঠাৎ শোনা গেল—গোয়ালের বেড়া দরজা ভেঙ্গে হুড়মুড় ক'রে গরুর দল বেরিয়ে ছুটেছে, সঙ্গে সঙ্গে সিংহের গর্জ্জন! লোকজন সকলে তাড়াতাড়ি মশাল এবং এমিগাই (বল্লম) নিয়ে গোয়ালে গিয়ে দেখল—সিংহ পালিয়েছে আর একটা বক্‌না-গরু ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। অন্ধকারের জন্য কেহ আর সিংহের পিছনে যেতে পারল না। বাকি রাতটা সকলে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কাটাল—'এ নিশ্চয় কাসোকা, সিংহের রূপ ধ'রে এসেছে তার হত্যাকারীকে সাজা দেবার জন্য।'

"সকালে গ্রামের লোকেরা গিয়ে খুঁজে বক্‌না গরুটাকে পেল—অনেকটা খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু মৃত গরুটার চারধারে যে পায়ের দাগ ছিল, তা দেখে সকলের চক্ষুস্থির!—সাম্‌নের বাঁ দিকের পায়ের দাগগুলিতে একটা আঙ্গুল নাই!! তখন সকলেই বল্‌তে লাগলো—'কাসোকা আবার ফিরে এসেছে!'

"ম্‌ভু চেঁচিয়ে উঠল—'এসেছেত কি হয়েছে—মূর্খের দল? আমি বলেছিলাম না, যে, সে ফিরে আসবে? এটাও বলেছিলাম না, যে, তার মানুষ-দেহটাকে যেমন মেরেছি সিংহ দেহটাকেও তেমনি মারব? আজ সিংহ-কাসোকাকেও

মানুষ-সিংহ "কাসোকা"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

মানুষ-কাসোকার কাছে যেতে হবে—সেই প্রেত-পুরীতে। সবাই অস্ত্র নাও, নিয়ে আমার সঙ্গে এস।'

"একটা প্রাণীও নড়ল না এবং বৃদ্ধ মোড়ল ন'ইয়ারো বল্‌ল—'ম্‌'ভু! যে সিংহের মধ্যে মানুষের আত্মা, সেটা অন্য সিংহের মত নয়। সে সিংহে একাধারে সিংহের বল এবং মানুষের বুদ্ধি—দুই-ই থাকে। কাসোকার আত্মা জানে কারা তার মানুষদেহকে মেরেছিল, এখন তাড়া দিতে গেলে সেও তাদের মারবে। ওর সঙ্গে আর ঘাঁটাঘাঁটি করোনা তাহলে, হয়ত, সেও আর আমাদের কোন অনিস্ট করবে না।'

"বাঃ, খাসা কথা বলেছে, ন'ইয়ারো! আমার এই দলটি দেখ্‌ছি, বুড়ো, বোকা একটা স্ত্রীলোকের দল। এখন থেকে, তাহলে তুমিই এদের সর্দ্দার হয়ে থাক। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি না যাও, আমি একাই এই সিংহের সন্ধানে যাব।"

"তখন ম্‌'পান্তা নামে একজন বল্‌ল—'ন'ইয়ারোর কথার মধ্যে সত্য আছে, আমিও এ ব্যাপারটা পছন্দ করছি না, কিন্তু তবু আমি তোমার সঙ্গে যাব, ম্‌'ভু। একদিন মরতে ত হবেই—চল, তোমার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।'

"তখন ম্‌'ভু আর ম্‌'পান্তা সিংহের পদ-চিহ্ন ধ'রে চল্‌ল। এই ঘটনার পরে ম্‌'পান্তার মুখেই শুনেছিলাম—ম্‌'ভু কি ক'রে কাসোকার সিংহ-দেহ সাবাড় ক'রে নিজেও মরেছিল।

"তারা দুজন খানিক দূর গিয়েছে—বেলা তখনও বেশী হয়নি—এমন সময় সাম্‌নে খানিক দূরেই একটা ঝোপের মধ্য থেকে সিংহের বজ্র-নিনাদ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে সিংহটাও বেরিয়ে বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হলো। আবার পদ-চিহ্ন ধরে যেতে যেতে, বেলা দশটার মধ্যে দুবার সিংহটাকে তারা দেখ্‌তে পেল কিন্তু একবারও গুলি করবার কিংবা বল্লম চালাবার মত সুবিধা পেল না।

মানুষ-সিংহ "কাসোকা"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

শিশুসাথী / গল্পিকা

"তারপর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হ'লো। দেখ্‌ল, পদ-চিহ্ন ঘুরে গ্রামের দিকে চলেছে। ক্রমে তারা গ্রামের কাছাকাছি একটা ঝোপের নিকটে গিয়ে উপস্থিত। ঝোপের ভিতরে সিংহের রাগের ঘড়ঘড়ানি শুনতে পাওয়া গেল, কিন্তু অনেক চেঁচামেচি কর্‌লে পরও সেটা বেরিয়ে এল না।

ব্যাপার দেখে ম্'পান্তার মনে ভয় হতে লাগ্‌ল। সে বল্‌ল—'সাধারণতঃ দেখা যায়, সিংহকে তাড়া কর্‌লে সেটা কখনও মানুষের বাড়ীর দিকে আসে না। এ জানোয়ারটা দেখ্‌ছি সাক্ষাৎ শয়তান—ওটা বোধ হয় আমাদেরই তাড়া করছে। তাছাড়া, ওটাকে ঝোপের ভিতর থেকে বা'র করতেও পারা যাবে না।'

"ম্'ভু রেগে বল্‌ল—'আমরা না পারি আর একজন পারবে—সে-ও আর এক শয়তান; মানুষ, সিংহ সবাই তাকে ডরায়।' এই ব'লে ম্'ভু সেই ঝোপে আগুন ধরিয়ে দিল।

"আগুন জ্বলে উঠ্‌তেই সিংহটা লাফিয়ে বিদ্যুতের মত বেগে বেরিয়ে এসে গর্জ্জন করতে করতে ম্'ভুর দিকেই তেড়ে এল। সর্দ্দার বন্দুক ছাড়ল সিংহটাও পড়ে গেল, কিন্তু চক্ষের নিমেষে লাফিয়েও উঠ্‌ল আবার। ম্'ভুর বন্দুকটা (সাবেক পেটার্ণের মার্টিনী) তাড়াতাড়ি খুল্‌তে পার্‌ল না। ম্'পান্তার হাতে এসিগাই ছিল, সেটাই তখন সিংহের পাঁজরে বসিয়ে দিল।

"তারপর দুজনে গাছের দিকে ছুট্‌ল, এবং পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল—সিংহটা রাগে বল্লমটাকে কামড়িয়ে ধ'রে ভেঙ্গে ফেলেছে। বল্লমটা মাটিতে পড়ামাত্র, আবার সিংহটা গর্জ্জন ক'রে ছুটে পালাল।

"ততক্ষণে ম্'ভু বন্দুকটা খুলে আবার কার্ত্তুজ ভরেছে। তখন চেঁচিয়ে বলল—'মানুষ-সিংহ হোক্ বা যাই হোক্, ওটার গা দিয়ে রক্ত পড়েছে,—যে দেহ থেকে রক্ত পড়ে সেটা মরতেও পারে।'

মানুষ-সিংহ "কাসোকা"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়



এই বলে তারা আবার যখন পদ-চিহ্ন ধ'রে চল্‌ল, তখন ম্‌'পান্তা বল্‌ল—'আবার বল্‌ছি, ম্‌'ভু এই ব্যাপারটা আমার ভাল লাগ্‌ছে না। সত্যি, বল্‌ছি, এ সিংহটা অন্যদের মত নয়। আমরা যখন গাছের দিকে ছুটেছিলাম, তখন আমাদের আক্রমণ করল না কেন? আহত হবার পর, পায়ের দাগ দেখে বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে, যে, আগের চেয়েও বেগে ছুট্‌ছে—কেন? মানুষের শয়তানী বুদ্ধি ওটার মাথায় খেল্‌ছে—ওর মতলব ভাল নয়!'

কিন্তু ম্‌'ভু আরো দ্রুত চল্‌ল; তখন সত্যি সিংহটাও খুব ছুট্‌ছিল। প্রায় দুপুর বেলা, ততক্ষণে তারা মিবান্তিরবন পার হয়েছে, ম্‌'পান্তা পিছনের দিকে চেয়েছিল—চেয়েই ভয়ে দারুণ এক চীৎকার! ম্‌'ভুও পিছনের দিকে তাকাল এবং দেখ্‌ল—তাদের

পিছনে বনের কিনারা থেকে আহত সিংহটা আস্‌ছে—খোঁড়াতে খোঁড়াতে কিন্তু তবু খুব বেগে!

তারা তার দিকে চেয়ে আছে দেখেই, সিংহটা ফিরে আবার ছুট্ দিল। ম্'পান্তা চেঁচিয়ে উঠল—'ঠিক যা ভেবেছিলাম্ তাই—আমরা সিংহ তাড়াচ্ছি না, ম্'ভু, আমাদের পিছনে শয়তান লেগেছে। পায়ের দাগ চলেছে সাম্‌নের দিকে, অথচ তাড়া কর্‌ছে পিছন থেকে—এ শয়তান ভিন্ন আর কি হ'তে পারে?'

"ম্'ভু কড়া জবাব দিল—'বাঃ, খাসা বলেছ। আরে, জানোয়ারটা সাম্‌নে যেতে যেতে, হঠাৎ ফিরে গিয়ে আমাদের পিছনে লেগেছে—এই ত হয়েছে ব্যাপার। ওটা আমাদের আক্রমণ কর্‌বেই, আর তাহলেই আমাদের কাছে আস্‌তে হবে—তখন ওটাকে গুলি ক'রে মারব।'

"যেখান থেকে সিংহটা ফিরে পালিয়েছিল, সেইখানে এসে, তার পদ-চিহ্ন ধরে আবার তারা চল্‌ল। প্রায় বিকালের দিকে তারা লম্বা ঘাস-পূর্ণ একটা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ সিংহটা সেখান থেকে বেগে ছুটে এল—একেবারে ম্'ভুর দিকে। ম্'ভু গুলি কর্‌ল, সিংহটাও টল্‌তে টল্‌তে থম্‌কে দাঁড়াল—পর মুহূর্ত্তেই ম্'ভুর ঘাড়ের উপরে পড়ে, তাকে মাটিতে ফেলে কাম্‌ড়ে ধর্‌ল।

"বন্দুকটা ম্'ভুর হাত থেকে ছিট্‌কে পড়ে গিয়েছিল, সিংহটা তাকে ধ'রে নিয়ে সেই ঘাস-বনে লাফিয়ে চলে গেল। ম্'পান্তা তার হাতের বল্লম ছুড়ে মেরেছিল বটে কিন্তু সিংহের গায়ে লাগ্‌ল না।

"ম্'পান্তা তখন বল্লমটা তুলে নিয়ে, ঘাস-বনের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। ঘাস-বনের অন্য পাশে একটা উঁচু উই-ঢিবির তলায় গিয়ে দেখ্‌ল, ম্'ভু আর সিংহটা পড়ে আছে—দুটোই মৃত! সর্দ্দারের ছোট্ট বল্লমটি সিংহের বুকে বসান—একেবারে হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে; আর সিংহটাও সর্দ্দারের গলায় এমনই মরণ-কামড় দিয়েছে যে, গলাটি একেবারে চুরমার!"

মানুষ-সিংহ "কাসোকা"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

গল্পটি শেষ করিয়া মাকেন্‌গাম্ বলিল—"সাহেব! এর পরেও যদি মানুষ-সিংহ বিশ্বাস করি ব'লে তুমি হাস, তবে, ভেবে দেখো—সিংহের পদ-চিহ্ন লোপ পেয়ে যাবার কথা, থাবার দাগে একটা আঙ্গুলের অভাবের কথা, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে অনুসরণকারীদের ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যাওয়া আবার সুবিধামত পিছন দিকে গিয়ে তাদেরই অনুসরণ করা। আরো ভেবে দেখো—শত্রু বধ না করা পর্য্যন্ত, বন্দুকের গুলি, বল্লম—কিছুতেই তাকে কাবু করতে পারল না, এবং অবশেষে, সাধারণ সিংহে যা করে না, সে তাই কর্‌ল—মৃত্যুর সময় বনের আশ্রয় ছেড়ে সে বেরিয়ে এল, যাতে ম্‌'পান্তা তার প্রতিশোধ নেওয়াটা দেখ্‌তে পারে।"

এই গল্প শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল, হয়ত বেচারি কাসোকা নির্দ্দোষ এবং সে যাহা বলিয়াছিল সবই সত্য। অন্য সব ব্যাপার শুধু ঘটনাচক্র আর শিকারে বাহির হইলে সিংহ কিরূপ অসাধারণ হিংস্র হইয়া উঠে এবং তাহার মাথায় কত রকম বুদ্ধি খেলে—এসব কথা ভাবিয়া দেখিলেও বিষয়টা অনেক পরিষ্কার হইবে। কিন্তু মাকেন্‌গামের মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম—সে-দেশের কিংবদন্তীর উপরই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। সে-দেশের লোকের আরও একটা বিশ্বাসের কথা মনে পড়িয়া গেল—সব হোয়াইট্ ম্যান্‌ই নির্ব্বোধ। ইহাদের পূর্ব্ব-বিশ্বাসটা যখন টলাইতে পারিব না, তখন পরের বিশ্বাসের মাত্রাটা বাড়াই কেন? সুতরাং, আমি শুধু বলিলাম—"তুমি যা বল্‌ছ তা ঠিক হতে পারে, মাকেন্‌গাম্. কিন্তু, ম্‌'ভু অন্ততঃ এটা প্রমাণ করেছে, যে, মানুষ-সিংহকে বধ করতে পারা যায়—কেমন, তা করেনি কি?"

"তা বলেছ ঠিক, সাহেব। কাসোকা আর ফিরে আসেনি, কিন্তু ব্যাপারটাতে ম্‌'ভুকে প্রাণ দিতে হ'লো ত? আমার মনে হয়, এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং প্রাণ দেওয়ার চাইতে, অপরিচিত কেউ এসে গরু বাছুর চাইলে, তাকে দিয়ে দেওয়াই ভাল।"



আয়োন

শ্রীনরেন্দ্র দেব

গ্রীসের রাণী ক্রুশার ছেলে হয়নি বলে রাজার মনে ভারি দুঃখ। রাজা জুথাস রাণীকে নিয়ে এলেন এপোলো দেবের মন্দিরে পূজো দিতে এবং এপোলোর সেবক দৈবজ্ঞদের কাছে জানতে যে রাণীর কোলে একটি ছেলে আসবে কিনা?

তখন সবেমাত্র ভোর হ'য়েছে। সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে উদয় হবার আগে ঊষার আলোয় পূর্ব্বদিক লাল হ'য়ে উঠেছে। এপোলো দেবের অন্যান্য সেবক দৈবজ্ঞদের নিয়ে তাদের নায়ক ব্রহ্মচারী আয়োন প্রতিদিন ভোরে মন্দিরে এসে সূর্য্যের স্তব গান গেয়ে দিবাকরকে বন্দনা করে। আজও সে ভোরবেলা এসে যথারীতি মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে তার ললিত মধুর কণ্ঠে সূর্য্যের স্তবগান করছিল।

শিশুসাথীকে

আয়োন

শ্রীনরেন্দ্র দেব

হে আদিত্য! হে তপন! হে প্রভাকর!
তোমার অরুণ রথের স্বর্ণপ্রভা দেখা দিয়েছে,
সমস্ত জগৎ আলোকিত হ'য়ে উঠেছে,
তোমার জ্যোতির প্রভায় নক্ষত্র নিচয়
একে একে রাত্রির বুকে মিলিয়ে যাচ্ছে,
পৃথিবীর সাদর আবাহনে দিনের আলো নেমে আসছে!

*　　*　　*　　*

কিন্তু আজ আয়োনের সূর্য্য স্তোত্রকে চাপা দিয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠলো রাণী ক্রুশার সখীদের মিলিত কণ্ঠের মঙ্গলগীত। তারা রাণীকে ঘিরে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলে।

এপোলোর তরুণ সেবক শান্ত সুন্দর মূর্ত্তি প্রিয়দর্শন আয়োনকে দেখে হঠাৎ রাণী চমকে উঠলেন! এবং পরক্ষণেই অত্যন্ত বিষণ্ণ ও কাতর হয়ে পড়লেন। তাঁর সেই ভাবান্তর লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়ে আয়োন জিজ্ঞাসা করলে—

"দেবী! আপনাকে এত বিমন দেখছি কেন? দেবপূজার জন্য যারা ভগবানের মন্দিরে আসেন তাঁদের সকলকেই ত' আমি বেশ হর্ষোৎফুল্ল দেখি! কিন্তু আপনার চোখে অশ্রুজল কেন?

রাণী ক্রুশা লজ্জিত হ'য়ে বস্ত্রাঞ্চলে তাঁর আঁখিজল মুছে ফেলে বললেন—ভদ্র যুবক, আমার অশ্রুজল তোমাকে বিচলিত ক'রেছে দেখে বুঝতে পারছি তোমার অন্তঃকরণ কোমল, তুমি দয়ালু। কেন জানিনা এপোলোর মন্দিরে এসে আজ আমার অনেকদিনের ভুলে যাওয়া পূর্ব্ব স্মৃতি আমাকে পীড়া দিচ্ছে! এক সন্তানবঞ্চিতা নারীর মনোবেদনায় আমার চিত্ত ব্যথিত হ'য়ে উঠছে! হে কিশোর সন্ন্যাসী, তুমি কি আমায় ব'লতে পারো—দেবতা যদি কোনো অন্যায় করেন তার জন্য অভিযোগ করবো আমরা কার কাছে? কে সে অন্যায়ের বিচার করবেন?

আয়োন

শ্রীনরেন্দ্র দেব

দেবতার মন্দিরে যে নারী পূজা দিতে এসেছে তারই মুখে এমন দেবনিন্দা শুনে এপোলোর সেবক আয়োন আরও আশ্চর্য্য হ'ল। প্রশ্ন করলে—"আপনি কি দেবতার বিরুদ্ধে আপনার নালিশ জানাতে এসেছেন না দেবতার পূজা দিতে এসেছেন ?"

রাণী তখন আয়োনকে তাঁর মন্দিরে আসার উদ্দেশ্য জানিয়ে আয়োনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

আয়োন বললে—আমি একটা অনাথ শিশু, মাতৃস্তন্যপানের সৌভাগ্যলাভ আমার জীবনে কখনো ঘটেনি। এপোলোর পূজারিণীকেই আমি মা বলে জানি। তিনিই আমাকে একেবারে অত্যন্ত শিশু অবস্থা থেকে মানুষ করেছেন শুনি।

রাণী জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার দিন চলে কি করে ? আয়োন বললে—"দেবতার সেবায় আমরা জীবন উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি যে ! এই মন্দিরের প্রসাদ অন্নেই আমার এ দেহ পুষ্ট হয়েছে।"

রাণী বললেন—"এমন সুন্দর মূল্যবান পরিচ্ছদ তুমি কোথায় পেলে ?"

আয়োন উত্তর দিলে—"দেবতার আশীর্ব্বাদে। তাঁর সেবকদের সকলকেই এই পোষাক পরতে হয়।"

রাণী এবার জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, সত্য ক'রে বলো দেখি তোমার বাপ-মার সংবাদ জানবার জন্য তোমার মনে কোনোদিনই কি কিছুমাত্র কৌতূহল হয়না ?"

আয়োন বললে—"দেবতার সেবক কখনো মিথ্যা বলে না দেবী ! আমার পিতামাতার সন্ধান পাবার কোনো উপায় নেই জেনে ও সম্বন্ধে আমার আর কিছু-মাত্র কৌতূহল নেই।"

রাণী কাতর হয়ে বলে উঠলেন—হায় হতভাগ্য, তোমার জননী যিনিই হোন না কেন, তিনি আমার চেয়েও দুখিনী।

আয়োন

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আয়োন বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—“আপনার একথার অর্থ কি ?—কি জানেন আপনি আমার জননীর পরিচয় ?”

রাণী বললেন—“আমার মনে হয় তিনিও নিশ্চয় দেবতা কর্তৃক প্রতারিত সেই রকমই এক নারী যেমন একজনের দুঃখময় ইতিহাস আমি জানি।”

উৎকণ্ঠিত হ’য়ে আয়োন জানতে চাইলে—“কে সে দুর্ভাগা রমণী ?” রাণী বললেন, “তারই কথা বলবার জন্য আমি আজ দেবতার মন্দিরে ছুটে এসেছি। এখনি রাজা এসে পড়বেন কিন্তু তিনি আসবার আগে আমি আমার বক্তব্যটুকু তোমাদের শোনাতে চাই। ওগো, সে ছিল এক রাজকুমারী ! প্রভু এপোলোর পরমভক্ত সে ! কাব্যকলা ও সঙ্গীত শিল্পের সুন্দর দেবতা এই এপোলো, আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদের একমাত্র অধীশ্বর এই কার্ত্তিকের তুল্য সুঠাম ঠাকুরকে সেই মেয়েটি ভক্তিভরে পূজা করেছিল। তার ঐকান্তিক পূজায় প্রসন্ন হয়ে দেবতা এপোলো তাকে একটি পরম সুন্দর সন্তান উপহার দিয়েছিলেন। রাজকুমারীর তপস্যা সার্থক হ’ল ! সে আনন্দে অধীর হয়ে এপোলোর দেওয়া শিশুটিকে নিয়ে যখন রাজ প্রাসাদে ফিরে যেতে চাইলে, এপোলো বললেন—“আমার শিশুকে ফিরিয়ে দাও !”

এপোলোর দেওয়া সেই শিশুটিকে পেয়ে রাজকুমারীর জীবন ধন্য মনে হয়েছিল।

রূপে সে ছেলেটি ছিল দেবতা এপোলোর চেয়েও সুন্দর, আকৃতি তার দেবতা এপোলোর চেয়েও সুঠাম ! তাকে কোলে পেয়ে রাজকুমারীর আনন্দ আর ধরছিল না ! কিন্তু তোমাদের ওই নিষ্ঠুর দেবতা এপোলো তার সেই ছেলেটিকে কেড়ে নিয়ে রাজকুমারীকে মন্দির থেকে দূর করে দিলেন ! হতভাগিনীর কোল আজও শূন্য হয়ে আছে ; সন্তান সৌভাগ্যে বঞ্চিতা সেই নারীর অশ্রুজল আজও শুকোয় নি !…ওগো ! তোমরা ত’ দৈবজ্ঞ ! তোমাদের অজানা ত’ কিছু নেই।



গল্পিকে

তোমরা বলে দাও না সে তার সেই ছেলেটির সন্ধান কোথায় পাবে? সে কি তাকে আর ফিরিয়ে পাবে না?…

রাণীর মুখে এই করুণ কাহিনী শুনে আয়োন অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়লো। তবু সে রাণীকে প্রবোধ দিয়ে বললে—"জননী! দেবতার বিরুদ্ধে আপনার এ অভিযোগ সত্য কিনা জানিনা। কিন্তু, যদি সত্য হয়, তথাপি আপনি দুঃখিত হবেন না, কারণ এটা স্থির জানবেন যে দেবতা যা করেন তা মঙ্গলের জন্য! উপস্থিত আমাদের পক্ষে তা একান্ত কষ্টকর হ'লেও, পরে হয়ত বুঝতে পারা যাবে যে দুঃখ তিনি দিয়েছিলেন সে তাঁর অন্যায় নয়, তাঁর কল্যাণ হস্তের আশীর্ব্বাদ! যে সন্তানকে তিনি রাজকুমারীর কোল থেকে কেড়ে নিয়েছেন তার সন্ধান পাবার জন্য আপনি দৈবজ্ঞের শরণাপন্ন হবেন না। আমার মিনতি শুনুন, দেবতার ইচ্ছা যদি না থাকে আপনাকে তার সংবাদ জানাবার, কোনো দৈবজ্ঞের সাধ্য নেই যে তা আপনাকে বলতে পারবে। তার কথা জানতে হ'লে আপনাকে দেবতার দয়ার উপরই একান্ত নির্ভর করে থাকতে হবে। তাঁরই কৃপায় একদিন সবই জানতে পারবেন দেবী!" এমন সময় বাইরে বহুলোকের পদশব্দ, কণ্ঠস্বর ও জয়ধ্বনি শোনা গেল! রাণী চম্‌কে উঠে বললেন—"ঐ রাজা আসছেন! দোহাই আপনার দৈবজ্ঞ ঠাকুর! আপনি যেন রাজার কাছে সেই সন্তান বঞ্চিতা রাজকুমারীর কোন কথা প্রকাশ করবেন না!"

সানুচর রাজা এসে মহাসমারোহে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে রাণীকে বললেন, "ট্রোফোনিয়সের গুহায় যে জ্যোতিষী সাধু আছেন আমি মন্দিরের পথে আসবার সময় তাঁর কাছে হয়ে এলেম। তিনি বলেছেন, এপোলোর দেউল থেকে তোমাকে বা আমাকে আজ হতাশ হয়ে ফিরতে হবে না। দেবতার দয়ায় আমরা আজ থেকে আর নিঃসন্তান থাকবো না!"

আয়োন

শ্রীনরেন্দ্র দেব

তারপর রাজা ও রাণী গেলেন দেবতার প্রধান মন্দিরের মধ্যে তাঁর পূজা দিয়ে দেবতার সদয় আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করতে।

আয়োন সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো,—রাণীর মুখে যে শোচনীয় কাহিনী সে শুনলে সে কি সত্য! দেবতাকে উদ্দেশ ক'রে সে বললে—"ঠাকুর! তুমি সর্ব্বশক্তিমান! তুমি মঙ্গলময়! মানুষের পাপ ও অন্যায়ের তুমি শাস্তি দাও, জগৎবাসীকে আমরা তোমার বিধান মেনে চলতে বলি, কিন্তু এও কি সম্ভব যে তুমি নিজে এমন অন্যায় ক'রেছো? কে জানে আমার পিতামাতা কে? আমার জননীও কি সেই অভাগিনী রাজকুমারীর মতই আমাকেও এই মন্দিরে হারিয়ে ছিলেন?"



প্রধান মন্দিরের ভিতর থেকে তখন রাজারাণী, রাণীর সখীগণ ও রাজ-অনুচরগণের মিলিত কণ্ঠে দেবারাধনার মধুর গম্ভীর মন্ত্রগান শোনা যাচ্ছিল।

ক্ষণকাল পরে মন্দিরাভ্যন্তর থেকে রাজা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন। সেই সুন্দর সুকুমার তরুণ পূজারী

আয়োন

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আয়োনকে সম্মুখে দেখতে পেয়ে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে, বল্‌লেন—"পুত্র! পুত্র! তুমি আমার সন্তান! তুমি এথেন্সের যুবরাজ! তুমি গ্রীসের রাজ-সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী!"

আয়োন বিস্মিত হয়ে বললে—"মহারাজ, ভুল করছেন, আমি আশৈশব এই মন্দিরের একজন দীন সেবক—আমি রাজপুত্র নই!"

রাজা জোর ক'রে বললেন—"হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয় রাজপুত্র, তুমি জাননা বৎস, এপোলোদেব স্বয়ং প্রসন্ন হ'য়ে আমাকে বলে দিলেন—"মন্দিরের বাইরে গিয়ে দেখ, যে ছেলেটি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেই তোমার সন্তান!"

আয়োন মিনতি করে বললে—"মহারাজ একজন ভিক্ষুককে, একজন অনাথকে নিয়ে গিয়ে রাজপুত্র বলে পরিচয় দিলে—এথেন্সের অধিবাসীরা তা শুনবে না। —আমার কথা শুনুন, আমাকে ছেড়ে দিন—"

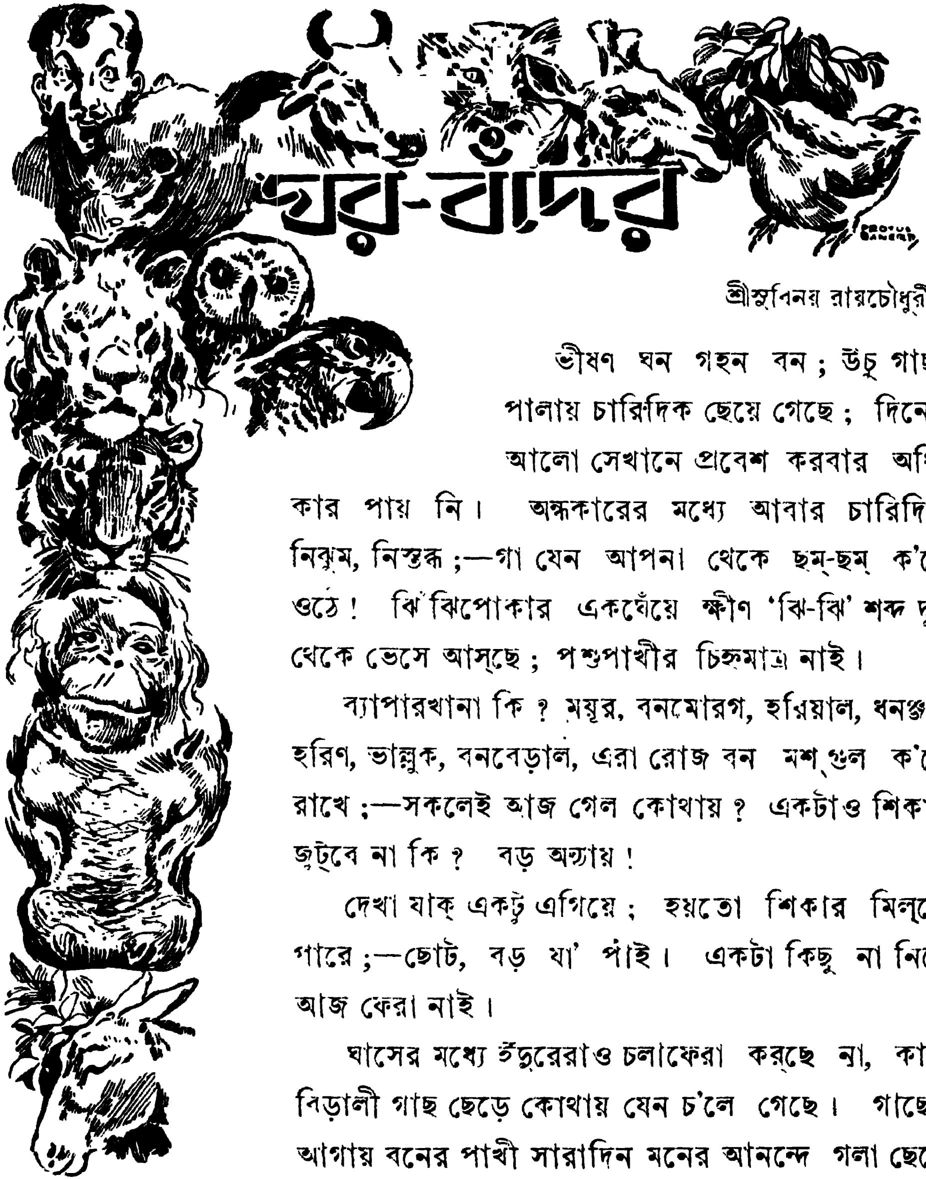
রাজা বললেন—"দেবতার আশীর্ব্বাদে সকলেই তারা বিশ্বাস করবে এ কথা! চল রাজপুত্র আমার সঙ্গে চলো!—মন্দির আর তোমার স্থান নয়, মন্দির ছেড়ে রাজপ্রাসাদে চলো!"

মহাসমারোহে, 'আয়োন'কে নিয়ে গিয়ে রাজ্যের যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করা হ'ল! রাণী সেই রাত্রে স্বপ্ন পেলেন, আয়োনই হচ্ছে তাঁর কুমারী কালের পাওয়া সেই দেবতার দান শিশুপুত্র!

এই 'আয়োন' থেকেই পরে গ্রীসে 'আয়োনিয়ান রাজবংশের' প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।*

---

* গ্রীস দেশের প্রাচীন কাহিনী।



ঘর-বাঁদর

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

ভীষণ ঘন গহন বন ; উঁচু গাছ-পালায় চারিদিক ছেয়ে গেছে ; দিনের আলো সেখানে প্রবেশ করবার অধিকার পায় নি। অন্ধকারের মধ্যে আবার চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ ;—গা যেন আপনা থেকে ছম্-ছম্ ক'রে ওঠে! ঝিঁঝিপোকার একঘেঁয়ে ক্ষীণ 'ঝি-ঝি' শব্দ দূর থেকে ভেসে আস্‌ছে ; পশুপাখীর চিহ্নমাত্র নাই।

ব্যাপারখানা কি ? ময়ূর, বনমোরগ, হরিয়াল, ধনঞ্জয়, হরিণ, ভাল্লুক, বনবেড়াল, এরা রোজ বন মশ্‌গুল ক'রে রাখে ;—সকলেই আজ গেল কোথায় ? একটাও শিকার জুটবে না কি ? বড় অন্যায় !

দেখা যাক্ একটু এগিয়ে ; হয়তো শিকার মিলতে পারে ;—ছোট, বড় যা' পাই। একটা কিছু না নিয়ে আজ ফেরা নাই।

ঘাসের মধ্যে ইঁদুরেরাও চলাফেরা করছে না, কাঠ-বিড়ালী গাছ ছেড়ে কোথায় যেন চ'লে গেছে। গাছের আগায় বনের পাখী সারাদিন মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান করে—তা'রা আজ সকলেই নিরুদ্দেশ। বানরেরাই বা গেল কোথায় ?

গাছে এমন সুন্দর পাকা ফল,—বানরের প্রিয় খাদ্য ; কিন্তু আজ তাদের কেউ ফলের দিকে চেয়েও দেখ্‌ছে না। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখী গাছের ফল খেতে খেতে 'ট্যাঁ-ট্যাঁ' শব্দে বন মাত ক'রে দেয় ;—কিন্তু তা'রাও যে আজ ফলের ধার ধার্‌ছে না।

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল আবিসিনিয়ার লড়াইএর কথা ; মনে প'ড়ে গেল বিষাক্ত গ্যাসের কথা। কেউ কি বিষের গ্যাস্ ছেড়ে বন উজাড় ক'রে দিল নাকি ?—না ! তা' হ'লে তো চারিদিকে পশুপাখীর মৃতদেহের ছড়াছড়ি হ'তো।

আরো এগিয়ে দেখা যাক্। মাইল খানেক গেলে তো আবার ফাঁকা ময়দানেই এসে পড়্‌ব।

নাঃ ! পশুপাখীর নামগন্ধও নাই।

... ...

ঐ দেখ ! ঐ যে !—ঐ খোলা ময়দানে জানোয়ার আর পাখীতে গিজ্‌গিজ্ কর্‌ছে। বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক, উল্লুক, নেকড়ে, হায়না, বনমানুষ, বানর, বনবেড়াল, শেয়াল, নেউল, গন্ধগোকুল, সজারু, কাঙ্গারু, খরগোস, ইঁদুর, ছুঁচো, গণ্ডার, কুণ্ডার, হাতী, ঘোড়া, উট, হরিণ, নীলগাই, গরু, মহিষ, গাধা, ছাগল, ভেড়া, জেব্রা, জিরাফ, হিপ্পো,—এমন কি, ওকাপি, পাণ্ডা, টাকিন্, চিঞ্চিল্লা, কিঙ্কাজু, প্যাঙ্গোলিন, কোয়ালা, কয়পু, আর্ম্মাডিলো. হংসচঞ্চু, ওয়াল্লারু, বিণ্টুরং, আই-আই—এরাও সকলে এসে জুটেছে। টিকটিকি, গিরগিটি, গোসাপ, তক্ষক, সুবর্ণগোধি, অজগর, কেউটে, গোখুরো, শঙ্খচূড়, দাঁড়াস, হেলে, ঢোঁড়া, লাউডগা, —এ সব সরীসৃপেরাও বাদ যায়নি। পাখীর তো কথাই নাই। উটপাখী, শকুনি, গৃধিনী, সাঁচান, চিল, ঈগল, বাজ, শিক্‌রে, ডাক, হাড়গিলা, বক, ময়ূর, মোরগ, পায়রা, ধনঞ্জয়, কাক, ঘুঘু, ফিঙ্গা, পানকৌড়ি, মাছরাঙ্গা, কাঠঠোকরা,

ঘর-বাঁদর

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

কাদাখোঁচা, হাঁড়িচাঁচা, চোখ-গেল, দয়েল, কোয়েল, শ্যামা, বুল্‌বুল, শালিখ, ময়না, টিয়া, চন্দন, কাকাতুয়া, হিরামন, চড়াই, টুন্‌টুনি, মনিয়া,—আর কত বল্‌ব।

হাঁ ক'রে অবাক হয়ে চেয়ে জানোয়ারের মেলা দেখ্‌ছি আর ভাব্‌ছি ব্যাপারখানা কি। সকলেই চুপ ক'রে ব'সে কি যেন শুনতে চাচ্ছে। সাম্নে প্রকাণ্ড পাথরের উপর একটা বুড়ো বনমানুষ, জাঁদরেল একটা বাঘ আর অন্য কয়েকটি জন্তু আর পাখী ব'সে আছে।

আমি এত অবাক হয়ে গেছি যে, বন্দুকটা ধপাস্ ক'রে হাত থেকে প'ড়েই গেল। সর্ব্বনাশ! এই বুঝি ওরা টের পায়! যা ভাবা তাই। একটা বনমানুষ কোত্থেকে এসে গম্ভীরভাবে বন্দুকটাকে তুলে নিয়ে সটান্ একেবারে মজ্‌লিশের মাঝখানে গিয়ে হাজির। আমি তো একেবারে আড়ন্ট—পালা'বারও শক্তি নাই।

চেয়ে দেখ্‌লাম, বন্দুকটা যেখানে রাখ্‌ল তা'র আশেপাশে আরো দু'চারটা বন্দুক রয়েছে, মানুষের পোষাক রয়েছে, তাঁবুর টুকরা রয়েছে, তীর, ধনুক, বর্শা, ফাঁদ খোঁয়াড় ইত্যাদিও রয়েছে;—অর্থাৎ কিনা, "জানোয়ার শিকার করতে গিয়ে মানুষের কি দশা হয় একবার দেখ।"

বন্দুক দেখেই চারিদিকে বিকট শব্দ হ'তে লাগ্‌ল। চেয়ে দেখ্‌লাম, বনমানুষ, বানর, বাঘ, এরা সকলেই যেন হাস্‌ছে। বুড়ো বনমানুষ হঠাৎ চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কিহে! এটা আবার কোত্থেকে? মানুষটা গেল কোথায়?"

অন্য বনমানুষটা বল্‌ল, "আছে সেটা। এত ভয় পেয়েছে যে সেটাকে আর কিছু করতে হবে না।"

অম্নি আবার হাসির হর্‌রা উঠ্‌ল! আমার কিন্তু রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

বুড়ো বনমানুষ বল্‌ল, "এবার তা' হ'লে সুরু করা যাক্।"

চারিদিক থেকে "হ্যাঁ", "হ্যাঁ" রব উঠ্‌ল।

ঘর-বাঁদর

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

বনমানুষ বল্‌ল, "আজকের বল্‌বার বিষয় হচ্ছে 'মানুষ'। অনেককাল মানুষের কাছে কাটিয়ে তাদের কীর্ত্তি-কলাপ, কাণ্ড-কারখানা, কায়দা-কানুন, কেলেঙ্কারীর অনেক কথা জেনেছি। তোমরা যদি শোন, হাস্‌তে হাস্‌তে পেট ফাট্‌বে, রাগে গা জ্বল্‌বে, ঘেন্নায় নাক সিঁট্‌কাবে, আবার অবাক হয়ে মুখ হাঁ ক'রে চেয়ে থাক্‌বে।"



"শুনেছি, ডুরবীণ না কোন্ একজন পণ্ডিত-মানুষ বলেছিলেন, আমাদের জাত থেকেই নাকি মানুষেরা জন্মেছে। এখনকার মানুষেরা আবার বল্‌ছে, ওকথা নাকি ঠিক নয়। বল্‌বেই তো! আমি বলি, আলবাৎ ঠিক! তা' যদি হয়, তা' হলে মানুষের নাম তো হওয়া উচিত 'ঘর-বাঁদর' যাক্ সে কথা।"

"মানুষ—থুড়ি, ঘর-বাঁদর—মনে করে সে বড্ড চালাক। আকাশে উড়্‌বার সখ হয়েছে, তাই একরকম কলের পাখী বানিয়ে উড়্‌তে চায়। কতবার যে পাখী

আকাশ থেকে ঝুপ্ ক'রে পড়ে আর মানুষগুলো—থুড়ি, ঘর-বাঁদরগুলো—চ্যাপ্টা হয়ে যায় তার আর হিসেবই নেই। কোনদিন কি তোমরা শুনেছ, পাখী আকাশে উড়্তে উড়্তে ঝুপ্ ক'রে প'ড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে ?—হ্যুঃ !"

পাখীদের মধ্যে বিকট হাসির রব উঠ্ল। একটা গেরোবাজ পায়রা অম্নি আকাশে উড়ে দশ বারোবার শূন্যে ডিগ্‌বাজি খেয়ে আবার নীচে নেমে পড়্ল। বনমানুষ তা'কে দেখিয়ে বল্ল, "মানুষ—থুড়ি, ঘর-বাঁদর—কলের পাখীকে ডিগ্‌বাজি খাইয়ে বেজায় বাহাদুরি নেয়—আবার বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে কতবার যে কুপোকাৎ হয়, তা' আর কি বল্‌ব! গেরোবাজ কি কোনদিন ডিগ্‌বাজি খেতে গিয়ে কুপোকাৎ হয়েছে ?—হুঃ !"

"গুটিপোকারা গাছের পাতা খেয়ে তা থেকে রেশম তৈরী করে। ঘর-বাঁদরেরা এতদিন পরে নাকি গুটিপোকার দেখাদেখি গাছের পাতা থেকে রেশমের নকল তৈরী কর্‌তে শিখেছে। যাক্, বাঁচা গেল! গুটিপোকারা বাঁচ্ল।"

"ডাক্‌তার ব'লে একরকম ঘর-বাঁদর আছে, তারা নাকি অসুখ সারায়। কতরকম লাল, নীল, হল্‌দে জল, বিচ্ছিরি তেতো, ঝাঁঝি জিনিষ, গুড়ো, দানা, কত কিছু তা'রা খাওয়ায়, মাখিয়ে দেয়, ঘষে দেয়,—আবার গায়ে ফুটিয়ে দেয়। তা' ছাড়া, কত কিছু কাটাকাটিও করে। তবু নাকি ঘর-বাঁদরেরা অসুখে ভুগ্‌ছেই রাতদিন আর মরছে গাদা গাদা! আরে! আমাদের কোন্ 'ডাক্‌তার' আছে ? আমরা সকলেই জানি কেমন ক'রে রোগ সারাতে হয়। আবার শুন্‌ছি, এখন নাকি ঐ সব 'ডাক্-তার' বল্‌ছে, 'ঘাস খাও, কাঁচা তরকারি খাও, ফল খাও; 'অসুখ হবে না'। ওরে হাঁদারা! এতদিন পরে তোরা জান্‌লি ? আমাদের কাছে আস্‌তি তো কবে শিখিয়ে দিতাম।"

"ঘর-বাঁদরেরা বলে, আমাদের অনেকে নাকি 'হিংস্র' জানোয়ার—মানে, হিংসে ক'রে কাম্‌ড়ে, খামচে দেওয়া তাদের স্বভাব! আরে বাপু! পেটের

সন্দেশ পত্রিকা

দায়ে যদি কেউ কাউকে মেরে খেয়ে থাকে, তবে কি সেটা হিংসের ব্যাপার হ'লো? নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে দু'চারটা আঁচড় কামড় দিলে সেটা কি হিংসের ব্যাপার হ'লো? শোন রকমটা! পিত্তি জ্বল্‌বে না তো কি! মানুষ—খুড়ি, ঘর-বাঁদর—আমাদের মিছিমিছি ভয় দেখাবে, চটিয়ে দেবে, আর আমরা সবাই দাঁত বের করে হাস্‌ব—না হ'লে 'হিংস্র' হয়ে যাবো যে। ভূঃ!"

"ঘর-বাঁদরের নিজের রকমটা শোন এখন। আমাদের জাতের কারো মাংস কারো চামড়া, কারো পালক, কারো লোম, কারো হাড়, কারো দাঁত, কারো রক্ত, কারো চর্বি, কারো ক্ষুর, কারো শিং, কারো ল্যাজ এদের নাকি কাজে লাগে—এই ছুতোয় এরা প্রতিদিন আমাদের লক্ষ লক্ষ জাত-ভাইকে মেরে ফেলছে। নিজেদের মধ্যেও লড়াই ক'রে এরা লক্ষ লক্ষ ঘর-বাঁদরকে মেরে ফেল্‌ছে। প্রাণে মার্‌বার সাংঘাতিক যন্তর বের করেছে। এক রকম ধোঁয়া বের করেছে, যা' নাকে লাগ্‌লে দম আট্‌কে যায়, গায়ে লাগ্‌লে গা পুড়ে যায়। এই তো সেদিন হাব্‌সিদের সঙ্গে লড়াইএ সাহেবরা এই ধোঁয়া জঙ্গলের মধ্যে ছেড়েছিল; তা'তে হাব্‌সিরা তো দলে দলে মরেছেই, জঙ্গল-বাসী আমাদের জাতভাইও মরেছে বিস্তর। তবু কিনা আমরাই হ'লাম হিংস্র! ছোঃ!"

"একদিন আমি একটা মাথায় পর্‌বার 'টুপি' কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। একটা সাহেব—মানে, গোলাপী ঘর-বাঁদর—আমার কাছে টুপিটা চাইল। আমি কেন তাকে দিতে যাব? সেটাত কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আমি টুপিটা লুকিয়ে রাখ্‌লাম। তখন যদি তার মুখ দেখতে! আমার বেজায় হাসি পেল। আমি আরো দূরে সরে গেলাম। সাহেব আমার পিছু তাড়া করল। ধর-ধর হ'তেই আমি শুধু তা'কে একটু ধাক্কা দিয়েছিলাম—তা'তেই সাহেব চিৎপটাং! অম্নি রাস্তায় রীতিমত ভিড় জমে গেল। আমাদের সার্কাসের

মালিক এসে সাহেবকে কয়েকটা চক্‌চকে 'টাকা' দিয়ে গোল মিটা'ল। 'টাকা' না হ'লে ঘর-বাঁদরদের দিন চলে না। কোনও জিনিষ যদি তোমার দরকার হয়, চক্‌চকে গোল গোল চাক্তি 'টাকা' দিয়ে সেটাকে নিতে হবে। ছোট জিনিষ নেবার জন্য 'পয়সা', 'সিকি' এসব ছোট ছোট চাক্তি তৈরী করা হয়। গাছের ফল পেড়ে খেলেই হ'লো না—তার বদলে চাক্তি দিতে হবে। আরে বাপু! আমরা চাক্তি পাব কোথায়? আব্দারটা দেখ একবার!"

"আবার ঐ সব চাক্তির জন্যও ঘর-বাঁদরদের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি, খুনোখুনিও হয়ে যায়। একজনের চাক্তি অন্য জনে লুকিয়ে চালাকি ক'রে নেবারও চেষ্টা করে রাতদিন। কি ঘেন্নার কথা! যা'রা লুকিয়ে, চালাকি ক'রে চাক্তি নেয় তাদের বলে 'চোর'; যা'রা জোর ক'রে, মার-ধোর ক'রে নেয়, তা'রা হলো 'ডাকাত'। 'পুলিশ' ব'লে একরকম ঘর-বাঁদর আছে, তা'রা এই সব 'চোর' আর 'ডাকাত'দের খুঁজে বেড়ায়। ধর্‌তে পার্‌লে এদের অনেকদিন একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা হয়—তা'র নাম হ'লো 'জেল'। তবু ঘর-বাঁদরেরা 'চুরি', 'ডাকাতি' কর্‌তে ছাড়ে না। আমাদের জাতের—পশু আর পাখী—যদি কেউ চুরি নাও করে, তবু তাদের ধরে নিয়ে ঘর-বাঁদরেরা বন্ধ ক'রে রেখে দেয়—আর কোনদিন ছাড়েই না। এটা শুধু তাদের সখ। আবার, চাল মেরে এর নাম 'জেল' না দিয়ে রাখা হয়েছে 'পোষা'—ছ্যাঃ!"

চারিদিকে অম্নি "ছি—ছি—ছি" রব উঠ্‌ল।

বনমানুষ বল্‌ল, "এবার বাঘভায়ার পালা। তা'র মুখ থেকে কিছু শোনা যাক্।"

বাঘ উঠে বল্‌ল, "বনমানুষভায়া যা' বলেছে, অতি খাঁটি কথা। আমায় কিনা বলে 'হিংস্র'! নিরামিষ আমার মোটেই সয় না, তাই পেটের দায়ে এক-আধটা

জন্তু মারি ;—সে জন্য আমি হলাম হিংস্র ; আর ঐ ঘর-বাঁদরগুলো পেটের দায়ে জন্তু তো মারেই, তা' ছাড়া, সখের জন্য যে কত জন্তু মারে তা'র ঠিক-ঠিকানাই নেই। ভেবে দেখ একটিবার !—একজনের সখ, অন্যের কাল। ছিঃ ! নিজের নিজের জাতভাইকেই যে মেরে ফেলে তা'র নাম 'হিংস্র' হবে না তো কা'র নাম হবে ?"

সবাই, "ঠিক, ঠিক !" ব'লে উঠ্ল।

বাঘ বল্ল, "আমি আর বেশী কিছু বল্‌ব না। শুধু এই কথাটি বল্‌তে চাই, যে, ঘর-বাঁদরেরা আমাদের মেরে ফেল্‌বার জন্য এত ব্যস্ত যে, চারিদিকে রটিয়ে দিয়েছে, আমাদের কাউকে মার্‌তে পার্‌লে অনেকগুলো চাক্তি বক্‌সিস্ পাবে। হ্যাংলা ঘর-বাঁদরগুলো তাই বন্দুক হাতে রাতদিন আমাদের পেছনে লেগে আছে, ফাঁদ পাত্‌ছে, দল বেঁধে শিকার কর্‌ছে। তবুও আমরাই হ'লাম 'হিংস্র !' ঘেঁয়াওৎ !"

বাঘ ধপ্ ক'রে ব'সে পড়্‌ল আর একটা গাধা উঠে, কান নেড়ে, মুণ্ডু নেড়ে চেঁচিয়ে বল্‌তে সুরু কর্‌ল, "ঘর-বাঁদরগুলো আমার নাম দিয়েছে 'গাধা'। 'গা' মানে 'গান কর', আর 'ধা' মানে 'দৌড়ে যা'। অবিশ্যি, আমি খুব জোরে দৌড়াতে রাজি নই, তাই 'ধা' বল্‌তে পারে আমাকে। কিন্তু, 'গা' বলে কোন্ মুখে ?—কোন্ লজ্জায় 'গা' বলে ? দু' একবার গাইবার চেষ্টা ক'রে দেখেছি, ঘর-বাঁদর-গুলো রীতিমত তেড়ে মার্‌তে এসেছে আমাকে ! কেন বাপু ? এত তোয়াজের দরকার কি ? 'গাস্‌নাধা' নাম দিলেই পার্‌তে।"

চারিদিকে "ঠিক বলেছ গাধাদাদা !" রব উঠ্‌ল ; গাধাও ব'সে পড়্‌ল।

একটা গরু অম্নি চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "গাধাভায়া যা' বলেছে, খুব ঠিক। আমার নাম 'গাই' কেন হ'লো, তা'ও বলা শক্ত। আমি নিজে আমার নামকরণ

করিনি ;—ঘর-বাঁদরগুলোই চালাকি ক'রে আমাকে বলে 'গাই'। আমার চৌদ্দপুরুষে কেউ কখনও গাইবার চেষ্টা করেছে ব'লেও শুনি নি ;—গাওয়া তো দূরের কথা। মধ্যে মধ্যে 'গ গাঁ' বল্‌লেই যদি গাওয়া হ'তো, তবে আর ভাবনা ছিল কি ?—সবই ঘর-বাঁদরদের চালাকি !"

সকলে "ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা" ব'লে জিভ কাট্‌ল ; গরুও ব'সে পড়্‌ল।

বুড়ো বনমানুষ ফিস্‌ফিস্ করে আরেকটা বনমানুষকে কি জানি বল্‌ল, আর সে সটান্ আমার কাছে এসে বল্‌ল, "ওরাংকাকা তোমাকে ডেকেছে ; ঘর-বাঁদরদের হয়ে কিছু বল্‌বার থাকে তো এসে নির্ভয়ে বল্‌তে পার।"

একবার ভাব্‌লাম পালাই ; আবার ভাব্‌লাম, পালা'তে গেলে যদি কোন বিভ্রাট ঘটে ; তার চেয়ে যাওয়াই ভাল।

ভয়ে পা কাঁপ্‌ছে ; নিতান্ত অনিচ্ছায় যাচ্ছি। জানোয়ার আর পাখীরা সবাই চেয়ে দেখ্‌ছে ; কেউ বল্‌ছে, "বেচারা", কেউ বল্‌ছে, "দেখ একবার ঘর-বাঁদরটাকে !" কেউ বল্‌ছে "প্‌ফুঃ", কেউ বল্‌ছে, "চ্ছুঃ", কেউ বল্‌ছে, "হ্‌ন্তুঃ" ! —রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।

উঁচু পাথরের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই বুড়ো বনমানুষ দিব্য কায়দায় নমস্কার ক'রে আমাকে বল্‌ল, "আসুন ঘর-বাঁদর দাদা ! আপনার জাত-ভায়েদের হ'য়ে কিছু বল্‌বার মুরোদ থাকে তো বল্‌তে পারেন। ন্যাকামি বা লজ্জা ক'রে লোক হাসিয়ে লাভ কি !"

রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল ; তেড়ে কিছু শুনিয়ে দেবার ইচ্ছাও হ'লো। কিন্তু, তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বেশী কিছু তো আর বলা যায় না। তবু, অনেকটা সাহস ক'রে বল্‌তে উঠলাম।

বুড়ো বনমানুষ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌ল,—"একটু দাঁড়ান্ ; গানটা

একবার শুনিয়ে দিই।—ওহে! একবার সেই ঘর-বাঁদরদের মনের গানটা গাও না।"

অম্নি একপাল টিয়া, ময়না, দোয়েল, কোয়েল, শ্যামা, বুল্‌বুল্ আর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কোলা ব্যাং আর ভঁড়ো শেয়াল মিলে গান ধর্‌ল—

"নেইকো তাদের গোলাগুলি, নেইকো তাদের 'চাক্‌তি !'
তাদের দেশে হাল-ফ্যাসানে চাল-চালাকির থাঁক্‌তি।
'পুলিশ' সেথা একটিও নাই, নাই সেখানে 'ডাক্‌তার' ;
থাকেও যদি, কেউ কোনদিন শোনে নি নাম-ডাক তা'র।
হিংস্র তা'রা, মূর্খ তা'রা, নয়রে তা'রা সভ্য,
মরণ ছাড়া, ভাগ্যে তাদের আর কিছু নয় লভ্য।"

চারিদিকে বেদম হাসির রোল উঠ্‌ল—এ ওর গায়ে হেসে একেবারে গড়াগড়ি! চারিদিকে "আবার গাও!" "আবার গাও!" চিৎকার। বনমানুষ আমার থুৎনি ধ'রে, চোখ টিপে মুচ্‌কি হেসে বল্‌ল, "কি দাদা! গানটা বুঝি পছন্দ হচ্ছে না?"

ঠিক এম্নি সময়ে উপর থেকে "ভ্—র্—র্-র্" ক'রে এরোপ্লেনের আওয়াজ শোনা গেল—সেই ময়দানেই নামছে।

বনমানুষ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "ঐ দেখ কলের পাখী! আনাড়ি হাঁদাগুলো চায় আমাদের ঘাড়ে পড়্‌তে।"—

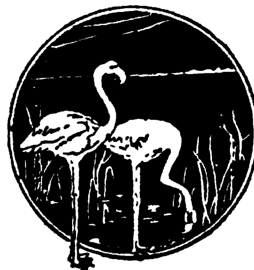
যাই এ কথা বলা, অম্নি চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। আকাশ ছেয়ে গেল পাখীতে ; জানোয়ারেরা যে যার আপন প্রাণ নিয়ে চোঁ-চাঁ দৌড়।

এরোপ্লেনটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাঠে এসে নাম্‌ল। শুন্‌তে পেলাম, ভেতরে কে যেন বল্‌ছে, "এই আনাড়ি হাঁদা ধাঁরেটাই তো যত গোল বাধাল—" বল্‌তে

বল্‌তে এরোপ্লেনের তলার চাকা একটা পাথরের সঙ্গে ঠেকে দুম্ ক'রে আওয়াজ হ'লো ;—আমিও একেবারে ঠিক্‌রে প'ড়ে গেলাম।

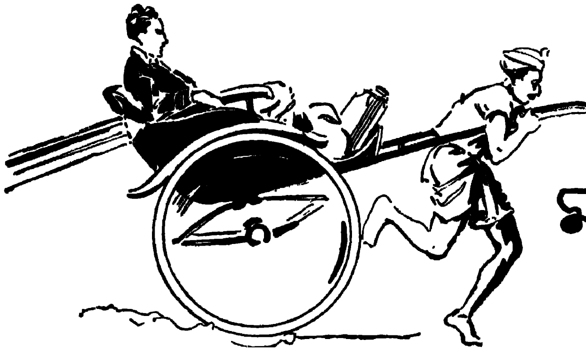
*

হঠাৎ দেখি, জঙ্গলের ধারে, পাথরের উপর থেকে চিৎপাত হয়ে প'ড়ে গেছি ;—শিকার করতে এসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনেই নাই। হাতের বন্দুকটা মাটিতে প'ড়ে গিয়ে কেমন ক'রে জানি ছুটে গে'ছে আর একটা ছুঁচো গুলি লেগে মরেছে ;—চ্ছ্যাঃ !



হাসির গল্প





মামাবাড়ির মজা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

আমি পশ্চিমে মানুষ হয়েছি। কলকাতায় এসেছি মাঝে-মাঝে, সে নেহাৎই বেড়াতে আসা। একটানা বেশিদিন থাকা হয়নি একবারও। তারপর কলেজে পড়বার সময় পর-পর কয়েকটা বছর লক্ষ্ণৌ থেকে এলাহাবাদ আর এলাহাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌ—এই করেই কাটলো। বিলকুল পশ্চিমি বনে' গেলুম, বলতে গেলে।

উত্তর-ভারতে থেকে গান-বাজনার সখটা হয়েছিলো। ওস্তাদজীদের পিছনে ঘুরে-ঘুরে সময় নষ্ট করেছি মন্দ না। বোধ হয় তারই ফলে সেবার বি-এ পরীক্ষায় ফেল করলুম। ফেল করে' মনে বড় কষ্ট হ'লো। এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম যে ফেল যে করেছি সে আমার বুদ্ধির দোষে নয়; একটা ফাইন আর্টের চর্চ্চা করতে গিয়ে। কথাটা মাকে বলতেও গিয়েছিলুম একবার। শুনে তিনি বললেন—যাক্‌গে।

কিন্তু মা-র কথাটা মনে বড় লাগলো। মনে হ'লো, দিই সব ছেড়ে-ছুড়ে; গানের আসরে ভেসে ভেসেই জীবনটা কাটুক। কিন্তু তারও কি ছাই উপায় আছে! মনে-মনে খানিকক্ষণ চিন্তা করলুম, তারপর ঠিক করলুম এবারে কলকাতায় গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসি। কথাটা ভেবেই খুব ফুর্ত্তি হ'লো। এমনিতেই অনেকদিন কলকাতায় যাওয়া হয় না। আমার মঞ্জুমামা আছেন সেখানে, সম্প্রতি তিনি বিয়েও করেছেন; তাঁর বাড়ীতে সময়টা ভালোই কাটবে। তিনি নিজে

মামাবাড়ির মজা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

দু'বার বি-এ ফেল্ করার পর ইন্সিয়োরেন্সের কাজে ঢুকে পড়েছিলেন ; দু'চার বছরের মধ্যে উন্নতিও করে' ফেলেছেন আশ্চর্য্য। এককালে তবলা বাজাবার নেশাও ছিলো তাঁর। নানা কারণেই এ-সময়টায় মঞ্চুমামার গৃহই আমার মনে হ'লো আদর্শ আশ্রয়।

তার উপরেও একটা সুযোগ জুটলো। সেবার শীতকালে কলকাতায় পড়লো অল্-ইণ্ডিয়া মিউজিক্যাল্ কন্ফারেন্স্। আনন্দে প্রাণ নেচে উঠলো। একটু চেষ্টা-চরিত্র করে' একটা ডেলিগেটশিপ জোগাড় করে' ফেললুম। বাড়ির কাউকে অবিশ্যি বললুম না সে-কথা। যাবার দিন যখন ঘনিয়ে এলো মাকে বললুম ;

'মা, এবার কলকাতায় যাই একটু।'

'কেন? কলকাতায় আবার কী!'

'এখানে বসে' থেকে আর কী হবে!'

'ওখানে গিয়েই বা কী হবে তোর!'

মুখ কাঁচুমাচু করে' বললাম ; তা চেষ্টা করতে দোষ কী? মঞ্চুমামা আছেন ওখানে—'

'থাক্, থাক্, কলকাতায় বেড়াবার সখ হয়েছে বললেই পারিস্।'

খুব গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বললুম ; 'পরীক্ষা-টরীক্ষা আমি আর দেবো না, মা, ও-সব আমাকে দিয়ে হবে না। তার চাইতে কাজকর্ম্মের চেষ্টা—'

মা হেসে ফেললেন, 'হয়েছে! আর ভালোমানষি করতে হবে না।'

আমি গাম্ভীর্য্যের ভাব আর-এক পরদা চড়িয়ে দিয়ে বললুম ; 'সত্যি ভাবছি, মঞ্চুমামাকে বলবো, যদি আমার জন্যে একটা-কিছু—ভালো লাগে না আর এই ডালরুটির দেশে পড়ে' থাকতে।'

শেষ পর্য্যন্ত একদিন বেরিয়ে পড়া গেলো। মঞ্চুমামার ঠিকানা সতেরো

নরেশ মল্লিক লেন, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে। সারা-রাত জপ করতে-করতে এলাম, পাছে ভুলে' যাই। আচ্ছা তাক লাগানো যাবে মামাকে। ইস্টিশান থেকে ডেলিগেটদের সঙ্গে দল বেঁধে চৌরঙ্গির এক পুরোণো বাড়িতেই ওঠা গেলো—সেই প্রাসাদতুল্য ভবনে বসবাসের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা'র জন্য না হোক্ —আঠারো ঘণ্টা রেল-ঝাঁকুনির পর শরীরটাকে একটু জিরিয়ে নিতে। ভাবলুম, পরের দিন সকালে ধীরে-সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় যাওয়া যাবে মামার ওখানে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই বেরোলাম, মামার ওখানে গিয়েই ভালো করে' চা খাওয়া যাবে। যদিও কলকাতার পথ-ঘাটের সঙ্গে বেশি পরিচিত নই আমি, নরেশ মল্লিক লেন চোখের পলকেই বেরিয়ে গেলো। তিন, চার, পাঁচ…একটু পরেই সতেরো, তারপর, মঞ্জুমামা, তারপর নতুন-মামী, রাজকীয় চা-পান আর আমিরি গল্প। খুবই খুসি হ'য়ে উঠলো মনটা।

তিন চার ইত্যাদির পর যথাক্রমে ষোলো এলো। তারপর সতেরো-এ সতেরো-বি, সতেরোর-এক—নানারকম সতেরো পার হ'য়ে এসে হঠাৎ দেখি গলিটা খুলে গেছে ক্রীক রো নামে এক অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তায়। কী মুস্কিল! সতেরো আবার লুকোলো কোথায়? রাইট্-এবাউট-টর্ন করে' আবার হাঁটতে সুরু করলুম, এদিকে উঁকি, ওদিকে ঝুঁকি—সতেরো নম্বরকে পাকড়াতেই হবে—গলা উঁচু করে' উপরে তাকাচ্ছি, যদি বা মঞ্জুমামার গোলগাল নধর মুখখানা দেখা দেয় কোনো জানলায় কি বারান্দায়। এমনি পেশী ও চক্ষু-সঞ্চালন করতে-করতে গলির অন্য মুখে এসে পড়লাম। কোথায় সতেরো! পাজি সতেরো নম্বর আমাকে জব্দ করবার জন্যেই ইচ্ছে করে' লুকিয়ে রয়েছে, এ স্পষ্টই বুঝতে পারলাম। আর আমারও তখন জেদ চড়ে গেলো, যেমন করে' হোক্ ওকে বার করতেই হবে।

তিনবারের বার নরেশ মল্লিক লেন পরিক্রমণ করছি যখন, এক বাড়ির বাইরের দাওয়ায় বসা এক ভদ্রলোক হঠাৎ হাঁক দিলেন;

মামাবাড়ির মজা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

—'ও মশাই, শুনছেন।'

তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক বুড়ো-মত, গায়ে গেঞ্জি, মাথায় টাক। পা ছড়িয়ে রোয়াকে বসে আনন্দবাজার পড়ছেন।

আমি বিনীত ভাবে তাঁর কাছে গিয়ে বললুম, 'আজ্ঞে?'



আনন্দবাজার থেকে চোখ তুলে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন। সত্যি বলছি, তাঁর সে তাকানোটা আমার একটুও ভালো লাগলো না। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন; 'আপনার এখানে কী দরকার মশাই?'

ঝট্ করে' মাথায় রক্ত উঠে গেলো।—'আমার কী দরকার তা দিয়ে আপনার কি দরকার?'

'দরকার আছে। আপনি এ-পর্য্যন্ত চার-বার এ-গলিটা আপ এণ্ড্ ডাউন করেছেন। প্রাতর্ভ্রমণ করতে কেউ নরেশ মল্লিক লেনে আসে না। সুতরাং হয় আপনি কোনো বাড়ী খুঁজছেন, নয় তো—'

মামাবাড়ির মজা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

ভদ্রলোককে কথা শেষ করতে না-দিয়ে আমি বললুম, 'ঠিক ধরেছেন, মশাই। আমি একটা বাড়ী খুঁজছি। সতেরো নম্বরটা কোথায় বলতে পারেন?'

'ঐ আপনার বাঁ দিকের বাড়িগুলো সারি-সারি সতেরো। সতেরো-এ, সতেরো-বি, সতেরোর-এক—'

'আজ্ঞে ওগুলো আমি দু'তিনবার করে' পরিদর্শন করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি এ, বি, সি কি বাই-এক বাই-দুই ইত্যাদি ভাঙাচোরা খুচরো চাইনে—একেবারে পাকাপাকি পুরোপুরি সতেরোটি চাই।'

ভদ্রলোকের মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেলো। কেমন একরকম করে' বললেন, 'হুঁ।'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'এই দেখুন আমার কাছে ঠিকানা লেখা রয়েছে।' বলে' পকেট থেকে ছোট এক টুকরো কাগজ বার করে' ভাঁজ খুলে দেখালুম, তাতে পষ্ট লেখা রয়েছে—১৭ নরেশ মল্লিক লেন। মা নিজে লিখে দিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক কাগজটা দেখে মাথা নাড়লেন।—'বুঝলেন, ওটা ভুল লেখা হয়েছে। এ-গলিতে সতেরো নম্বর কোনো বাড়ি নেই।'

'সে কী কথা মশাই! সতেরোর এতগুলো খুচরো রয়েছে, আর আস্ত সতেরোই কিনা নেই!'

ভদ্রলোক হাত উল্টিয়ে বললেন; 'সে আমরা কি করবো, বলুন। কর্পোরেশনের কর্ত্তাদের খেয়াল।'

'আপনি ঠিক জানেন সতেরো নম্বরের কোনো বাড়ি নেই এ-গলিতে!'

'ঠিক জানি! আপনি বলছেন কী, মশাই! একদিন নয় দু'দিন নয়, আজ বিশ বচ্ছর বাস করছি এই গলিতে। এই গলিতে, এই বাড়িতে। এ বনেদি গলি মশাই, অনেককালের পুরোণো সব বাসিন্দা এখানে। কোন্ বাড়ির ছেলে

পরীক্ষায় ফেল করলো আর কোন্ বাড়ির বাবুর মাইনে বাড়লো, সে-সব খবরও আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সম্বন্ধে রাখি—আর নম্বর তো নম্বর।'

আমি বললুম; 'এ-গলির ছেলেরা খুব পরীক্ষায় ফেল করে বুঝি? বেশ, বেশ।'

ভদ্রলোক আমার দিকে কটমট করে' তাকিয়ে বললেন; 'আপনি দেখছি মশাই অল্প বয়েসেই বড় চালাক হ'য়ে গেছেন। জানেন, আমাদের আট নম্বর বাড়িতে একজন পি-এইচ্-ডি, পি-আর-এস্ আছেন, আর এক কুড়ি নম্বরেই তিন তিনটে এম-এ পাশ ছেলে সারাদুপুর পড়ে-পড়ে ঘুমোয়! আপনি আছেন কোথায়!'

রীতিমত লজ্জিত হ'য়ে বললুম; 'ও, তাই নাকি।'

'জানেন,' বলতে-বলতে ভদ্রলোকের মোটা শরীর যেন আরো ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো, 'জানেন, এই সমস্ত গলিটা ঠিক এক বাড়ির মত। এ-বাড়িতে মেয়ের বিয়ে হ'লে ও-বাড়িতে এঁটো পাতা এসে পড়ে, ও-বাড়ির কারো অসুখ করলে এ-বাড়ির লোকের রাত্রে ঘুম হয় না।'

আমি বলে' ফেললুম, 'তা না-হ'য়ে উপায় কী? যা ঘিঞ্জি!'

'ঘিঞ্জি! মশাইয়ের নিবাস কোন্ অঞ্চলে জানতে পারি?'

'আজ্ঞে আমি পশ্চিমে থাকি।'

'ও তা-ই, তা-ই, তা—ই বলুন। কলকাতার বাসিন্দে হ'লে আর অমন কথা মুখে আনতেন না, মশাই। ঘিঞ্জি দেখতে চান তো একটু আগিয়ে ঐ মৌলালির বাজারখানা একবার ঘুরে আসুন। আপনার আর দোষ কী—খোট্টাদের বুনো মাঠ থেকে এসে কলকেতার সহর একটু চাপা-চাপা লাগবেই তো। তা আপনি কার বাড়ী চান, বলুন তো?'

মুহূর্তে আমার মাথার ভিতরটা বোঁ করে' ঘুরে উঠলো। তাই তো, মঙ্কুমামার

নাম কী? চিরকাল তাঁকে মঙ্কুমামা বলে'ই জেনে এসেছি—কখনো মনে হয়নি আর-কিছু জানবার দরকার হ'তে পারে। অন্য সব মানুষের মত তাঁরও একটা পোষাকি নাম আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-নামে আমি তো কাউকে তাঁকে ডাকতে শুনিনি। ঘরে তিনি মঙ্কু, বাইরে তিনি মঙ্কুবাবু। হঠাৎ কেউ তাঁকে হরেনবাবু কি গিরীনবাবু, কি অনুপমবাবু বলে' সম্বোধন করলে এতটা শক্‌ড্‌ হতাম যে তাতে হঠাৎ হার্টফেল করাও অসম্ভব হ'তো না। গিরীন কি যতীন কি অনুতোষ গোছেরই কী যেন তাঁর একটা নাম, ধূ-ধূ এইরকম মনে পড়তে লাগলো; কিন্তু আন্দাজে আর যা-ই বলা যাক্‌, মানুষের নাম তো বলা যায় না।

'বলুন, কার বাড়িতে যাবেন আপনি', ভদ্রলোক আবার বললেন।

অগত্যা আমি বললুম; 'যাঁর বাড়িতে যাবো তিনি আমার মামা হন্‌। ফিনিক্স লাইফ ইন্‌সিয়োরেন্স কোম্পানির মিঃ দত্ত।'

মনে খুবই আশা ছিলো, যিনি ছেলের পরীক্ষা ফেল থেকে বাপের পদোন্নতি পর্য্যন্ত পাড়ার সমস্ত খবরই রাখেন, তাঁর কাছে এটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট হবে। কিন্তু ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন; 'আরে ও-সব দত্ত-টত্ত শুনে কি কিছু বোঝা যায়, মশাই? নামটা কী তাই বলুন।'

আমি ঢোঁক গিলে বললুম; 'নামটা তো আমি ঠিক জানিনে। আমরা ছেলেবেলা থেকে মঙ্কুমামা বলে' ডাকি।'

ভদ্রলোক আমার দিকে এমন ভাবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন যে আমার প্রায় হিমসিম খাবার অবস্থা। তারপর চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন; 'মামার নাম জিজ্ঞেস করতেই যে গোল বেধে গেলো। কী ব্যাপার?'

কথাটা শুনেই তড়াক্‌ করে' আমার মাথায় রক্ত চড়ে' গেলো। বললুম, 'আপনি ও-রকম করে' আমার সঙ্গে কথা কইবেন না বলে' দিচ্ছি। আপনি কি ভাবছেন আমি মিথ্যে কথা বলছি?'

মামাবাড়ির মজা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

'আমি যা বলছি তা আর না-ই শুনলে,' বলে' ভদ্রলোক বিশ্রী হা-হা করে' হেসে উঠলেন। 'সরে' পড়ো ছোকরা, এখানে সুবিধে হবে না।'

মনে-মনে যতই রাগ হোক্, এই হোঁৎকা বুড়োটাকে কী করে'ই বা বোঝাই! অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক তাকালুম; দেখলুম, আরো দু' একজন পাড়ার লোক দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যাপার সুবিধের নয়, সত্যি। শেষটায় চোর কি জোচ্চোর ঠাউরে মার দিলেই বা কী করতে পারি! মামাবাড়িতে মহাসমারোহে চা খেতে এসে এমন দুর্দ্দশা কার কবে হয়েছে বলো তো!

আমি ফ্যালফ্যাল করে' তাকিয়ে বললুম; 'নম্বরটা হয়তো আমি ভুল এনেছি, কিন্তু আমি যা বলছি তা সত্যি। আপনারা কেউ কি চেনেন না ভদ্রলোককে—ফিনিক্স্ কোম্পানিতে কাজ করেন, রোগা, কালো-মত—'

কিন্তু আমার কথা কেউ কানেই তুললো না—'থাক্, থাক্, আর-কিছু বলতে হবে না, বাবা—এবার সরে' পড়ো।'

তবু আমি বীরত্ব করে' বললুম; 'আচ্ছা, এখন আমি যাচ্ছি, কিন্তু এর পরে ঠিক এসে ঠিক বাড়িতেই উঠবো—তখন টের পাবেন আপনারা।'

বলে' হনহন্ করে' এগিয়ে গলি পার হ'য়ে বেরিয়ে গেলুম! মনটা বিশ্রী হ'য়ে গেলো। ভাবো একবার, সকালে উঠে এক পেয়ালা চা-ও খাওয়া হয়নি।

দুই

সুতরাং বড় রাস্তায় পড়ে' প্রথম যে চায়ের দোকানটা পাওয়া গেলো তাতেই ঢুকে পড়লুম। চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে এগ্-পোচের অপেক্ষায় বসে' আছি, এমন সময় দোকানে ঢুকলেন খুব ব্যস্তবাগীশ গোছের মোটাসোটা এক ভদ্রলোক। আমার পাশের টেবিলে বসে' তিনি হাঁক দিলেন;

—'ওরে, এক পেয়ালা চা, শিগগির।'

তাঁর হাবে-ভাবে বোধ হ'লো এ-দোকানের তিনি বাঁধা খদ্দের। নিজের মনে একটু-একটু করে' চা খাচ্ছি, এমন সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটলো। সেই মোটা ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন; তারপর টেবিলের উপর দু' হাত রেখে আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে' বলে' উঠলেন; 'একী! আমাদের হাবুল না?'

সঙ্গে সঙ্গে আমিও বলে' উঠলুম; 'আরে মঞ্চুমামা যে!'

সত্যি-সত্যি মঞ্চুমামা। তবে কিনা দেখে চিনবার উপায় নেই। পাঁচ বছর পরে তাঁকে দেখলাম—এর মধ্যে তিনি যেন শরীরটাকে ফরমায়েস দিয়ে বদলে নিয়েছেন। ছিলেন বেজায় রোগা, এখন দেখছি দিব্যি গোলগাল; মাথায় কিছু খাটো হওয়াতে প্রায় বেলুনেরই মত দেখতে। ছিলেন আমার মতই কালো, এখন দেখছি রীতিমত ফর্সা। তিনি আগে আমাকে না-চিনলে আমি যে চিনতে পারতুম এমন কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না।

যা-ই হোক্, মঞ্চুমামার সঙ্গে দেখা তো হ'য়ে গেলো—আর চাই কী! আমার কাঁধে খুসির প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি বললেন; 'কী রে, তুই কবে এলি? কেন এসেছিস? কোথায় আছিস? কী খবর? দিদি কেমন আছেন?'

এতগুলো প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে দেয়া অসম্ভব জেনে আমি শুধু বললুম; 'এসেছি কাল। আজ তোমার ওখানেই যাচ্ছিলুম, কিন্তু—'

তারপর আমি সংক্ষেপে আমার দুঃখের কাহিনী বললুম।

শুনে মামা আমার পিঠ চাপড়ে হো-হো করে' হেসে উঠলেন।—'আরে বলিস্ কী! এই ব্যাপার! ও নিশ্চয়ই আমাদের নন্দবাবু—বুড়ো ঐ দাওয়ায় বসে'-বসে' দিন-রাত্তির পথের লোক ডেকে আলাপ করে। ওর বাড়িতে অনেকবার চুরি হ'য়ে গেছে কিনা, তাই কেউ বাড়ির কাছ দিয়ে একটু হাঁটলেই

আর রক্ষে নেই। হবে না চুরি—যে কিপ্‌টে বুড়ো! তা তুই বুঝি ফিরেই চলেছিলি?'

'ফিরবো'না! যা এক পাড়ায় বাসা নিয়েছো, মামা। তা আমিও বোকাই বনে' গেলুম, না পারি তোমার নাম বলতে—আর তোমার চেহারার বর্ণনা যা দিয়েছিলুম—' মামার দিকে তাকিয়ে আমি একটু হাসলুম।

'আর বলিস্‌নে হাবুল, দিন-দিন কেবল মোটাই হ'য়ে চলেছি। কিছু খাইনে বলতে গেলে, তবু ছাখ্—'

বলে মামাবাবু আস্ত একটা অমলেট একবারে মুখে পুরে দিলেন।

সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করে' বললুম: 'কত করে' বোঝালুম—মিঃ দত্ত, যিনি ফিনিক্সে কাজ করেন—'

'ওঃ ফিনিক্স তো কবে ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল আমি জেনিথে—তা বুঝি জানিস্‌নে?'

বৃত্তান্ত শুনে ঘেমে উঠলুম। আমাকে জোচ্চোর বলে' যে থানায় চালান করেনি এই বেশি। চুপে-চুপে জিজ্ঞেস করলুম; 'তোমার ভাল নামটা কী, মঙ্কুমামা?'

মঙ্কুমামা তক্ষুণি পকেট থেকে ভারি একটা চামড়ার ব্যাগ বার করলেন, আর সেই ব্যাগের এক ছোট খুপরি থেকে বার করলেন একখানা ভিজিটিং কার্ড। সেটা আমার হাতে দিতে গিয়ে হঠাৎ থমকে বললেন; 'এই ছাখ্—কী-রকম খারাপ ব্যবসাদারি অভ্যেস হ'য়ে গেছে। তোকে এটা দিতে যাচ্ছিলুম কেন বল্ তো? আমার নাম অবিনাশ—বুঝলি? তুইও তো কম হতভাগা নোস্, নামটা বেমালুম ভুলে বসে' আছিস! নাম বলতে পারলে নন্দবাবু ঠিক বাড়ি দেখিয়ে দিতেন। বুড়োর আর তো কোন কাজ নেই—কেবল পাড়ার লোকের কুষ্ঠিঠিকুজির খবর রাখা!'

মামাবাড়ির মজা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

অবিনাশ নামটা বারকয়েক মনে-মনে জপ করে' নিয়ে বললুম ; 'এখন তুমি কোথায় বেরুচ্ছো ?'

'কোথায় আবার ! কাজে। মরবার সময় নেইরে। মরবার সময় নেই। একেবারে লেবারিং ক্লাসের লোক আমরা। তা তুই কোথায় আছিস ?'

'মিউজিক্যল্ কনফারেন্সের ডেলিগেট হয়ে এসেছি, মঞ্জুমামা—'

'তাই নাকি ? তাই নাকি ? তা বেশ করেছিস—এবার আমার ওখানেই চলে' যা এক্ষুনি। সতেরো-এ বাড়ির নম্বর।'

'তুমি যাবে না ?'

'পাগল ! এই আমি বেরুচ্ছি, আর হয়তো ফিরবো সন্ধ্যেয়।'

'খেতেও আসবে না ?'

'আমরা লেবারিং ক্লাসের লোক—আমাদের আবার নাওয়া-খাওয়া ! কোনো-রকমে বেঁচে থাকা আর কি।' একসঙ্গে এতগুলো কথা তাড়াতাড়ি বলে' মঞ্জুমামা হাঁসফাঁস করতে লাগলেন।

একটু চুপ করে' থেকে আমি বললুম, 'যে জন্যে কলকাতায় এসেছি সেটা তোমাকে এখনই বলে রাখি। যদি কোনোখানে একটা চাকরি-টাকরি—

'নে, নে, ও-সমস্ত পরে হবে, আমার এক মুহূর্ত্ত সময় নেই এখন ! কেষ্ট, কত হ'লো সব সুদ্ধ—থাক্, থাক্, তোর আর পয়সা বার করতে হবে না। তা তুই তোর জিনিসপত্র নিয়েই একেবারে চলে' যাস্ না। সেই তো ভালো হবে।'

আমি ভয়ে-ভয়ে বললুম ; 'মামীমা যদি বাড়িতে ঢুকতে না দেন ? তিনি তো আমাকে কখনো দ্যাখেননি।'

'থাক্, আর ফাজলেমি করতে হবে না। যাস্ কিন্তু ঠিক,' বলতে-বলতে মঞ্জুমামা উঠলেন। 'তোদের মিউজিক্যল্ কন্‌ফারেন্সের একটা টিকিট দিস তো—শুনে আসবো একদিন। আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের আলাপ

হয়েছে—ওস্তাদ গাইয়ে-বাজিয়ে। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলেই বরাবর থাকেন—কিছুদিন হ'লো এসেছেন এখানে। একদিন নিয়ে আসবো তাঁকে বাড়িতে, শুনবি। তোর খুব সখ-টখ আছে দেখছি তাহ'লে। বেশ, বেশ। চল্, বেরুই। এক সেকেণ্ড্ সময় নেই আমার।'

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়েই শেয়ালদা যাত্রী একটা চলতি ট্রামে লাফিয়ে উঠলেন মঞ্জুমামা। হাত নেড়ে চীৎকার করে' বললেন; 'যা, আমার ওখানে যা এখনই।'

কলকাতায় মামাবাড়ির আদর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলাম, কিন্তু তখনই আবার গেলাম না। ফিরে গেলাম ডেলিগেটদের উপনিবেশেই, দুপুরের খাওয়াটা সেখানেই সেরে একটু ঘুমিয়ে নিলুম। তারপর বিকেল পড়তে বাক্স-বিছানা একটা রিক্‌শার মাথায় চাপিয়ে রওনা হলুম মামাবাড়ির দিকে। এবারে গিয়ে খোদ মঞ্জুমামাকেই বাড়ি পাবো নিশ্চয়ই, সুতরাং কোনো ভাবনা নেই।

নির্ভয়ে কড়া নাড়লুম সতেরো-এর দরজায়। নাড়ছি তো নাড়ছি, সাড়াশব্দই নেই কারো। উপরে তাকিয়ে এমনও মনে হ'লো না যে বাড়িতে কেউ নেই। হয়তো মামা এখনো ফেরেননি, হয়তো মামীর দুপুরের ঘুম এখনো ভাঙেনি। সুতরাং দরজায় ধাক্কা দিলুম বেশ একটু জোরেই।

টিনের আওয়াজের মত গলায় এক ঝি সাড়া দিলে, 'কে ?'

চেঁচিয়ে বললুম, 'খোলো দরজা।'

'কাকে চাই ?'

ঝির গলার সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করে' বললুম, 'বাবুকে চাই।'

'বাবু বাড়ি নেই। বাড়িতে কোনো ব্যাটাছেলে নেইকো।'

ফিরে গল্পে (stylized logo)

'তা হোক্। দরজা খোলো।'

'কে রে বাবা ঝামেলা করছে এসে!' গজরাতে-গজরাতে ঝি দরজার দিকে আসছে বোঝা গেলো। অতি সন্তর্পণে আধখানা পাট খুলে ঝি উঁকি মেরে আমাকে দেখে নিতেই চেয়েছিলো বুঝি, আমি কোনো কথা না-বলে' দরজা ঠেলে শাঁ করে' ভিতরে ঢুকে গেলুম।

সঙ্গে-সঙ্গে ঝি তার ক্যানক্যানে গলা ফাটিয়ে এমন এক চীৎকার করে উঠলো যে আমিই কেঁপে উঠলুম। 'ওগো বৌমা, শিগগির এসো, দেখে যাও—কে একটা মিন্সে কিছু না-বলে'-কয়ে' সোজা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। ওমা, কী উপায় হবে গো!'

আমি তো হতভম্ব, কিন্তু মামীমাটি বেশ চটপটে দেখলুম। একটু ভয় পেলেন না, একটু ঘাবড়ালেন না; দুমদাম করে' নেমে এলেন নীচে, এসেই আমাকে দেখে হেঁকে উঠলেন: 'কে? কে তুমি? কী চাও?'

আমি মাথা স্থির রাখবার চেষ্টা করতে-করতে বললুম: 'আপনি প্রথম দর্শনেই আমাকে তুমি বলে ঠিকই করেছেন—কেননা আমি আপনার ভাগ্নে হই।'

'নাও, আর চালাকি কোরো না। বেরিয়ে যাও এই মুহূর্ত্তে।'

'আপনার বাড়ি, আপনি বললে নিশ্চয়ই বেরিয়ে যাবো; কিন্তু এটা আপনি বিশ্বাস করুন যে মঞ্জুমামা সত্যিই আমার মামা। তাঁর সঙ্গে সকালে আমার দেখা হয়েছিলো, তিনিই আমাকে আসতে বলে' দিয়েছিলেন। এখন যদি আমি চলে' যাই, কাল সকালে তাঁকেই হয়তো আবার ছুটতে হবে আমার খোঁজে। তিনি ব্যস্ত মানুষ, তাঁকে ও-রকম খাটানো কি আপনার উচিত হবে? না কি ভাগ্নের সঙ্গে এ-রকম ব্যবহারই ভদ্রতা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানা আছে, ও-রকম ভাগ্নে ঢের পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। এক্ষুনি যাও তুমি বলছি, নয়তো আমি লোকজন ডেকে জড়ো করবো।'

মামাবাড়ির মজা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

নন্দবাবুর কথা ভেবে আমার বুকের ভিতরটা যেন শুকিয়ে গেলো। তবু বললুম, 'দেখুন, আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছিনে। আপনার এমন ভাগ্নে কি থাকতে পারে না যাকে আপনি কখনো চোখে দ্যাখেননি? আমার নাম হাবুল, ভালো নাম সরোজ, লক্ষ্ণৌয়ে থাকি বরাবর—আমাদের কথা কি আপনি একেবারেই শোনেন নি? আমি কালই মোটে লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছি—আপনার সঙ্গে আগে পরিচয় হয়নি সে যে আমার কত বড় দুর্ভাগ্য তা এখন বেশ হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছি।'



'নাও, নাও আর সাত কথা বলতে হবে না। বেরোও শিগগির স্কাউণ্ড্রেল। যত সব রাস্তার র‍্যাগামফিনের উৎপাতে আর বাঁচিনে আজকাল।'

শুনেছিলাম, আমার নতুন মামীমা ইস্কুলে-কলেজে পড়েছিলেন, তাঁর মুখে

ইংরিজি গালাগাল শুনে অবাক হ'লাম না। মামীমা আবার বললেন, "কই, গেলে না!' তখন আমি বললুম: 'আচ্ছা মামীমা, এই যে আপনি আমাকে ইংরিজি-বাঙলা মিশিয়ে এতগুলো গালাগাল দিলেন, কেন বলতে পারেন? দেখছেন তো আমার রোগা-পটকা চেহারা—ভয় পাবার মত কিছুই নয়। যদিও বরাবর পশ্চিমে মানুষ হয়েছি, স্বাস্থ্যটা সে-রকম হয়নি। আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমি বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি—যতক্ষণ মঞ্জুমামা না ফেরেন। দেখুন, সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছি—আবার ফিরে যাবো!'

মামীমা মেঝেতে পা ঠুকে বলে' উঠলেন, 'তুমি যাবে কি না তা-ই বলো! তুমি ভেবেছো তোমার চালাকি আমি বুঝতে পারিনি? চারদিকে কত কাণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে, আর আমি কি এমনিই বোকা মেয়ে! আমি বাড়িতে একা মানুষ না-হ'লে ঠিক তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিতুম।'

ঝিটা এতক্ষণ এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো, এইবারে বোধ হয় সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে বললে: 'যাবো নাকি, বৌমা, কাউকে ডেকে আনতে?'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'থাক্, থাক্, তোমাকে যেতে হবে না—আমিই যাচ্ছি।'

মামীমা আরো জোর পেয়ে বলতে লাগলেন, 'থাকতেন উনি বাড়িতে—ওমা, ঐ তো এসে গেছেন, ছাখো তো—'

কিন্তু তাঁর কথা শেষ না-হ'তেই মঞ্জুমামা আমার পিছন থেকে বলে' উঠলেন, 'এই যে হাবুল, এই এলি নাকি? বাইরে রিক্শাতে জিনিসপত্র দেখলাম যেন। এই তো ছাখ্, সেই সকালে বেরিয়েছি, আর এই ফিরলুম। জীবনে আর সুখ নেই রে। তা তোকে না তক্ষুনি আসতে বললুম? খাওয়ার ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করছো তো ভালো করে'—'

শেষের কথাটা বলে' মঞ্জুমামা মামীমার দিকে তাকালেন। কিন্তু কোথায়

মামীমা? তিনি একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেছেন। খুঁজে খুঁজে তাকে পাওয়া গেলো সিঁড়ির নিচে, দেয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশে আছেন। লজ্জায় আর চোখ তুলে তাকাতে পারেন না। মঙ্কুমামা অবাক হ'য়ে বললেন, 'তোমার আবার হ'লো কী আজ?'

আমি হেসে বললুম, 'থাক্‌গে মামীমা, যা হ'য়ে গেছে তা হ'য়েই গেছে। ইংরিজি বাঙলা মিশিয়ে অনেক গালাগাল তো দিলে—এবার খুব ভালো করে' খাওয়াও, তাহ'লেই দোষ কেটে যাবে।'





অথ আয়োডিন-ঘটিত

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

বাঘের সঙ্গে আত্মীয়তার কথাটাই সর্ব্ববিদিত ; কিন্তু ভালুকের সঙ্গেও যে তার সম্পর্ক আছে ক'জন জানে একথা ? তা' জানবার সৌভাগ্য—অথবা হয়তো দুর্ভাগ্যই তাকে বল্‌তে হবে—একমাত্র আমারই একার হয়েছিল। বেড়ালকে তোমরা কেউ নাচ্‌তে দেখেছো ? অবিকল ভালুকের মতো, দুই বাহু তুলে এবং লেজের উপর ভর্ না দিয়ে ? বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগে এবং বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলে বেড়ালের মধ্যে সেই সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হতে দেখা গেছে। এবং তাইতেই আমি জান্‌তে পেরেছি যে কেবল বাঘের মাসীই নয়, ভালুকের পিসীও বলা যেতে পারে শ্রীমতী বেড়ালকে।

এবং তারপরেও তার যেসব কাণ্ড-কলাপ স্বচক্ষে দেখেছি তাতে সিংহের মামী বল্‌তেও তাকে আমার আপত্তি হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সে-কথা যথাসময়ে।—

আমাদের বাড়ী একটি আদুরে বেড়াল আছেন। আমার আদরের নয়,

অথ আয়োডিন-ঘটিত

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

আমাদের বিনির আদরের। তিনি নিজের খেয়াল মাফিক চলেন, তাঁকে কারো কিছু বলা নিষেধ। তুমি বসে আছ তিনি তোমার গায়ে এসে ল্যাজ বুলাবেন্, কোনো কথা বল্‌তে পাবে না। ভুলবশত তুমি দাঁড়িয়েছ কি তিনি তোমার দু' পায়ের সমুচ্চ গেটের ভেতর দিয়ে ল্যাজ ফুলিয়ে চলেছেন। যাবেনই তিনি, সমস্ত বাদ প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে—কেউ তাঁকে থামাতে পারবে না। যেন ফাঁসি-সৈন্য রোমের নগর-তোরণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তার এবম্বিধ ঘনিষ্ঠতার পরেই তোমার সর্ব্বাঙ্গে যা আবিষ্কার করবে তা ফাঁসিস্তের রোম নয়—বেড়ালের রোম। আদিম ও অকৃত্রিম!

পায়ের ভেতর দিয়ে বেড়ালের যাতায়াত—এসব আমি একেবারে পছন্দ করি না। এইজন্যই কি বিধাতা পায়ের ফাঁক সৃষ্টি করেছিলেন?—এ সম্বন্ধে বিনির সঙ্গে আমার মতভেদ আছে। হয়তো তাই হবে, কিন্তু ভগবানের জটিল সৃষ্টি-রহস্য, অতটুকু মেয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে আমি ভালোবাসি না। আমার পায়ের ফাঁক্ আমার নিজের জন্য, কোনো বেড়াল-বংশীয়ের জন্য নয়, যেতে হয় আমি নিজেই যাব তার মধ্যে দিয়ে—এই হচ্ছে আমার সাফ্ জবাব।

সেদিন সদ্য একটা দুঃস্বপ্ন দেখে বেলা আটটার সময় ঘুম থেকে উঠেছি, এমন সময়ে উনি আমার পায়ে এসে ল্যাজ বুলাতে চাইলেন। আদর জিনিসটা একেবারেই আমার ধাতে সয়না, তা মানুষেরই কি আর বেড়ালেরই কি! মানুষের বেলা গা জ্বালা করে আর বেড়ালের বেলায় সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌তে থাকে—দুটোই ভারি খারাপ। সুতরাং আকস্মিক উত্তেজনায় ওকে যদি আমি ফুটবল্ বিবেচনা করেই থাকি তাতে বড় দোষ হয় না।

ম্যাও আর ক্যাঁও—এই দুটোর সন্ধি করলে যা হয় তেমনি একটা অদ্ভুত আওয়াজে জিনিষটা সাড়ে তিন হাত দূরে ছিট্‌কে পড়ল! বেড়ালের চীৎকারে

বিনি দৌড়ে এল, বিনির চেঁচামেচিতে মাকে আস্তে হোলো। তারপরে তিনজনে মিলে আমাকে যা বক্তে স্বুরু করল তা আর বলে' কাজ নেই।

বকুনি থাম্লে আমি বল্লাম—"বেড়ালকে শূট্ করেছি, তাতে আর হয়েছে কি! এগ্জামিনে ফেল্ করলে অমন অনেকের মাথা বিগ্ড়ে যায়! হ্যাঁ, বেড়াল-হত্যা আর বেশি কি এমন, অনেকে এমন অবস্থায় আত্মহত্যাই করে' বসে।"



বিনি বলে—"তুমি আবার ফেল্ করলে কবে? ম্যাট্রিকের রেজাল্ট্ কি এখনি বেরিয়েছে? পরশু তো সবে পরীক্ষা দিলে!"

আমি গম্ভীর হয়ে যাই—"আজ সকালেই ফেল্ করেছি। স্বপ্নে দেখ্লাম যে পাশ করতে পারিনি। ভোরের স্বপ্ন সত্য হয় কিনা তুমিই বলো না মা!"

ফিরে গল্পিকে

অথ আয়োডিন-ঘটিত

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

মা গালে হাত দেন—"মা-ষষ্ঠীর বাহন, তাকে কিনা—তোমার বাপু যত অনাছিষ্টি! আর বেলা আটটায় কি মানুষের ভোর হয় যে ভোরের স্বপ্ন সত্যি হতে যাবে।"

মা আবার রান্নাঘরের দিকে রওনা হন।

বিনি ঠোঁট উল্‌টে বলে—"পাশ্ করতে পারোনি তো আমার বেড়াল কি করবে? বেড়াল কি এগ্‌জামিনার? নম্বর বাড়িয়ে পাশ্ করিয়ে দেবে তোমায়?"

"ওসব জানিটানি না, আমার পায়ের কাছে যে আস্‌বে তাকেই শূট্ করবো, তা বেড়ালই কি আর বিনিই কি!"

"বটে? করোনা দেখি কেমন? এই ত' এসেছি?" বিনি বুক ফুলিয়ে বুকের কাছাকাছি এগিয়ে আসে।

"জানিস্, আমি বক্সিং জানি?" আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

"আমাকে বেড়াল পাওনি, আমিও কাম্‌ড়ে দিতে জানি।" বিনি একেবারে বেপরোয়া।

ওর অকুতোভয়তা আমাকে বিচলিত করে। আম্‌তা আম্‌তা করে' বলি—"তোমার বেড়াল নিয়ে থাকোগে না, আমার সঙ্গে লাগ্‌তে আসা কেন! এগ্‌জামিনে ফেল্ করেছি, এখন আমার মেজাজ ঠিক নেই।" ওকে আমি সাবধান করে দিই—"হ্যাঁ, খেপে গেলে কি যে করে বস্‌ব কেউ জানে না। গলায় দড়িও দিতে পারি, নিজের কিম্বা বেড়ালের।"

বিনি তখন প্রিয়পাত্রকে নিয়ে পড়ে—"আমার লুটিলুটি! আমার মেনি মুখো! আমার ভেল্‌ভেলেটা! কে মেরেছে তোমায়! দাদা? দাদা কেন মার্‌বে। তুমি লক্ষ্মীসোনা! তুমি চাঁদের কণা! দাদাকে মার্‌তে দেব না! দাদাকে মার্‌ব! খুব মার্‌ব! কসে মার্‌ব!"

অথ আয়োডিন-ঘটিত
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

বিনির বাক্যালাপে আমার হাড় জ্বলে যায়! বেড়ালকে অত নাই দেওয়া ভালো না। ওই আদর দিয়েই তো ওর মাথা খাওয়া হচ্ছে, ওর পরকাল ঝর্‌ঝরে হয়ে যাচ্ছে। ভারি খারাপ এসব।

বিনির কোল চেপে বেড়ালটা আড়্‌চোখে আমার দিকে তাকায়। আমি আর বিরক্তি চাপ্‌তে পারি না—"থাম্‌ থাম্‌! আর বেড়াল বখিয়ে কাজ নেই তোর, খুব হয়েছে!"

বিনির তুব্‌ড়ি ফুটেই চলে—"ডাডা ডুট্টু! ডাডাকে মাল্‌বো! ভালি ডুট্‌ঠু, ভালি পাজী! ডাডা কিনা!"

ইতর জন্তুর সাম্‌নে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করি। টুথ্‌ব্রাশ্‌ নিয়ে সটান্‌ বাথ্‌রুমে চলে যাই।

ফিরে এসে দেখি বিনি বেড়ালের চিকিৎসায় লেগেছে। টিঞ্চার আইডিনের বোতল ফাঁক্‌ করে' ইতিমধ্যেই ওর সারাগায়ে লাগানো হয়ে গেছে।

বিনি বলে—"দাদা! লক্ষ্মী দাদা! রাগ কোরো না!" তারপরে বেড়াল না শুনতে পায় এম্‌নি ভাবে আমার কাছে ঘেঁসে ফিস্‌ ফিস্‌ করে' বলে—"ওসব মিছিমিছি বল্‌ছিলাম! ওকে বোঝাচ্ছিলাম! ঠাণ্ডা করছিলাম কিনা! আহা, বড্ড লেগেছে বেচারার! গায়ে ব্যথা হলে তুমি খাও সেই ওষুধটা একটু দাওনা আমায়!"

"য়্যাস্‌পিরিন্‌ পাউডার? সে কি হবে?"

"ওকে একটু খাওয়াবো যাতে ব্যথা মরে যায়।"

"দূর্‌, তাকি বেড়ালকে ছোঁয় কখনো? ঐ যে আইডিন্‌ মাখিয়েছিস্‌ ওতেই হয়েছে!"

"ওতে হয় কখনো, তুমি দাওনা শিশিটা!" বিনি মুখ ভারী করে, "মানুষ খেতে পারে আর বেড়াল পারে না? বেড়াল বলে কি মানুষ নয়?"

অথ আয়োডিন-ঘটিত
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

"ওর কি মাথা ধরেছে যে য়্যাস্পিরিন্ খেতে যাবে ও।"

"মাথা কেবল! সারা গা-ই ধরে গেছে বেচারার! যা শূট্ একখান্ ঝেড়েছো! তুমি না তো গোষ্ঠপাল!"

উপমাটা শুনে খুসী হয়ে যাই। য়্যাস্পিরিনের শিশিটা দিয়ে ফেলি—"বেশি খরচ করিস্ না কিন্তু।" বলে' চায়ের মৎলবে রান্নাঘরের দিকে ধাবিত হই।

চা দিতে দিতে মা বলেন—"বেড়ালকে মেরে ভালো করিস্নি বাছা! কৃষ্ণের

আমি বাধা দিয়ে মার ভ্রম সংশোধন করি—"উহু, কৃষ্ণের না, ষষ্ঠীর জীব।"

"না রে, কৃষ্ণের জীব, মা ষষ্ঠীর হোলো বাহন!"

"উঃ!" চায়ে চুমুক দিয়েই লাফিয়ে উঠ্তে হয়—"দুত্তোর, কৃষ্ণের জীব! এদিকে আমার জিব্ গেল!"

মা আমার আর্ত্তনাদে আকৃষ্ট হন—"কেন, কি হোলো!"

"কি আবার হবে! খেয়ে-না-খেয়ে যা গরম করেছো! আমার জিব্ গেল পুড়ে!"

মা শুধু বলেন—"আহাহা!" কিন্তু কি আর করবেন, জিভে তো হাত বুলোনো যায় না।

"দাও মোহনভোগ দাও, জিভ ঠাণ্ডা করি আগে! দেখো বাপু, গরম নয় তো আবার।" এবার পরীক্ষা করে' তবে মুখের মধ্যে ফেলি।

ঘরে ফিরতেই বিনি বলে—"দাদা, খাচ্ছে না তো! তুমি একে একটু ধরো, আমি মাছের ঝোল্ নিয়ে আসি। মাছের ঝোলে মিশিয়ে দিলেই খাবে তখন। দেখো, পালায় না যেন।"

ধরতে আর হয় না, এম্নিতেই বেচারা নির্জ্জীব হয়ে পড়েছে। পালাবারও

উৎসাহ নেই ওর। সাম্‌নে একটা খোরায় য়্যাস্‌পিরিন্‌গোলা রয়েছে, একবার করে' শোঁকে, তখন আবার মুখ বিকৃত করে' গোঁফ সরিয়ে নেয়।

মিটি মিটি করে' তাকায় আমার দিকে, কেমন মায়া হয়। ওকে বলি, "ওষুধটা খেয়ে ফ্যালো চট্ করে' লক্ষীটি! এক্ষুনি সেরে উঠ্‌বে। না, তোমায় আর শূট্ করব না, ভয় নেই। আমারো পায়ে লেগেছে।" যথাসাধ্য ওকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করি। "মিউ!"—ক্ষীণস্বরে আমাকে ও ধন্যবাদ জানায়।

এর মধ্যেই বিনির চিকিৎসার বেশ ফল দেখা গিয়েছে। ওর চেহারা বদ্‌লে গেছে একেবারে। অরিজিনাল পাঁশুটের সঙ্গে টিন্‌চার আইডিন্ মিশে অদ্ভুত এক রঙের খোল্‌তাই হয়েছে। বেড়াল বলে' চেনাই যায় না একদম্!

বিনি একবাটি দুধ আর বাতাসা নিয়ে ঘরে ঢোকে। "মা বল্ল, বেড়াল মাছের ঝোল খায় না, ওরা তো বাঙালী নয়, কেবল মাছ খেতেই ভালবাসে। তাই দুধ নিয়ে এলাম।"

দুধ দেখে বেড়াল-বাবাজীবন চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। ওর ল্যাজের নিশান খাড়া হয় আবার! দুধ বাতাসা আর য়্যাকোয়া-য়্যাস্‌পিরিনের একটা মিক্‌চার করে' ওকে দেওয়া হয়। চুক্ চুক্ করে' সমস্তটাই একাধিক নিশ্বাসে ও নিঃশেষ করে' নিয়ে আসে।

তাজা হয়ে উঠ্‌তে তারপর আর বেশি দেরি লাগে না। চার পায়ে সোজা হয়ে সে দাঁড়ায়, সমস্ত পৃষ্ঠদেশকে একবার ধনুকের মত করে' বাঁকিয়ে আনে। আকাশে তার বিজয়-নিশান, (স্বভাবতঃ যেটা সর্ব্বদা পিছন দিকেই) মহাসমারোহ করে' দুল্‌তে থাকে। রোগীর এমন অভাবনীয় আকস্মিক উন্নতি লক্ষ্য করলে ডাক্তার এবং নার্সের মনে আনন্দ-সঞ্চার স্বাভাবিক। আমি যত খুসি হলাম, বিনি ততোধিক। আর বেড়ালের কথা বলাই বাহুল্য, পেশেণ্ট্ থেকে সে তখন ইম্‌পেশেণ্ট্ হয়ে উঠেছে।

অথ আয়োডিন-ঘটিত
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

তারপরে যা দৃশ্য দেখি তা আমি জীবনে ভুল্‌ব না। বেড়ালটা তার পেছনের দু'পায়ে ভর্ দিয়ে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে নাচ্‌তে সুরু করে' ছায়। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি এবং বিনিও। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোমড় বেঁকিয়ে সে কত রকমের নাচ!



সহসা বিনিকে জিজ্ঞাসা করি—এম্পায়ারে উদয়শঙ্করের নাচ্ দেখতে ওকে কি তুই সঙ্গে নিয়ে গেছ্‌লি?

"হ্যাঁ, গেছ্‌ল তো!" বিনির জবাব আসে। "বেশ, মনে পড়ছে

"তবেই হয়েছে।" আমি আশঙ্কা প্রকাশ করি—"এইবার সেই নটরাজ-নৃত্যটা না লাগিয়ে ছায় আবার!"

ওই একপেয়ে নাচটা আমার দু'চক্ষের বিষ। নটরাজ এবং ব্যাঙ্ নৃত্য নাচ্‌তে নাচ্‌তে অনেকবার আছাড় খেয়েছি ছেলেবেলায়। তখন কম্পিটিশন করে' ওই নাচটা হোতো আমাদের ছেলেদের মধ্যে।

"মন্দ কি! টিকিট্ লাগ্‌ছে না তো!" বিনি এই কথা বলে' আমাকে উৎসাহিত করার প্রয়াস পায়

বেড়াল-গর্ব্বে-গর্ব্বিত বিনির মুখ তখন আত্মপ্রসাদের ধাক্কা লেগে কানায় কানায় টাইটুম্বুর হয়ে' উঠেছে।

একটু পরেই পটপরিবর্ত্তন হয়। বেড়ালটা ভয়ানক ছুটোছুটি আরম্ভ করে। তড়িদ্বেগে সমস্ত ঘরময় ঘুরোঘুরি করে' বেড়ায়—এটা ফেলে ওটা ওল্টায়, তার তীব্র গতির সম্মুখে যে আসে তাকেই ভূমিসাৎ করে। পাছে আমার সঙ্গে কলিশন্ বেধে যায় এই ভয়ে আমি টেবিলের ওপর খাড়া হই। বিনিও আমার অনুকরণ করে; কাছাকাছি একটা তাকে গিয়ে ওঠে।

অকস্মাৎ বেড়ালটা আড়াই হাত লাফিয়ে ওঠে আকাশে। তার ব্যবহার দেখে আমার পিলে চম্‌কে যায়, টেবিলকে নিরাপদ স্থান বলে' আর মনে করতে পারি না। আল্‌মারির পাশে এক কোণে গিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়াই। বিনিকে বলি—"একি কাণ্ডরে?"

"উড়্‌বে না তো?" বলে' বিনি একটু থামে, "তোমার উপর রাগ আছে দাদা! সাবধান, শোধ তুল্‌তে পারে।"

"উল্‌টে মোনা দত্তের মতো এক শূট্ ঝেড়ে না বসে আমায়!" আমি বলি, "সেই ভয়েই তো এখানে এসে লুকিয়েছি রে।"

"উঁহু কথা কোয়োনা, জান্‌তে পারবে, তাহলেই তোমার দফা—"

তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি কত বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছি। পরমুহূর্ত্তেই বেড়ালটা টেবিলের ওপর লাফিয়ে ওঠে, সেখানে আমাকে না পেয়ে ফুলদানি-গুলোর উপর রাগটা ঝাড়ে। ওর নিদারুণ পদাঘাতে সেগুলো ধরাশায়ী এবং চুর্‌মার্ হয়। এ যাত্রা বড্ড বাঁচা বেঁচেছি বুঝ্‌তে বেশি দেরি লাগে না। বিনিও সেই ইঙ্গিত করে—"তোমার ভয়ানক ফাঁড়া কাট্‌ল দাদা! ফুলদানির উপর দিয়েই চোট্‌টা গেল!"

হাঁটাহাটি ছেড়ে বেড়ালটা তখন লাফালাফি সুরু করেছে। এই গেলাস্

কেসের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, এই বুক্ শেল্‌ফের বুকে গিয়ে আছাড় খায়, এই দেরাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগায়, এই আল্‌মারিকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে,—এইভাবে একাধিকের ঘাড় ভাঙে এবং অনেকেরই দফা সারে। অবশেষে বড় আয়নাটার বিপক্ষে নিজেকে পাঠায়—ওর মধ্যেকার প্রতিচ্ছবির সঙ্গে সংগ্রাম কিম্বা কোলাকুলি একটা কিছু বাধাবার চেষ্টা করে। চারিদিকে তচ্‌নচ্—ভাঙ্‌চুর—এককথায় একটা খণ্ড বিপ্লব! মহামারি ব্যাপার!

বিনি তাকের মধ্যে বসে কাঁপ্‌তে থাকে। আল্‌মারিকে সরিয়ে তার পেছনে অন্তর্হিত হবার চেষ্টা করি আমি। কেবল একটা চোখ যথাসাধ্য বাইরে রাখ্‌তে হয়। ওর গতিবিধিতে দৃষ্টি রাখা আমার দরকার, কিন্তু আমাকে যেন ও না দেখ্‌তে পায়। আমারই ওপর ওর বিদ্বেষ কিনা!

আল্‌মারির নড়্‌চড়্ হতেই ওর অন্তরাল থেকে একপাল ইঁদুর বেরিয়ে আসে কিন্তু বেড়ালের তখন তাদের দিকে নজর দেবার অবসর নেই—সে তখন বিশাল ভূমণ্ডলে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বেরিয়েছে। ইঁদুরগুলোও আদৌ ভয় করে না, বেশ কৌতূহলের সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করতে থাকে। বিনি আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করে—"ইঁদুরগুলোর মজা দেখেছ দাদা!" আমি জবাব দিই—"বেড়ালের কাণ্ড দেখ্‌ছে। জন্মে এমন দেখেনি তো কখনো!" বিনি আমার কথায় সায় দ্যায়—"হুঁ, অম্‌নি অম্‌নি সার্কাস্ দেখে নিচ্ছে।"

বেড়ালটা এবার হুহুঙ্কার ছাড়্‌তে থাকে। অতিরিক্ত আনন্দ আর অব্যক্ত রাখ্‌তে পারে না। এক একটা মর্ম্মন্তুদ বাণী ছাড়ে। "মিউ—ইউ—you—you—you!"—আমাকে মীন্ করেই যেন গাল দিচ্ছে আমার সন্দেহ হয়।

মা ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢোকেন। বেড়ালটা তখন ডিগ্‌বাজি সুরু করেছে। "কিসের এত হুলুস্থূল! কি হোলো এর? এমন করছে কেন!"

"ফূর্ত্তি হলেই বোধ হয় এমন করে।" আমি বলি।

অথ আয়োডিন-ঘটিত
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

"বেড়ালদের স্বভাব!" বিনি যোগ ছায়।

"উঁহু, কোনোদিন এরকম করেনা তো!" মা বেড়ালকে ঠাণ্ডা করার প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু মার কোনো কথায় ও কর্ণপাত করে না। উপায়ান্তর না দেখে অগত্যা বাংলা ছেড়ে বিজাতীয় ভাষায় আশ্রয় নিতে হয় মাকে। প্রথমে মিহি আওয়াজ ছান—"মিউ।" কোনো ফল হয় না। তখন ভারী গলার ভরাট্ ডাক ছাড়েন—"ম্যাও।"

যেমন না মার "ম্যাও" ওর কানে যাওয়া অম্‌নি ও এক নিদারুণ লাফ মারে। সেই এক লাফেই উন্মুক্ত জান্‌লা সবেগে অতিক্রম করে' নেপথ্যে সট্‌কান্ ছায়ঁ, ফুলের টবগুলো সব ওর সঙ্গে যায়।

"এ তো ভালো কথা নয়! না, মা ষষ্ঠী তাহলে খেপেছেন নিশ্চয়!" বল্‌তে বল্‌তে স্বস্ত্যয়নের উদ্দেশ্যে বোধ হয় পুরুতঠাকুরের উদ্দেশেই মা বেরিয়ে পড়েন।

আমি আল্‌মারির ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসি, বিনি তাক থেকে নামে। পরস্পরের দিকে তাকাই। দুজনেই চুপ করে' থাকি। ওর প্রিয়জনের অন্তর্দ্ধান জনিত এমন দারুণ শোকে কি সান্ত্বনা ওকে দেব?

অনেক পরে সদর রাস্তা থেকে বীভৎস ঐক্যতানের ঝঙ্কার এসে ঝট্‌কা মারে। কোনো প্রসেসন্ টসেসন বোধ হয়—বন্যাদায় বা বন্য আদায়ের যত ফন্দী! উঁকি মেরে দেখি—উঁহু,—সেই আয়োডিন-ঘটিত বেড়াল। বেড়াল বলে' একদম চেন্‌বারই যো নেই—তার রঙ্ আর চেহারা এম্‌নি জম্‌কালো হয়ে এসেছে এখন।

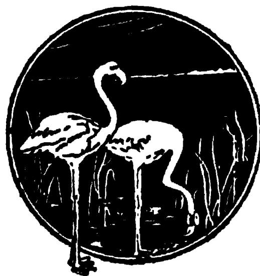
কি রকম একটা অদ্ভুত আওয়াজে তাড়া করে' ছুটেছে—আর তার ভয়ে পাড়ার যত কুকুর (সর্ব্বসাকুল্যে ডজন দেড়েক) ল্যাজ গুটিয়ে পঁই পঁই করে' পালাচ্ছে। চেঁচাচ্ছে আর ছুট্‌ছে—ডাইনে বাঁয়ে তাকাবার অবকাশ নেই তাদের—সে কী প্রাণান্ত ছুট্!

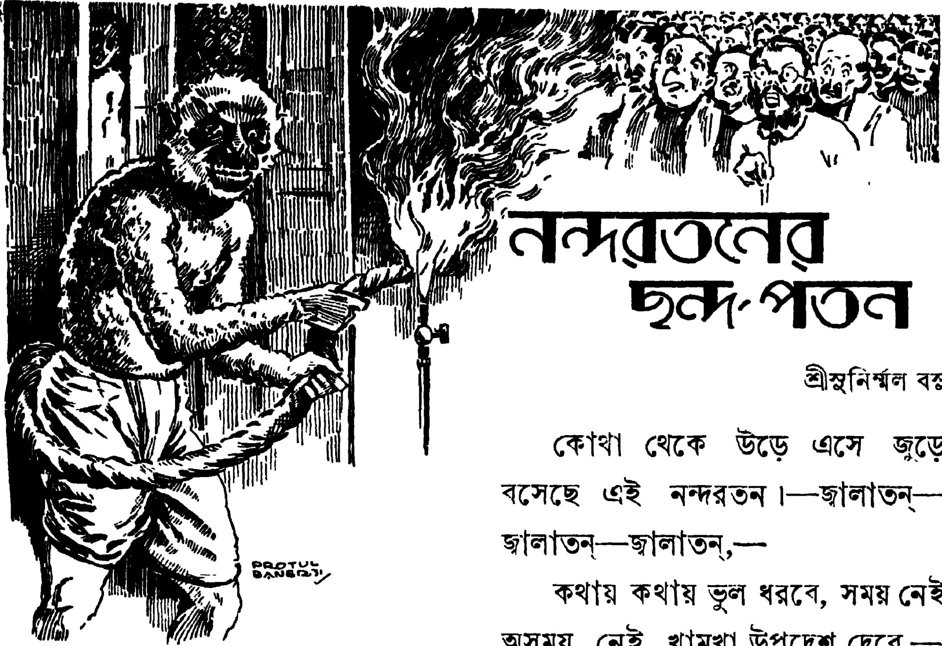
বুঝলাম বেড়াল নয়, বেড়ালের চেহারা আর আওয়াজেই তারা ভয় খেয়েছে। ভেবেছে বেড়ালের মত অথচ বেড়াল নয়—এই মারাত্মক বস্তুটি তবে কী? ভয়ের কথাই বটে।

আর সেই ধ্বনি! মিঁউ নয়, ম্যাও নয়, কিরকম একটা দীর্ঘছন্দিত সতেজ মিঁয়া—া—া—ও।

"মিঁয়া—া—া—া—া—ও !!" ওর মানে!

কিন্তু—কেউ আর দাঁড়াচ্ছে না!





নন্দরতনের ছন্দ-পতন

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এই নন্দরতন।—জ্বালাতন্—জ্বালাতন্—জ্বালাতন্,—

কথায় কথায় ভুল ধরবে, সময় নেই অসময় নেই, খাম্‌খা উপদেশ দেবে,—আর কি তিরিক্ষি মেজাজ—বাপ্ রে যেন ফোঁস্-কেউটে!

সম্পর্কে মেজমামার শালা। কথায় বলে 'মামার শালা পিসার ভাই—তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। তবু তাকে আমাদের 'মামা' বলে ডাক্‌তে হয়; —মেজমামার কড়া হুকুম। নইলে তিনি খাপ্পা হয়ে ক্ষেপে ওঠেন—চড়টা চাপড়টা লাগাতেও কসুর করেন না।

বয়সে আমাদের চেয়ে এমন আর কি বেশী! তিনবার 'ম্যাট্রিক ফেল করে চতুর্থবার পরীক্ষা দিয়ে সে আমাদের বাড়ী অর্থাৎ মামাদের বাড়ী হাওয়া খেতে এসেছে—অর্থাৎ চড়াও করেছে। পরীক্ষার জন্যে খেটে খেটে তার শরীর নাকি দুর্ব্বল—মগজ কাহিল।

আমি মামা বাড়ীতে থেকেই লেখাপড়া করতাম,—নন্দরতন আমাকেই যেন পেয়ে বসল।

নন্দরতনের ছন্দ-পতন

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

প্রথম দিন এসেই নন্দরতন নাক সিঁটকে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"তোমার নাম কি হে ছোক্‌রা?" প্রশ্ন শুনে আমার পিত্তি জ্বলে উঠল—কী এতবড় আস্পর্দ্ধা! নাম নাই ধাম নাই—কোথাকার কে এসে মাত্‌বরি চালে আমাকে ছোক্‌রা বলে সম্বোধন করল! কিন্তু কি আর করি, মনের রাগ মনেই হজম করে' উত্তর দিলাম, "আমার নাম কেষ্টলাল।"

মুখ ভেংচে নন্দরতন বল্লে—"হুঁ, কেষ্টলাল! কেস্ট আবার লাল হয় নাকি? কেষ্টর রং যে কালো—তাও বুঝি জ্ঞান নাই? হিন্দুর ছেলে না তুমি? নাম রেখেছিল কে?—"

আরো জানি কি সে বল্‌তে যাচ্ছিল এমন সময় মেজমামা এসে পড়লেন,—বল্লেন, "এই যে ঠিক হয়েছে, কেস্টা তুই তোর নন্দমামার কাছে আজ থেকে দু' বেলা নিয়ম করে পড়বি—রাজু, অণু ওরাও পড়বে। গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে গেছে। পুরাণো পড়াগুলি বেশ করে ঝালিয়ে নিবি,—বুঝ্‌লি? দিও তো হে নন্দ একটু নজর ওদের দিকে, সেরেফ ফাঁকিবাজ হতভাগারা!"

রাজু আর অণু হচ্ছে আমার বড়মামার ছেলে। রাজু আমার সঙ্গে পড়ে, আমারই সমান বয়সী; অণু কিছু ছোট।

নন্দরতন আমাদের পড়াবে শুনে রাজু তো হেসেই বাঁচে না। "আরে ও তো তিন তিনবার 'ম্যাট্রিকে' কুপোকাৎ হয়েছে—ও আবার আমাদের পড়াবে কি! সর্ব্বনাশ, তা হলেই হয়েছে আর কি! যেকুটু বিদ্যে এতদিন শেখা গেছে—সেটুকুও ভুলতে হবে দেখছি।"

অণু বল্লে—"আবোল তাবোল নামে একটা বইয়ে পড়েছি—'ঊনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে আসলো শেষে'—আরে এ যে দেখছি নন্দমামারও প্রায় সেই দশা। তিনবার ফেল করেছে আর ষোলোবার হলেই কবিতার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় দেখছি—"

নন্দরতনের ছন্দ-পতন

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

এমন সময় পাশের ঘর থেকে নন্দরতনের গলা শোনা গেল—"ওরে. তোদের সব বইগুলো নিয়ে আয় তো। দেখি এতদিন গেঁয়ো মাষ্টারেরা তোদের কি ছাই-ভস্ম শিখিয়েছে, শেখাবে আর কি মাথা আর মুণ্ড,—হাতী আর ঘোড়া,—কলা আর কচু—।"

এই রে সর্ব্বনাশ করেছে!—বাপু হে, এসেছ ভগ্নিপতির বাড়ী হাওয়া খেতে, দু'দিন জিরিয়ে টিরিয়ে নাও, ভালো খাওয়া দাওয়া কর, হাড়ে জল-বাতাস লাগাও, তারপর না হয় যাচাই হবে কার বিদ্যের দৌড় কতখানি—আমাদের না তোমার! তা' না. প্রথম দিন থেকেই এসে এক ফ্যাকড়া বাধিয়ে দিলে। এই তো সবে দু'দিন হোলো স্কুল বন্ধ হয়েছে—আমাদেরও তো একটু জিরুনো দরকার।

আমরা কি করব তাই ভাব্‌ছি—এমন সময় মোটা গলায় ঝাঁঝালো সুরে মেজমামা বাইরের চাতাল থেকে হেঁকে উঠলেন—"কই, এখনো গেলি নে তোরা বই-টই নিয়ে। রায়-বাগানে কাঁচামিঠে আমের খোঁজে যাবার ফিকির করছিস বুঝি!—যাঃ—যাঃ—শীগ্‌গির বই নিয়ে।"

বাঘের চেয়েও বেশী ভয় পাই আমরা এই মেজমামাকে। বড়মামা শান্ত-শিষ্ট নিরীহ গোবেচারা মানুষ—বেশী কথা বলেন না—ঝাপ্টে ঝামেলা ভালো-বাসেন না। কিন্তু মেজমামা—উঃ, তাঁর গাঁট্টার গাঁটে গাঁটে যেন ভোঁতা কুড়ুলের ধার,—যেখানে ঘা মারেন সেখানটা যেন থেঁত্‌লে যেতে চায়,—তাঁর চাঁটির চেটোয় যেন বিছুটির রস মাখানো—একখানা চড় খেলে রাম-জ্বলুনি জ্বল্‌তে থাকে। কাজেই মেজমামার হুকুম তামিল না করে' উপায় নাই।

দস্তুরমত পড়াশোনা আরম্ভ হয়ে গেল।

নন্দরতন ইংরাজী বই পড়ায় না। বলে—"ওসব বিদেশী ভাষা শিখবার আগে দেশী ভাষাটা ভালো করে 'সরগর' করা দরকার। অঙ্ক, ইতিহাস, সংস্কৃত,

ভূগোল—ওসব তোরা নিজেরাই শিখে নিস্,—ওসব বাজে জিনিষ নিয়ে এখন মিছে সময় নষ্ট করা যায় না। বাঙ্গালীর ছেলে তোরা—বাংলাটাই ভালো করে' শেখ। আর বাংলাই বা পড়বি কি ছাই,—যে সব পাঠ্য পুস্তক বাজারে পাওয়া যায়, তার বেশীর ভাগই অপাঠ্য। গদ্যগুলিতে ঝুড়ি ঝুড়ি ব্যাকরণ ভুল আর পদ্যে ভুরি ভুরি ছন্দ পতন। শিখবি কি তোরা?"

নন্দমামা একজন উঁচুদরের কবি,—শুধু তাই নয়, বড় বড় কবিদের লেখায় যে বিস্তর ছন্দপতন হয়—তাই নিয়ে সে একটি গবেষণামূলক উপাদেয় বই লিখ্ছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে' ছোটখাট অনেক কবির কবিতার ছন্দের দোষ এতে সে দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে দেখাচ্ছে।

পাড়ার ভোঁদা লুকিয়ে চুরিয়ে একটু আধ্টু কবিতা টবিতা লেখে। তাকে একদিন আমরা পাকড়াও করে' নিয়ে এলাম নন্দরতনের কাছে। ছোট একটি বালীর কাগজের খাতা,—ছোট বড় কত রকমের ছড়া-কবিতায় ভর্ত্তি।

নন্দরতনের কাছে ভোঁদার পরিচয় করিয়ে দিলাম। মামা কপাল কুঁচ্কে—নাক সিঁট্কে বল্লে—"কবিতা লেখা হয়?—আচ্ছা পড় দেখি!"

মহা উৎসাহে ভোঁদা কবিতা পড়তে সুরু করে দিল। এতবড় একজন কবির কাছে কবিতা পড়তে প্রথম প্রথম কার' না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ভোঁদাও প্রথমে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কিছু পরেই সে ভাব্টা সামলে গেল,—সে বেশ সহজ ভাবেই একে একে কবিতা পড়ে যেতে লাগল।

মামা একমনে চোখ বুজে কবিতা শুনে যাচ্ছে।—মুখে একটিও কথা নাই। নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়ে গেছে। ভোঁদার সৌভাগ্যে আমাদের ঈর্ষ্যা হতে লাগল। আমরা 'হাঁ' করে' তার কবিতাগুলি গিল্তে লাগলাম, ভোঁদার কৃতিত্বে আমাদের আনন্দ যেন উথ্লে উঠ্তে লাগল।

ভোঁদার কবিতা পড়া শেষ হয়ে গেল। আমরা সবাই এক সঙ্গে যেই হাত-

তালি দিয়ে প্রাণের আনন্দ জানাতে যাব, এমন সময় মামা হাত বাড়িয়ে বল্লে, "দেখি, খাতাখানা।"

ভোঁদা খাতাখানা মামার হাতে এগিয়ে দিল। মামা খাতাখানা পড়্‌পড়্‌ করে' ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' মাটিতে ফেলে দিয়ে বল্লে—"একদম বাজে, ছত্রে ছত্রে ছন্দপতন, মাথা নাই, মুণ্ডু নাই,—তার উপর হাতের লেখা নয় তো কাগের ঠ্যাং, বগের ঠ্যাং।"



ভোঁদা মুখে কিছু বল্লে না, কিন্তু বেশ বুঝলাম মনে মনে সে প্রবল এক ধাক্কা খেয়েছে। হতে পারে তার ছত্রে ছত্রে ছন্দ-পতন, পত্রে পত্রে গরমিল,—হতে পারে তার হাতের লেখা অতি কদাকার, কুৎসিৎ,—কিন্তু তাই বলে খাতাখানা ছিঁড়ে ফেলবার কি অধিকার নন্দরতনের। ফেরৎ দিলেই হোত! ওঃ, খাতাখানা যে তার প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

ভোঁদার চোখ-দুটি ছল্‌ছলিয়ে এল। আমরাও নন্দমামার এই ব্যবহারে খাপ্পা হয়ে উঠলাম। বাস্তবিক এ কি অন্যায়! ভাগ্যিস্ ভোঁদা ক্ষেপে ওঠে নাই—যা কাঠ্‌-গোঁয়ার ও, একবার চট্‌লে আর রক্ষা নাই।

নন্দরতনের ছন্দ-পতন

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

নন্দমামা বল্লে—"আজ বিকেলে পাড়ার ছেলেদের সব ডেকে নিয়ে আসিস্। 'লঙ্কা-দহন' বলে একটা নাটক আমার লেখা আছে,—অমিত্রাক্ষর ছন্দে, তোদের তা' পড়ে শোনাব। শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পারবি ছন্দ না পতন করেও, মিল না দিয়েও কেমন সুন্দর কবিতা লেখা যায়। কবিতা কি আর লিখলেই হোল;— আসিস্ ভোঁদা বিকেল বেলা। তোদের দিয়ে আমি বইখানা অভিনয় করাব। আগে কবিতা বুঝতে শেখ, তারপর পড়তে শেখ, তারপর না হয় লিখ্‌তে চেষ্টা করবি।"

বিকেল বেলা আমরা দল জুটিয়ে নন্দমামার কাছে এসে হাজীর হলাম। নন্দমামা খুসী হয়ে তাঁর 'লঙ্কাদহন' কাব্য-নাটিকাখানা আমাদের পড়ে শোনাতে লাগল।

সাগর ডিঙ্গিয়ে হনুমান সীতার খোঁজে লঙ্কায় গিয়ে প্রবেশ করেছে—এই নিয়ে প্রথম দৃশ্য আরম্ভ। আর লঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার করে' হনুমান সীতার খোঁজ নিয়ে আবার রামের কাছে ফিরে এসেছে—এই নিয়ে পালা শেষ।

মন দিয়ে আমরা নাটকটি শুনলাম। পড়া শেষ হলে ভোঁদা আস্তে আস্তে আমাকে বল্লে, "জায়গায় জায়গায় 'মেঘনাদ-বধ-কাব্যের' টুক্‌নিফাই,—একেবারে সেরেফ লাইন কে লাইন চুরি।" আমি ফিস্ ফিস্ করে' বল্লাম, "চুপ্ চুপ্, শুনতে পায় না যেন।"

পড়া শেষ করে নন্দমামা বল্লে, "কাল থেকেই তোরা সবাই আসবি,—পার্ট দিয়ে দেব, আমি নিজে রাবণের পার্ট নেব। এমন অভিনয় তোদের গ্রামে কেউ কোনদিন দেখে নাই—দেখে নিস্!"

আমাদের উৎসাহের আর সীমা নাই। পরের দিন দলবল জুটিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম মামার কাছে। কে কি পার্ট নেবে,—তাও ঠিক হয়ে গেল, শুধু গোল বাধল হনুমানের পার্ট নিয়ে। কেউ আর হনুমান সাজতে রাজী হয় না।

নন্দরতনের ছন্দ-পতন

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

নন্দমামা বল্লে, "তোরা সব আহাম্মুকের দল। হনুমানের চরিত্রই হচ্ছে এই বইখানির প্রাণ। হনুমানের পার্ট যে ভালো করে' করতে পারবে তারই তো হবে জয়-জয়কার। কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ, অহীরাবণ, মকরাক্ষ—এইসব পার্টে বিশেষ কোন বাহাদুরী নাই, সবাই করতে পারে। শক্ত পার্ট হোলো রাবণ আর হনুমান; রাবণের পার্ট তো আমিই নিয়েছি, একজন খুব ওস্তাদ ছেলের দরকার হনুমানের অভিনয় যে করতে পারবে। খুব ভালো আবৃত্তি করতে জানা চাই। আমার ইচ্ছা ভোঁদাই এই পার্ট নেয়, কারণ ওর মধ্যেই একটু রসবোধ আছে।"

হনুমানের পার্ট করতে হবে শুনে ভোঁদা তো প্রথমে চটে-মটেই অস্থির। আমরা অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলতে শেষে সে সম্মত হোল। ব্যস্, আর কি, গোলমাল গেল চুকে,—সবাই নিজের নিজের পার্ট নিয়ে মুখস্থ করতে লাগলাম। রোজ জোর মহড়া চলতে লাগল। বাস্তবিকই নন্দমামা যে রকম অভিনয় করতে লাগল তার বুঝি আর তুলনা হয় না। ভোঁদাও হনুমানের চরিত্র বেশ জমিয়ে ফেল্ল।

* * * *

আজ সন্ধ্যায় 'লঙ্কা-দহন' অভিনয় হবে গাঁয়ের বুড়ো-শিবতলার নাটমন্দিরের চত্বরে। সারা গাঁয়ে হৈ হৈ পড়ে গেল। আশে পাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিকেল হতেই কাতারে কাতারে লোক জড় হতে লাগল।

চমৎকার 'স্টেজ' তৈরী হয়েছে,—মেজমামা নিজে খরচ দিয়ে সহর থেকে, 'সিন', সাজবার সরঞ্জাম, আর গ্যাসের বাতি আনিয়েছেন। তাঁর উৎসাহ সব চেয়ে বেশী।

সন্ধ্যা সাতটায় অভিনয় আরম্ভ। তার আগেই অতবড় নাটমন্দিরের চত্বর লোকে গিজ্‌গিজ্ করতে লাগল। আমি একবার সাজঘরের পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম—সামনেই বসে আছেন আমাদের হেডমাষ্টার,

হেড্-পণ্ডিত,—ভট্চায্ মশাই, ঘোষাল খুড়ো আরো গাঁয়ের সব মাত্‌বর ভদ্রলোকেরা। ওঃ, প্রাণটা উত্তেজনায় ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল—ষ্টেজের উপর যদি 'নার্ভাস' হয়ে যাই !!

নন্দমামাকে আর চিনবার জো নাই। ঝক্‌মক্ করছে তাঁর জরীর পোষাক,—চক্‌চক্ করছে খোলা তলোয়ার,—ইয়া তাগ্‌ড়াই গোঁফ—আর ইয়া গালপাট্টা জুল্‌পী।

আর ভোঁদা, আমাদের চিরপরিচিত ভোঁদা যেন ফুস্‌মন্তরের চোটে বাস্তবিকই হনুমান হয়ে গেছে। সমস্ত শরীর লোমে ঢাকা, পিছনে প্রকাণ্ড বিচালী জড়ানো লেজ। চোখ দুটো পিট্ পিট্ করছে—আমরা তো হেসেই বাঁচি না।

আমাদেরও সাজ-পোষাক শেষ হোল। নন্দমামা বারে বারে এসে উপদেশ দিয়ে যেতে লাগল—"দেখিস্ যেন ছন্দ-পতন না হয়।"

দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনয় হয়ে চলেছে। ভোঁদা আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর অভিনয় করছে। হাততালির চোটে আসর সরগরম। আমাদের ছোট-খাট পার্ট—তাও মন্দ উৎরাচ্ছে না। মোটকথা অভিনয় জমে উঠেছে।

শেষের দৃশ্যের যবনিকা উঠ্‌ল। সিংহাসনে রাজা রাবণ বসে আছে—আর রাক্ষসেরা হল্লা করতে করতে হনুমানকে বেঁধে রাজসভায় এনে হাজীর করেছে। রাবণ দাঁত কড়্‌মড়্ করে বল্লে—

"নিশার স্বপন সম কাণ্ড হেরি এ যে,—
মর্কট বানর হয়ে লণ্ডভণ্ড করে
আমার সোনার পুরা,—স্পর্দ্ধা এতদূর,
ওরে ওরে অর্ব্বাচীন্, ধিক্ তোরে ধিক্,
ভণ্ড সে লক্ষ্মণ রাম প্রচণ্ড নির্ব্বোধ।"

হনুমান উত্তর দিল—

"থাম্ থাম্ ভদ্রবেশী তুই ছোটলোক,
রামের কিঙ্কর আমি অতি ভয়ঙ্কর,
আমি কি ডরাই কভু রাক্ষস রাবণে?"

রাবণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। হনুমানের কথা শেষ হতে না হতেই সিংহাসন থেকে তর্‌তর্ করে' নেমে সে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠ্‌ল—

"নাশিয়া আমার কুঞ্জ অশোকের বন,
আমারেই রক্তচক্ষু দেখাস্ আবার!
বসিয়া আমার বুকে ওরে তুচ্ছ হনু
আমারি ছিঁড়িস্ দাড়ী,—দাঁড়া হতভাগা!"

এই বলে ঠাস্ ঠাস্ করে' হনুমানের গালে দুই চড় বসিয়ে দিল।

কথা ছিল, রাবণের হুকুমে সবাই হনুমানকে ভিতরে নিয়ে যাবে। তার লেজে আগুন লাগাবার দৃশ্যটা নিপথ্যেই শেষ হ'বে। দর্শকদের সামনে এই দৃশ্যটা দেখানো সম্ভবপর নয়।

রাবণের আচম্‌কা চড় খেয়ে হনুমান একলাফে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। কী এতবড় আস্পর্দ্ধা! নন্দরতন তার গালে চড় মারবে? কই, এরকম তো কোন কথা ছিল না। সেদিন তার অত সাধের খাতাখানা ছিঁড়ে ফেলেছে; আজ আবার সকলের সামনে এরকম অপমান? না,—এ অসহ্য।

ভোঁদা গর্জ্জন করে বানিয়ে বানিয়ে বলে যেতে লাগল—

"আমারে মারিলি চড়' রাক্ষস রাবণ,—
আচ্ছা দাঁড়া, দিব তার সমুচিত ফল।"

নন্দরতনের ছন্দ-পতন

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

এই বলে আমাদের সকলকে লক্ষ্য করে বলে উঠ্‌ল—

“শীঘ্র শীঘ্র লেজে মোর লাগা রে আগুন,
দেখাইব কাণ্ডখানা, আন্ দে'শালাই,
এ স্বর্ণলঙ্কার পুরী লেজের আগুনে
করিব বেগুন-পোড়া। তারপর আমি
সে আগুনে পোড়াইব রাক্ষস রাবণে।”

তারপর দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বল্‌তে লাগল—

“পড়িয়াছ রামায়ণে তোমরা সকলে,
রাবণ মরিয়াছিল শ্রীরামের হাতে।
আমি এবে নিজে মারি দুষ্ট সে রাবণে,
রচিব নূতন এক ‘হনুমানায়ণ’।”

আমরা তো একেবারে হতভম্ব। নন্দমামাও রীতিমত ঘাব্‌ড়ে গেছে। সে দুই একটা কথা বানিয়ে বল্‌তে গেল কিন্তু বারে বারে তার ছন্দপতন হতে লাগল। সে ঘেমে প্রায় নেয়ে উঠল।

হনুমান দেখল তার লেজে কেউ আর আগুন লাগাচ্ছে না। সে তখন নিজেই গ্যাসের বাতির কাছে গিয়ে নিজের বিচালীর লেজে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ দাউ করে' আগুন জ্বলে উঠ্‌ল।

এই ব্যাপার দেখে আমাদের তো চক্ষুস্থির। রাবণ রাজার দিকে ফিরে তাকাতেই দেখি সে অদৃশ্য হয়েছে,—আমরাও আর কাল বিলম্ব না করে যে যেদিকে পারলাম ছুট্ লাগালাম।

দর্শকেরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত এগুলিকে বাস্তবিক অভিনয়েরই অংশ বলেই মনে করে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল।

দাউ দাউ করে স্টেজে আগুন ধরে' উঠ্‌তেই তাদের চমক ভাঙ্‌লো। যে

উৎসাহ নিয়ে তারা অভিনয় দেখতে এসেছিল তার শতগুণ নিরুৎসাহে তারা হুড়্-মুড়্ করে আসর ছেড়ে পালাল।

তখন সেই জ্বলন্ত লেজ খুলে ঘুরাতে ঘুরাতে হনুমানরূপী ভোঁদা চীৎকার করছে—

"কোথায় গেলিরে তুই দুষ্ট দশানন,
এই কি বীরত্ব তোর ? সামান্য বানর,
তাহারি ভয়েতে তুই পগারের পার ?
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্,—হায়রে দুর্ম্মতি,
লঙ্কার পতন না এ ছন্দের পতন !"

তখন আসর প্রায় খালি। ওদিক থেকে চীৎকার করে' মেজমামা বলছেন—"কে কোথায় আছিস্ শীগ্‌গির জল নিয়ে আয়—'ড্রপ্‌সিনে আগুন ধ'রে গেছে—।"

—শেষ—